সেই অজানার খোঁজে
সেই অজানার খোঁজে
সেই অজানার খোঁজে
সেই অজানার খোঁজে
সেই অজানার খোঁজে
সেই অজানার খোঁজে
সেই অজানার খোঁজে
সেই অজানার খোঁজে
সেই অজানার খোঁজে

সেই অজানার খোঁজে

প্রথম খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-[illegible]

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৪সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৩৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
মডার্ন প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
আর. বি. মণ্ডল
ডি. বি. প্রিণ্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা-৬।

শ্রীসরোজকুমার কুশারী
প্রীতিভাজনেষু

সেই অজানার খোঁজে

১

দু'রাতের জার্নিতে পথে এ-রকম একজন সহযাত্রী জুটে যাবে, স্ত্রী মেয়ে বা আমি কেউ আশা করিনি। আমার আর মেয়ের ভিতরটা একটু বিরূপ হয়ে উঠেছিল। স্ত্রীর মুখ দেখে মন বোঝা শক্ত। উনি সব পরিবেশেই ঠাণ্ডা, চুপচাপ।

ময়দানে মস্ত একটা রাজনৈতিক সমাবেশ ছিল সেদিন। বিকেলে মিটিং, দুপুর থেকে মিছিলে মিছিলে বহু রাস্তার সমস্ত যান-বাহন বিকল। কম করে তিন সাড়ে-তিন ঘণ্টার জ্যাম। সে-সময়ের কলকাতার এটা নৈমিত্তিক চিত্র। অফিস থেকে দু'ভাই পর পর আমাকে ফোনে বলে দিয়েছিল অনেক আগেই হাওড়া স্টেশনে রওনা হতে হবে। ওই মিটিং ভাঙলে কলকাতার কত রাস্তা কত ঘণ্টার জন্য আটকে যাবে ঠিক নেই। এ-রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রওনা হয়ে রাত সাড়ে সাতটার ট্রেন ফেল করেছি। যাক, এবারে আমরা যাব হরিদ্বার। গত দেড় মাস ধরে আমাদের মন এত বিষণ্ণ যে কলকাতার বাড়ি-ঘর হাওয়া-বাতাসে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। হঠাৎই এই যাত্রা স্থির। রেল দপ্তরের এক চেনা-জানা অফিসারের কল্যাণে রিজারভেশনও পেয়ে গেলাম। হরিদ্বারে গিয়ে কোথায় উঠব কোথায় থাকব তা-ও ঠিক করার ফুরসৎ মেলেনি। সেখানে গেলে সাধারণত কংখলের রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রয় পেয়ে থাকি। সেখানকার বড় মহারাজ স্নেহ করেন। প্রত্যেক বার সু-ব্যবস্থাই হয়। কিন্তু তার জন্য অনেক আগে থাকতে চিঠি লিখে জানিয়ে রাখতে হয়। নইলে ভালো ঘর ছেড়ে ঠাঁই মেলাই শক্ত। বিশেষ করে যাত্রীর মৌসুমে। এটা মৌসুম ঠিক নয়। কিন্তু মৌসুমের কাছাকাছি সময়। আর সপ্তাহ তিনেক বাদে পুজোর ভ্রমণ বিলাসীদের হাওয়া বদলানোর হিড়িক পড়ে যাবে। মনে মনে ঠিক করেছি কংখলের আশ্রমে জায়গা পাই

সেই.

তো ভালো, না পেলেও খুব দুর্ভাবনার কিছু নেই। হরিদ্বারে হোটেল আর ধরমশালার ছড়াছড়ি। কোথাও জায়গা পেয়েই যাব।

ডুন এক্সপ্রেস সাড়ে ন'টা নাগাদ ছাড়ে, হয়তো বা আরো মিনিট দশ-পনেরো আগে। হালের টাইম-টেবল প্রায়ই একটু-আধটু বদলাচ্ছে। যা-ই হোক মিটিং ভাঙার জ্যামের ভয়ে আমরা বিকেল সাড়ে ছ'টার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। তখন আমাদের মনের অবস্থা শুধু আমরাই জানি। মোটরে ওঠার আগে বাড়ির সকলের চোখেই জল। স্ত্রী আর মেয়ের চোখেও।...দু'বছর আগে পর্যন্ত ছুটি-ছাটার সঙ্গে কিছু বাড়তি ছুটি যোগ করে ফি বছরেই কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়েছি। বেরুতাম একজনকে উপলক্ষ করে, তাকে আনন্দে রাখার জন্য। তখন সংখ্যায় আমরা চারজন। এবারে সেই একজন কম।

পথে ভিড় যেটুকু পেয়েছি, সেটা এমন কিছু নয়। সোয়া সাতটার মধ্যে আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেছি। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে আমার কোনদিনই ভালো লাগে না। আমাদের তিন জনের সঙ্গে তিনটে স্যুটকেস, একটা বড় টিফিন ক্যারিয়ার আর একটা কুজোর সাইজের জলের জাগ। আমরা প্লাটফর্মে স্যুটকেসের ওপর বসে অপেক্ষা করছি। ট্রেনের আনাগোনা, লোকজনের ছোটা-ছুটি দেখতে দেখতে সময় বেশ কেটে যায়। ট্রেন ঠিক কটায় ছাড়বে খোঁজ নিয়েছি। ন'টা পঁয়ত্রিশে। দু'ঘণ্টা দশ-বারো মিনিট বাকি।

মিনিট পঁচিশ বাদে হন্ত-দন্ত হয়ে দুটি ছেলে এদিকে এলো। আমার চোখে ছেলে, দু'জনেরই বয়েস আটাশ-তিরিশের মধ্যে। দু'জনেরই পরনে চোঙা না হোক পা-চাপা প্যান্ট, একজনের গায়ে টেরিকটের চকচকে বুশ-শার্ট, অন্য জনের এমনি শার্ট, টেরিকটের। পায়ে ছুঁচলো চকচকে শু। মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো ঘাড়ে-নামা চুলের মতোই চকচকে। কিন্তু তার দু'হাত আর শ্যামবর্ণ মুখের দিকে তাকালে চোখে ধাক্কা লাগে। বাঁ-হাতের দুটো আঙুল আধখানা করে নেই, দু'হাতেই অনেকটা জায়গা জুড়ে পোড়া দাগ। বাঁ-চোখের পাশ ঘেঁষেও গালে-মুখে-কপালে ওই রকম পুরনো পোড়া

দাগ। চোখটা বরাত জোরে বেঁচে গেছে। কালোর ওপর তার মুখখানা মিষ্টি, কিন্তু ওই অঘটনের পাকা দাগে সেটুকু চোখে পড়ার নয়। প্ল্যাটফর্মে ভিড় দেখেই তার মেজাজ অপ্রসন্ন। কোমরে হাত দিয়ে চারদিকে একবার দেখে নিয়ে সঙ্গীকে বিরক্তির সুরে বলে উঠল, এ শালার ভিড়ের মধ্যে কোথায় এনে বসাব! খুব কষ্ট হবে যে···।

মিটিং-এর দরুন হয়তো অনেক যাত্রীই আমার মতো আগে এসে বসে আছে। অন্য ট্রেনের যাত্রীর ভিড়ও থাকা সম্ভব। কিছু জিগ্যেস করার ব্যাপারে ছেলেটার আমাকেই পছন্দ হলো।—আচ্ছা দাদা, ডুন এক্সপ্রেস ঠিক ক'টায় ছাড়বে বলতে পারেন?

যে-ভগ্নিপতির দল কারো খুব কষ্ট হবার মতো প্ল্যাটফর্মের ভিড় বাড়িয়েছে আমিও তাদের একজন। তার ওপর বাপ ছেড়ে জ্যাঠার বয়সীকে দাদা সম্বোধন। অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, ন'টা পঁয়ত্রিশ।

নিজের হাতঘড়ি দেখল। এখনো পৌনে দু'ঘণ্টার কাছাকাছি দেরি। আবার প্রশ্ন, ট্রেনটা কখন ইন্ করবে জানেন দাদা?

ঘুরে তাকালাম তার দিকে।

সেটা এক ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ঠিক-ঠিক জানে না—তার সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি ভাইটি।

—লে হালুয়া—আপনার অমন ত্যারছা করে জবাব দেবার কি হল মশায়—জানেন না বললেই হত। সঙ্গীর দিকে ফিরল, তুই ছুটে চলে যা, ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করাই ভালো, এখানে ভিড়ের গরমে বেজায় কষ্ট হবে—আমি দেখি দুই একটা ডাব-টাব পাই কিনা।

দু'জনে ব্যস্ত পায়ে চলল। সঙ্গীটি সত্যিই ছুটল।

মেয়ে আমার ওপরে ঝাঁঝিয়ে উঠল, এ-সব লোকের সঙ্গে তুমি ও-ভাবে কথা বলো কেন বাবা—যা বলে গেল শুনতে খুব ভালো লাগল?

মেয়ের মা-ও এক-নজর আমার দিকে তাকিয়ে নীরবে তাকেই সমর্থন করল।

আমি বললাম, বেচারার মেজাজ অমন খারাপ কেন বুঝলি না, সদ্য বিয়ে

করা বউ নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে বউয়ের কত কষ্ট হবে ভেবেই মেজাজের ঠিক নেই—এখন ডাব না পেলে এই মেজাজ আরো তিরিক্ষি হবে।

মেয়ে হেসে ফেলল। স্ত্রী অন্য দিকে মুখ ঘোরালেন।

বরাত একটু ভালোই। প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এলো এক ঘণ্টা দশ মিনিট আগে। তা সত্ত্বেও লোকের ছোটাছুটি। কুলি কোচ নম্বর জেনে নিয়ে তার হিসেব মতো জায়গায় আমাদের বসিয়েছিল। ঠিক সামনেই সেই কোচ। চারটে করে বার্থের কুপেতে আমরা তিন বার্থ রিজারভ্ করেছি। একটা নিচের আর ওপরের দুটো বার্থ পেয়েছি। দ্বিতীয় নিচের বার্থের প্যাসেঞ্জারকে ওপরে পাঠানোর চেষ্টা সম্ভব কিনা আঁচ করার জন্য গাড়ির গায়ে আটকানো চার্টে তার নামটা পড়ে নিলাম। আর তার পরেই সম্ভাবনাটা বাতিল করলাম।

নিচের বার্থের প্যাসেঞ্জারের নাম কালীকিঙ্কর অবধূত।

...এত বয়েস পর্যন্ত অবধূত নামে একজনকেই চিনতাম, জানতাম। তিনি তন্ত্র সাধক কত বড় ধারণা নেই, কিন্তু নামী লেখক যে তাতে সন্দেহ নেই। সহযাত্রীর নামখানা গাল-ভরা, ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী এই অবধূত কোন্ পর্যায়ের তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। কেবল এটুকু ধরে নিলাম মেয়ের জন্য নিচের বার্থ পাওয়ার কোনো আশা নেই, কারণ কোনো অবধূতকে আমি অনুরোধই করতে পারব না। তাছাড়া কুপের একমাত্র বাইরের সহযাত্রী হিসেবে অবধূত-টবধূত প্রত্যাশিত তো নয়ই—বাঞ্ছিতও নয়।

কুলি বিদায় করে মেয়েকে বললাম, নিচের ওই বার্থ যাঁর, তিনি কালীকিঙ্কর অবধূত...তোকে ওপরের বার্থেই উঠতে হবে।

স্ত্রী মন্তব্য করলেন, তাতে কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, সিঁড়ি লাগানো আছে, তুমিও ইচ্ছে করলে নিচের বার্থে থাকতে পারো।

আমি বললাম, তোমার সামনের বার্থ অবধূতের শুনেই ঘাবড়ে গেলে নাকি?

স্ত্রী বিরক্ত।—এত বয়সেও মেয়েটার সামনে মুখের লাগাম নেই।
সাতাত্তর সালের সেপ্টেম্বর সেটা। এই মাসেই সাতান্ন ছাড়িয়ে আটান্নয় পা দিয়েছি। স্ত্রীর তিপ্পান্ন। মেয়ের একুশ বাইশ। মায়ের কথা শুনে মেয়ে হাসছে। ওদের দু'জনের মুখেই হাসি দেখলে এই বেরুনো সার্থক।
নিচের একটা বার্থ ই আপাতঃ ঠিক-ঠাক করে বসা হল। ওপরের ব্যবস্থা পরেও হতে পারবে। তার পরেই যে-দৃশ্য আর নাটকের মুখোমুখি আমরা, তিনজনেই ভেবাচাকা।
ব্যস্তসমস্তভাবে বার্থে এসে ঢুকল আঙুল-কাটা এক-গাল পোড়া সেই মূর্তি প্ল্যাটফর্মে লোকের ভিড় দেখে যার মেজাজ বিগড়েছিল। তার বগলে একটা চকচকে ছোট হোল্ড-অল্। সামনের বার্থে আমাদের, বিশেষ করে আমাকে দেখে তার ব্যস্ত মুখে যে ছায়া পড়ল, মনে হল নিঃশব্দে সে নিজেকে আর এক-দফা ভগ্নিপতির সম্মান দিল।
ফার্স্ট ক্লাসের বার্থ একটু বেশি চওড়া। দেখা গেল হোল্ড-অলের পুরু তোষক ঠিক সেই মাপের তৈরি। অনুমান ওই বার্থের যাত্রী কালীকিঙ্কর অবধূত সর্বদাই ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াত করে অভ্যস্ত। তোষক-চাদর-গায়ের চাদর ইত্যাদি দেখে আরো অনুমান ভদ্রলোক শৌখিন মানুষ।...সদ্য বিয়ে করা বউয়েব জন্য নয়, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে উনি কষ্ট পাবেন বলেই এই ছেলের উতলা বিরক্ত মুখে দেখেছিলাম। এই মূর্তি অবধূতজীর চেলা-ফেলা হবে। তাই যদি হয় তো যেমন চেলা তেমনি গুরু হওয়ারই সম্ভাবনা।
কিন্তু এরপর অপ্রত্যাশিত কিছু দেখারই ভাগ্য আমাদের। করিডোরের জানলা বরাবর এক-দঙ্গল মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে। সেদিকে ফিরে চেলাটি হাঁক দিল সব রেডি, বাবাকে নিয়ে আসুন!
চেলা যে তাতে আর সন্দেহ থাকল না।
করিডোরের জানলা দিয়ে বাবার দর্শন পেলাম না। আধ মিনিটের মধ্যে কুপের দরজার সামনে তাঁর আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তিনজোড়া চোখে লালের ধাক্কা। বাবার পরনে টকটকে লাল চেলির থান। কপালে লাল সিঁদুর টানা, গায়ে তেমনি লাল কনুই-হাতা ফতুয়া, গলায় বড়সড়

একটা রুদ্রাক্ষের মালা, পায়ে চপ্পল, দুটো আঙটি পরা দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। হাসি-হাসি মুখ। চওড়া বুকের ছাতি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরিষ্কার শেভ-করা মুখখানা কমনীয় বলা যেতে পারে। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে।

লাল বসন থেকে লালের জেল্লা ঠিকরোচ্ছে। আমাদের তিনজনকে দেখে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পিছনে আর দু'পাশে গিজগিজ করছে লোক। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটার চারভাগের তিনভাগ জ্বলতে বাকি। ঘুরে ওটা একজনের হাতে দিয়ে বললেন, ফেলে দাও।

এটুকু যে কুপের দুটি মহিলার সম্মানে কারোরই বুঝতে বাকি থাকল না। এ-দিকের চেলাটির আর এক-দফা বিরক্তির কাবণ হলাম আমরা। সে বলে উঠল, বাবার ওটার ফেলার কি দরকার ছিল, দু'দিনে তো একশ'বার সিগারেট খেতে হবে, তখন উঠে উঠে বাইরে গিয়ে খাবেন নাকি! ভিতরে এসে বসুন! আমার মুখের ওপর তার আড়চোখের একটা ঝাপটা এসে লাগল। ভাবখানা, বাবার মুখের সিগারেট ফেলে দিতে হয় এমন মেয়েছেলে নিয়ে ট্রেনে ওঠা কেন।

বাবা ভিতরে এলেন। চেলার কথায় কান দিলেন বলে মনে হল না। নিজের বার্থের শয্যা-রচনা দেখলেন। আমাদের বার্থ আর ওপরের খালি বার্থ দুটো দেখলেন। নিচের যে বার্থে আমরা বসা তাতে দু'ভাঁজ করে একটা সুজনি আর একটা ছোট্ট বালিশ পাতা। আমার স্ত্রী বাতাসে ফোলানো বালিশে শুতে পারেন না। আমাদের ওপরের দুই বার্থের সুজনি আর রবারের বালিশ এখনও পর্যন্ত যার-যার সুটকেশে।

অবধূতের পিছনের ভক্ত সংখ্যা ঠাওর করা গেল না। তাঁর পিছনে দু'জন মাত্র ঢুকতে পেরেছে। তিনি আসন নিলে ভেতরে বড়জোর আর চার পাঁচজনের জায়গা হতে পারে। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে থাকার দরুন পিছনের কেউ এগোতে পারছে না। ভিতরের চেলা তাড়া দিল, কি হল বাবা, বসুন!

কিন্তু বাবার দু'চোখ স্ত্রী আর মেয়েকে ছেড়ে এবারে আমার মুখের

ওপর।—ওপরের ওই দুটো বার্থ আপনাদের?

জবাবে মাথা নাড়লাম। আমাদেরই।

হরিদ্বারে যাচ্ছেন?

বলতে যাচ্ছিলাম, সেই রকমই ইচ্ছে। না বলে আবারও মাথাই নাড়লাম। হরিদ্বারই যাচ্ছি।

বাবার সঠিক অনুমানের ফলে চেলা আর পিছনের ভদ্রলোক দু'জনের হাসি-হাসি মুখ। অর্থাৎ তাদের বাবাটি সর্বজ্ঞ, অনুমানের কোনো ব্যাপার নেই। আমার বিবেচনায় কেরামতিও কিছুই নেই। বেনারস বা লক্ষ্ণৌ যাবার পক্ষে ডুন এক্সপ্রেস আদৌ ভালো গাড়ি নয়। আর হাওড়া থেকে সোজা হরিদ্বার বা দেরাদুন এই একটা গাড়িই যায়। তাছাড়া দেরাদুন অর্থাৎ এই শীতের জায়গায় যেতে হলে সঙ্গে কিছু বাড়তি সরঞ্জাম থাকার কথা। অতএব হরিদ্বার।

কিন্তু চেলার প্রতি বাবার পরের নির্দেশ শুনে আমি তো বটেই, স্ত্রী আর মেয়েও সচকিত একটু। তিনি বললেন, আমার বিছানা ওপরে পেতে দে, মায়েদের পক্ষে ওপরে উঠতে-নামতে অসুবিধে হবে।

গাড়ির চার্টে সহযাত্রীর নাম অবধূত দেখেই এই সুবিধেটুকুর আশা মন থেকে ছেঁটে দিয়েছিলাম। দেখছি মেঘ না চাইতে জল। তবু বলতে যাচ্ছিলাম, দরকার নেই, অসুবিধে হবে না। কিন্তু বলার সুযোগ পেলাম না। তার আগেই ওই চেলাটির মুখে প্রতিবাদের ঝাপটা।—আপনার কি-যে কখন মাথায় ঢোকে বুঝি না বাবা, ওই বাচ্চা মেয়ের অসুবিধে হবে আর আপনার খুব সুবিধে হবে—এই সরু সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করতে গিয়ে পড়ে হাড়গোড় ভাঙুন আর কি—এখন বসে পড়ুন তো!

বাবার মুখে রাগ-বিরাগের অভিব্যক্তি নেই।—বক-বক না করে যা বললাম চট-পট করে ফ্যাল না—নইলে তো পরে আমাকেই বিছানা টানাটানি করতে হবে।

চেলা থমকালো। রুষ্ট চাউনি আমার মুখের ওপর। নির্বাক রোষের সাদা তাৎপর্য, ভ্যালা লোক জুটেছেন মশাই আপনি একখানা! কিন্তু সকলকেই

একটু সচকিত করে মেয়ে বলে উঠল, আমার কোনো অসুবিধে হবে না, সরানোর দরকার নেই!

মেয়ের বলার ধরনটা আদৌ মোলায়েম নয়। একুশ বাইশ বছরের মেয়েকে বাচ্চা মেয়ে বলার দরুন হতে পারে, অথবা ইদানীং এই গোছের গড-ম্যানদের প্রতি তার বিশ্বাস বা ভক্তি-শ্রদ্ধা একেবারে শূন্য বলেও হতে পারে। চেলাটির অপ্রসন্ন চাউনি এবার মেয়ের দিকে—বাবার মুখের ওপর এমন ঝাপটা মারা কথা বরদাস্ত করার ইচ্ছে নেই, আবার মেয়েছেলেকে বলেই বা কি।

কিন্তু এর পরেও অবধূতটির বেশ প্রসন্ন সপ্রতিভ মুখ। বললেন, অসুবিধে না হলেও সামনের এই বার্থে তোমার বদলে একটা রক্তাম্বর-পরা লোককে দেখতে তোমার মায়েরই কি ভালো লাগবে মা? তা ছাড়া ট্রেনে উঠে যদি দেখতে তোমার মা আর তুমি এই দুটো পাশাপাশি বার্থ পেয়েছ—তাহলে তোমারও ভালো লাগত না? চেলার দিকে তাকালেন, কিরে, কথা শুনবি না দাঁড়িয়েই থাকবি?

সঙ্গে সঙ্গে করিডোর থেকে একজন ভক্তর অসহিষ্ণু গলা।—এই পেটো কার্তিক, বাবা যা বলছেন চটপট করে দে না—অবাধ্য হওয়াটা তোর রোগে দাঁড়িয়েছে—না?

অবধূত মানুষটির বিবেচনা-বোধ প্রখর বলতে হবে। আর কথা বলার ধরনও সরস। ও-দিকে পেটো কার্তিক অভিহিত চেলাটি এক হ্যাঁচকা টানে বালিশসুদ্ধু পাতা বিছানা ওপরের বার্থে ফেলার মধ্যেই তার মেজাজ বুঝিয়ে দিল। শিকল ধরে ঝুলে নিজেও উঠে গেল। হাতের ঝাপটায় চাদর টান করে তার ওপর বালিশ পেতে ঝাঁঝালো গলায় জিগ্যেস করল, জিনিস-পত্রগুলোও কি ওপরে আসবেন না তাঁরা নিচেই থাকবেন?

বাবার মুখে বাৎসল্যের হাসি—রাতে যা লাগবে ওপরে তোল, আর সব নিচের বার্থের তলায় থাক—আপনাদের অসুবিধে হবে না তো?

শেষেরটুকু আমার উদ্দেশে। বললাম, অসুবিধে হবে কেন···আপনি মিছি-মিছি নিজের অসুবিধে করলেন।

—ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে, আমি তাহলে নিচেই বসি খানিক? ভদ্রলোক অমায়িকও বটে।

—হ্যাঁ, বসুন।

বসলেন। সেই ফাঁকে তাঁর আরো কিছু ভক্ত ভিতরে ঢুকে পড়েছে। নিজের দু'পাশে আরো জনা চারেককে বসালেন তিনি। জনা-কতক দাঁড়িয়ে রইলো। দরজার বাইরেও অনেকে, ভিতর খালি হলে তাদের ঢুকতে পাওয়ার আশা। সৌজন্যের খাতিরে আমি একটু সরে বসে একজনের বসার জায়গা করে দিলাম। অবধূত ডাইনে বাঁয়ের দু'জন ভদ্রলোক আর মহিলার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। অসুখ আর ওষুধের প্রসঙ্গ কানে এলো।—আমি ফিরে আসা পর্যন্ত ওই ওষুধই চলুক, মায়ের ইচ্ছে হলে ফিরে এসে দেখব ওতেই বউমা ভালো হয়ে গেছেন—আর তুই পানজর্দা খাওয়া একটু কমা তো, অত খেলে ভালো লোকেরই অম্বল হবে—

আমাদের সামনে এক সারি লোক দাঁড়িয়ে। তাই কার প্রতি কি নির্দেশ ঠিক ঠাওর করা যাচ্ছে না। ও-দিকে পেটো কার্তিক নেমে এসে একে ঠেলে ওকে ধাক্কা দিয়ে তার কাজ সারতে লাগল। তার সেই বন্ধ মাথার ওপর দিয়ে আর কাউকে বা ঠেলে সরিয়ে ফলের ডালা, ডাব, সুটকেশ একটা বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি ভিতরে পাঠাতে লাগল। সেগুলো পায়ের ফাঁক দিয়ে বার্থের নিচে ঠেলে পেটো কার্তিক খিটখিটে গলায় বলে উঠল, আগে হাত পাখাটা দে—ভক্তির ঠেলায় যে বাবার দম বন্ধ হয়ে গেল—আপনারা একসঙ্গে এত লোক ঢুকে পড়লেন কেন—যাঁদের দর্শন হয়েছে বাইরে যান তো!

আধ ডজন মাথার ওপর দিয়ে পাখা এলো। পাশের মহিলার হাতে ওটা দিয়ে পেটো কার্তিক হুকুম করল, বাতাস করুন।

মাথার ওপর পাখা চললেও সত্যি গরম হচ্ছিল। ঠেলে-ঠুলে একটু জায়গা করে বাবার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তিন-চারজন বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে পেটো কার্তিকের হুমকি, দাঁড়ান কেউ ঢুকবেন না, ভিতরের

লোক বেরিয়ে গেলে একে একে আসুন আর বেরিয়ে যান—এই নীলু, বাবার রাবারের চপ্পল দে—এখন পর্যন্ত জুতো জোড়া পর্যন্ত বদলানো গেল না।

পেটো কার্তিকের দাপটে সত্যিই কেউ আর হুড়োহুড়ি করে ঢুকতে চেষ্টা করছে না। সে এরই মধ্যে জায়গা করে নিয়ে মেঝেতে বাবার পায়ের কাছে বসে গেছে। বাবা নিচু গলায় তাঁর ওপাশের বসা লোকটাকে কিছু বলছেন বা নির্দেশ দিচ্ছেন। হাতে হাতে জুতোর বাক্স এলো একটা। নিজের হাতে পেটো কার্তিক বাবার পায়ের শৌখিন স্যাণ্ডেল জোড়া খুলে নিজের পকেটের রুমাল বার করে তাঁর পায়ের তলা পর্যন্ত মুছে দিল। আমি বড় চোখ করে দেখলাম এরই মধ্যে বাবার পায়ের কাছে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট, একটা কুড়ি টাকার নোট, আর দুটো দশ টাকার নোট পড়েছে। পেটো কার্তিক রুমালটা কপালে ঠেকিয়ে নিজের কোলের ওপর রাখল। জুতোর বাক্স থেকে রাবারের চপ্পল বার করে বাবার পায়ে পরিয়ে দিয়ে স্যাণ্ডেল জোড়া সেই জুতোর বাক্সয় রেখে বার্থের নিচে ঠেলে দিল। অবধূতের সেদিকে চোখ নেই সামনের দাঁড়ানো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার সঙ্গে হেসে কথা বলছেন।—আমার কি ক্ষমতা, ও-বেটি আঙুল না নাড়লে কিছু করার সাধ্য আছে—তাঁর করুণা হয়েছে তাই তোমাদের মেয়ের মাথার ব্যামো সেরেছে।

নোট ক'টা এখন পেটো কার্তিকের এক হাতের দু' আঙুলের ফাঁকে ভাঁজ করা। বাসের কণ্ডাক্টাররা নোট ভাঁজ করে যে-ভাবে আঙুলের ফাঁকে রাখে। গম্ভীর মুখে ফতোয়া দিল, যার করুণাই হোক, বাবার দেওয়া মাদুলি-ধোয়া জল রোজ মেয়েকে খাওয়াবেন।

মহিলা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, খাওয়াচ্ছি বাবা, রোজ খাওয়াচ্ছি।

তাঁরাও একে একে বাবার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম সারলেন। এবারে তাঁর পায়ে দু'খানা পঞ্চাশ টাকার নোট পড়ল। উঠে দাঁড়ানোর ফাঁকে নোট দুটো ভাঁজ হয়ে পেটো কার্তিকের আঙুলের ফাঁকে।

এর পরের শৌখিন বাবুটি কাছে এসে হাত জোড় করে জিগ্যেস করল

আপনি দেরাদুন থেকে কবে ফিরছেন বাবা ?
—আমি জানি না, মা জানে। কেন, মামলার তারিখ কবে ?
—বারো দিন পরে বাবা।
—না, তার মধ্যে আমার ফেরার আশা কম—আর ফিরলেই বা কি, তোরা শালারা ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা করে মরবি, আর আমি সে-জন্য মায়ের কাছে একজনের জন্য কাঁদতে যাব ? বলেছি না, ভাইকে ধরে নিয়ে আর একদিন আমার কাছে, দেখি মিটমাট হয় কিনা—
—সে এলো না বাবা…
—তার বড় দোষ, সে তোকে বিশ্বাস করবে কেন ?
—আপনি একটু দয়া রাখবেন বাবা। বলেই হাঁটু গেড়ে বসে বাবার পায়ে আর রাবারের চপ্পলে কপাল ঘষল। উঠে দাঁড়াতে দেখলাম বাবার পায়ে এবারে একখানা একশ টাকার নোট। সেটাও পেটো কার্তিকের আঙুলের ভাঁজে আশ্রয় নিল।
এবারে যে লোকটির পালা তার পবনের জামা-কাপড় আধময়লা। রোগা শুকনো মুখ। সামনে এসে দাঁড়াতেই বাবার নির্দেশ, দেখি জামাটা তোল তো—
লোকটি তক্ষুণি জামা তুলল। আমরা পিছনে তাই বাবার দ্রষ্টব্য কি বুঝতে পারছি না। প্রসন্ন গলা শুনলাম, বাঃ, দুটোই তো বেশ সাফ হয়ে গেছে দেখছি, পুরো অজ্ঞান করে অপারেশন করা হল ?
—না, ওই জায়গায় ইঞ্জেকশন দিয়ে।…সবই আপনার অসীম করুণা বাবা…
—না-ও ঠেলা, আমি আবার কি করলাম, ডাক্তার বায়পসি করে বলল, ক্যানসার গ্রোথ্ নয়, সীস্ট-অপারেশন করে দিল, ফুরিয়ে গেল—তুই তো ভয়ে হেদিয়ে গেছলি।
গম্ভীর মুখে পেটো কার্তিকের মন্তব্য, বাবার কাছে এসে পড়েছে যখন, ক্যানসার হলেই বা ভয়ের কি ছিল।
কিন্তু লোকটার বোধহয় বদ্ধ ধারণা, বাবার কৃপাতেই ক্যানসার সীস্ট হয়ে.

গেছে। পায়ে কপাল ঠেকিয়ে আর ওঠেই না। উঠতে দেখা গেল বাবার পায়ে একটা দশ টাকার নোট।

এই প্রথমবার পায়ের দিকে চেয়ে নোট দেখলেন অবধূত। তারপর চেলাকে বললেন, ফলের ডালাটা বার কর তো—

চেলা হাত বাড়িয়ে ডালা টেনে আনল। বড় ডালা ফলে বোঝাই। অবধূত নিজের হাতে মস্ত এক থোকা আঙুর তুললেন।—ধর···

—এত কেন বাবা···।

—ধর না। আঙুর নিতে বড় বড় দুটো আপেল তুলে তার হাতে দিলেন। —এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ভালো করে একটু খাওয়া দাওয়া কর তো। আর রাত করিস না, বাড়ি যা।

চলে গেল। আমার মনে হল অসময়ের ওই আঙুর আর বড় দুটো আপেলের দাম তিরিশ টাকার কম হবে না। কিন্তু পেটো কার্তিকের মুখ-খানা দেখার মতো। অমন আঙুরের থোকাটা দিয়ে দেওয়া বরদাস্ত হওয়া কঠিন যেন। মেয়ের দিকে চোখ পড়তে ভ্রূকুটি করতে হল। সে পেটো কার্তিকের মুখ দেখে নিজের মুখ রুমাল চাপা দিয়ে হাসছে। চোখে পড়লে ওই পেটো কার্তিক এটা বরদাস্ত করবে না।

বয়স্ক আর বয়স্কাদের সঙ্গে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরাও দর্শন প্রণাম সেরে যাচ্ছে। প্রণামী পড়ছে। কিন্তু ফলের ঝুড়িও খালি হয়ে যাচ্ছে। অবধূত উদার হাতে যাকে যা ইচ্ছে দিয়ে দিচ্ছেন। অতবড় ফলের ডালা একেবারে খালি হয়ে গেল ; তখনো তিন চার জনের দর্শন প্রণাম বা আবেদন জানানো বাকি। পেটো কার্তিক থমথমে মুখে খালি ডালাটা জোরে ধাক্কা মেরে বার্থের নিচে পাঠিয়ে দিল। আমি প্রমাদ গুনছি। হাসি চাপার চেষ্টায় মেয়ের মুখ লাল।···দেড় মাস বাদে ওর মুখে আগের স্বাভাবিক হাসি দেখছি, তাই ভালো লাগছে। কিন্তু পেটো কার্তিকের চোখে পড়লে বিপদ। মেয়ের হাসি দেখে তার মায়ের ঠোঁটের ফাঁকেও হাসির আভাস।

একটি মেয়ের দর্শন প্রণাম শেষ হতে অবধূত জিগ্যেস করলেন, ফল সব ফুরিয়ে গেল বুঝি···?

গনগনে মুখে চেলাটি বলে উঠল, আমার কেনা ডাব দুটো আছে—বার করব ?

—তোর যেমন কথা, হাওড়া স্টেশন থেকে বালীগঞ্জ পর্যন্ত ডাব বয়ে নিয়ে যাবে ! থলেতে খেজুরের প্যাকেট আছে দেখ্, বার করে দে—

চেলার মুখ দেখে আমারই হাসি পাচ্ছে, মেয়ের দোষ দেব কি। এবারে বার্থের নিচে থেকে থলে টেনে বার করে একটা প্যাকেট বাবার হাতে দিল।

এরপরেই বাকি যারা ছিল ব্যস্ত। কারণ গাড়ি ছাড়ার সময় হল। প্রণাম করে প্রণামী রেখে তাড়াতাড়ি নেমে যেতে লাগল। হাতপাখা রেখে শেষের মহিলাও ব্যস্ত মুখে প্রণাম সারলেন। অবধূত চেলাকে বললেন, তুইও নেমে যা, তোর বার্থও দেখে রাখিস নি তো ?

—হুঁঃ, ছাড়ুক গাড়ি, আপনাকে না খাইয়ে আমি গেলাম আর কি—কোচ নম্বর জানা আছে, নীলুর কণ্ডাক্টর গার্ডকে বলেও যাবার কথা।

নেমেই যা না, এর পর তো দেড় দু'ঘণ্টার আগে ট্রেন থামবে না—রাত হয়ে গেলে এদের অসুবিধে হবে না !

চেলার তেমনি ঝাঁঝালো উত্তর, দেরি হয়ে গেলে আমি ওই করিডোরে বসে থাকব—আপনাকে না খাইয়ে আমি নড়ব কি করে—আপনার খাওয়া না হলে আমার খাওয়া আসবে কোত্থেকে ?···আপনি নিচে থাকলে নিজের ইচ্ছে মতো খেতে-শুতে পারতেন এখন তো আপনাকে এঁদের ঘড়ি ধরে খেতে শুতে হবে।

—তুই থাম্ তো, উঠে বোস।

উঠে গুরুর পাশে বসল। ভাঁজ-করা নোটগুলো এখনো আঙুলের ফাঁকে গোঁজা। পোড়া দাগের মুখ একটু শ্রান্তই লাগছে।

গাড়ি নড়ল। প্ল্যাটফর্মের মানুষদের মুখগুলো একটু একটু করে সরতে লাগল। মিনিট দুই লাগল প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যেতে। এতক্ষণের হট্টগোলের শেষ।

গুরু সম্পর্কে কৌতূহল নেই। শিষ্যর চরিত্রখানা সেই থেকে বেশ লাগছে।

আধুনিক চেলা গুরুকেও মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলে দেখছি। পেটো কার্তিক উঠে দাঁড়ালো। নোটের গোছা নিজের প্যান্টের পকেটে গুঁজল। ওপরের বার্থ থেকে বড়সড় ভি. আই. পি. অ্যাটাচি কেসটা নামিয়ে নিচের বার্থে রাখল। সেটা খুলতে প্রথমেই যে জিনিসটার দিকে চোখ গেল সেটা একটা চ্যাপটা স্কচ্ হুইস্কির বোতল। মুখ খোলা হয়নি। তার পাশে আট দশ প্যাকেট কিং সাইজের সিগারেট।

একটা প্যাকেট, লাইটার আর অ্যাশ-ট্রে বার করে গুরুর সামনে রেখে অ্যাটাচি কেস আবার ওপরের বার্থে তুলে দিল। সিগারেটের প্যাকেটের ওপর নাম দেখলাম রথ্ম্যান। সিগারেটের নেশা না থাকলেও খুব দামী ফরেন জিনিস ওটা, জানি। তন্ত্র-সাধক অবধূতটি বিলাসী এবং সুরসিক বলতে হবে। সফরে বেরুলে সঙ্গে স্কচ-হুইস্কি মজুত থাকে। বোতলটা যে আমরাও দেখলাম সে-জন্য তাঁর মুখে সংকোচের লেশমাত্র নেই। সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। মুখে সামান্য দ্বিধার হাসি, বললেন, এই এক বদ নেশা আমার, মায়েদের কি খুব অসুবিধে হবে?

পেটো কার্তিক আবার বসে পকেট থেকে নোটের গোছা বার করে গোনা শুরু করেছিল—তার এক-এক আঙুলের ফাঁকে এ-এক অঙ্কের নোট—একশ পঞ্চাশ কুড়ি দশ পাঁচ। পাঁচের নিচে নেই। জবাবটা মায়েদের দিক থেকেই আশা করে সে মা-মেয়ের দিকে তাকালো। মেয়ে একটা বাংলা বার্ষিক সংকলন বার করে বসেছে। আমি জবাব দিচ্ছি না দেখে স্ত্রী বিব্রত মুখে আমার দিকে তাকালেন। পেটো কার্তিকের ভুরুর মাঝে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। বললাম, এ-টুকুতে অসুবিধে হলে আমাকে তো গোটা কুপ রিজার্ভ করে যাতায়াত করতে হয়, অসুবিধে হবে না, আপনি খান।

প্যাকেট খুলে অবধূত আগে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।—চলে তো।

কখনো-সখনো শখ করে চলে, এত দামী সিগারেট নষ্ট না করাই ভালো।

মিটি মিটি হাসি। হাসলে সপ্রতিভ আধ-ফর্সা মুখখানা বেশ সুন্দরই দেখায়।—এ-সব দামী জিনিস সংগ্রহ করার ব্যাপারে আমার কোনো

কেরামতি নেই মশাই, জুটে যায়—না জুটলে সিগারেট ছেড়ে বিড়িতেও অসুবিধে হয় না। ধরুন—

একটা তুলে নিতে নিতে দেখলাম সিগারেট খাওয়ার ধাক্কায় ভদ্রলোকের আঙুল দুটো হলদে হয়ে গেছে। আমার সিগারেট নেওয়াটা মেয়ের পছন্দ হল না বুঝলাম। কারণও আছে। কিন্তু নিজে সেধে নিচের বার্থ ছেড়ে দিলেন, ভদ্রলোককে সদাশয় বলতেই হবে। শখে এক-আধটা চলে বলার পর একটা না নেওয়া অভব্যতা।···এরপর গাড়িতে হুইস্কির বোতল খোলা হতে দেখলে অবশ্য বরদাস্ত করা শক্ত হবে। কিন্তু সিগারেট ধরাবার ব্যাপারেই যা বিনয় দেখলাম, মনে হয় না ও-রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে।

নিজে লাইটার জ্বেলে আমার সিগারেটের মুখে ধরালেন। তারপর পিছনে ঠেস দিয়ে দু'পা বার্থে তুলে টান করে দিলেন। চেলা আধ-হাতটাক সরে বসল। টাকা গোনা থামিয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছে। মনে হল তার বিবেচনায় গুরু যা করলেন সেটা আমারই করা উচিত ছিল। অর্থাৎ তাঁর সিগারেট আমারই ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। চোখোচোখি হতেই গম্ভীর মুখে জানান দিল, অল্ ওভার দি ওয়ারলড্ বাবার বাঙালী ভক্ত আছে—বাবার ভালো জিনিসের কখনো অভাব হয় না। তারা বাবার জন্য এনে ধন্য হয়, সেবা করতে পেরে ধন্য হয়।

আমি আল্তো করে বলে বসলাম, বাবাও ধন্য হন না?

এমন দুঃসাহসের কথা পেটো বোধহয় আর শোনেনি। পোড়া দাগের মুখে রক্তকণার ছোটাছুটি শুরু হল। কিন্তু যাঁকে নিয়ে কথা তিনি জোরেই হেসে উঠলেন। চেলার দিকে চেয়ে বললেন, কেমন জব্দ, আর হড়বড় করবি? আমার দিকে তাকালেন, ঠিকই বলেছেন আপনি, শুধু ধন্য কেন, এত ঋণের বোঝা কাঁধে চাপছে শেষে নরকেও ঠাঁই হলে হয়।

এই বিনয় অবশ্য কানে একটু নতুন ঠেকল। ক্রুদ্ধ চেলাটি নোটের গোছা আবার নিজের প্যান্টের পকেটে চালান করল। টাকার জিম্মাদার সে-ই বোঝা গেল। অবধূত পিছনে ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট টানছেন, আর

মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। এক-আধবার স্ত্রী আর মেয়ের দিকেও। প্রণামী কত জুটেছে সে-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন বটে।

মুখুজ্জে মশাইয়ের দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো···আমি ওপরে উঠে যাব?

মুখুজ্জে মশাই শুনে আমি থমকে তাকালাম। আমার স্ত্রী আর মেয়েও। তিনি বললেন, ওঠার আগে গাড়ির গায়ের চার্টে আমার নামের ওপর এ মুখার্জী অ্যাণ্ড ফ্যামিলি দেখেছিলাম···ভুল করলাম না তো?

স্বস্তি। বললাম, ভুল করেননি। আমরা দশটা সাড়ে দশটার আগে খাই না, শুতে শুতে এগারোটা সাড়ে এগারোটা।

তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে আর একটু আরাম করে ঠেস দিলেন। ওই সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট ধরালেন। আগের টুকরোটা হাত থেকে নিয়ে চেলা জানলা দিয়ে ফেলে দিল। এটুকু হাত পিছনে নিয়ে গুরু নিজেই করতে পারতেন। আরো দৃষ্টিকটু লাগল সিগারেট ফেলে চেলাটি রক্ত-বর্ণ চেলির ওপর দিয়েই গুরুর পা-টিপতে লেগে গেল।

গুরু নির্লিপ্ত। সেবায় এমনি অভ্যস্ত যে খেয়াল করছেন কিনা সন্দেহ। সিগারেট টানার ফাঁকে মাঝে মাঝে স্থির চোখে আমাকে দেখছেন। দুই একবার স্ত্রীকে আর মেয়েকেও। এই সিগারেটটা শেষ হতে সোজা হয়ে বসলেন। নিজেই সিগারেটের শেষটুকু জানলা দিয়ে ফেলে পা টেনে নিয়ে সোজা আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সামনে একটু ঝুঁকে মুখের কিছু যেন একটু ভালো করে দেখে নেওয়ার দরকার হল। আবার সোজা হলেন। দু'চোখ অপলক, একটু বেশি মাত্রায় তীক্ষ্ণ। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই ভদ্রলোকের একটা বৈশিষ্ট্য আমার নজরে এসেছিল। না-ফর্সা না-কালো কমনীয় মুখের ওই দুটো চোখ। চাউনি স্বচ্ছ আবার গভীরও। কিন্তু ওই চোখ দেখে মনে হল, এক্সরে আই কি একেই বলে? সত্যিই আমার ভেতর দেখতে পাচ্ছেন?

স্ত্রী আর মেয়েও নিঃশব্দে তাঁকেই লক্ষ্য করছিল। শুধু আমি কেন, এ-রকম গড্‌ম্যান ওরাও কম দেখেনি। আমি নিস্পৃহ মুখে জিগ্যেস করলাম, কি দেখছেন?

চাউনি আবার সহজ। মুখেও সুন্দর হাসি।—মুখুজ্জে মশাই গায়ক লেখক না আর্টিস্ট ?

আবার থমকাতে হল একটু। গড্ম্যানদের দাপটের অস্তিত্ব অতি দুঃখের ভিতর দিয়েই আমাদের মন থেকে মুছে গেছে। এ-রকম হুট্-হাট্ কথা বা অবাক হবার মতো কিছু ক্রিয়া-কলাপ স্বচক্ষে দেখা আছে। নির্লিপ্ত জবাব দিলাম, জার্নালিস্ট···।

কোন্ কাগজের ?

বললাম।

কি-রকম জার্নালিস্ট ?

সানডে ম্যাগাজিন এডিটর।

তার মানে সাহিত্য বিভাগের। আবার সামনে ঝুঁকলেন একটু। কপাল নিরীক্ষণ করছেন মনে হল। মাথা নাড়লেন।—নাঃ, মিলছে না, আরো একটু বেশি কিছু হবার কথা।

মেয়ে বার্ষিক সংখ্যা খুলে কোনো লেখার চার লাইনও পড়েছে কিনা সন্দেহ। এবারে পেটো কার্তিককেই একটু জব্দ করার সুযোগ পেল। তাকে একবার দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে জবাব দিল, আমার বাবার অল্ ওভার দি ওয়ারলড্, বাঙালী আর হিন্দুস্থানী ভক্ত পাঠক আছে, বাবার উপন্যাস পড়ে তারা ধন্য হয়, চিঠি লিখেও ধন্য হয়।

দু'চোখ পেটো কার্তিকের মুখের ওপর তুলে বক্তব্য শেষ করল। ছেলেটাকে এই প্রথম হকচকিয়ে যেতে দেখলাম। একবার আমার দিকে আর একবার মেয়ের দিকে তাকাতে লাগল। আমি মেয়েকে ছোট করে ধমক লাগাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু অবধূতের উচ্ছ্বাসে ফুরসৎ পেলাম না।—তাই বলো, তাই বলো! ভাবছিলাম কপালে স্পষ্ট দেখছি উনি আর্টের কোনো লাইনে বড় কিছু, তবু এমন ভুল হল কি করে!···বাবার কি নাম বলো তো মা ?

আমি বললাম, ছেড়ে দিন না, বাপকে মেয়েরা সব-সময়েই বড় দেখে।

হাতের ঢাউস সংকলনের এক জায়গা খুলে মেয়ে সেটা অবধূতের দিকে এগিয়ে দিল। ওই স্পেশ্যাল নাম্বারে আমার লেখা থাকবে সেটা অবশ্য

কাকতালীয় কিছু নয়। তাঁর নাম পড়া হতেই চেলাটি ম্যাগাজিনটা হাত থেকে টেনে নিল। তার পরেই তার চোখ মুখ উদ্ভাসিত।—কি আশ্চর্য! এনার অনেক গল্পের সিনেমা তো আমি তিন চারবার করে দেখেছি—অ্যাঁ? এক লাফে আমার কাছে এগিয়ে এলো।—পায়ের ধুলো দিন সার, না জেনে খুব অপরাধ করেছি।

পা গুটিয়ে নিয়ে বললাম, জায়গায় গিয়ে বোসো, আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা খুব মিথ্যে নয়, আমি লোকটা তেমন সাদাসিধে নই।

অবধূত চোখ বড় বড় করে ফেললেন, কি ব্যাপার রে—কিছু গোল বাঁধিয়ে বসে আছিস বুঝি? তোকে নিয়ে আর আমি বেরুবো না। আমার দিকে ফিরলেন, কি করেছে?

হেসে জবাব দিলাম, কিছু না, প্ল্যাটফর্মে আমার কথা-বার্তা ওর একটু ত্যারছা মনে হয়েছিল। কিন্তু আপনার প্রতি ওর ভক্তিতে একটুও খাদ নেই।

উনি চেলাকে বললেন, বসে নিজের নাক-কান মল এখন, তোর স্বভাব আর বদলাবে না। পরে আমাকে আবার একটু ভালো করে দেখে নিলেন।—তা আমার মুশকিল কি জানেন, সাহিত্য জগৎ ছেড়ে আমি কোনো জগতেরই কিছু খবরর রাখি না, রোজ খবরের কাগজে চোখ বোলানোরও ফুরসত মেলে না। যাক, একজন গুণী লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হল এ-টুকুই আনন্দ।

ভদ্রলোকের কথা-বার্তার ধরন বেশ। ভক্তদের সঙ্গে যখন কথা কইছিলেন তখনো খুব একটা সব-জান্তাভাব দেখিনি। অলৌকিক জ্ঞান বুদ্ধির জলুস দেখাতে না এলে আমার বিরক্তির কারণ নেই। নিজে থেকে নিচের বার্থ ছেড়ে দিলেন সে-জন্যও আমার মনে মনে একটু কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আবার একটা সিগারেট ধরালেন। আমাকেই দেখছেন।—মুখুজ্জে মশাইয়ের জন্ম বোধহয় সেপ্টেম্বরে···মানে ভাদ্র মাসে?

অনুমান সত্যি। কিন্তু এই পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার উৎসাহ বা কৌতূহল নেই। ফিরে জিগ্যেস করলাম. কি করে বুঝলেন?

—ভাদ্র মাসের জাতকের লক্ষণ দেখেছি ··আমারও ভাদ্রেয় জন্ম।

—তাহলে আমার সঙ্গে আপনার কিছু মিল আছে বলছেন ?

—না চেহারার মিলের কথা বলছি না · লক্ষণের মিলটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।

বোঝার আগ্রহও নেই। তবু একটু খুশি করার জন্য বললাম, ভাদ্র মাসেই জন্ম, সেভেনথ্ সেপ্টেম্বর নাইনটিন টোয়েন্টি।

হাসতে লাগলেন।—আমার থেকে তাহলে তিন বছর চারদিন পিছিয়ে আছেন···আমার ফোর্থ সেপ্টেম্বর নাইনটিন সেভেনটিন।

এবারে আমি অবাক একটু। চেহারা-পত্রে পঞ্চাশের নিচেই মনে হয়। অবিশ্বাসের সুরে বললাম, আপনার বয়েস ষাট বলতে চান ?

খুশির হাসিতে মুখখানা ভরাট। জবাব দিলেন, বয়েস ভাঁড়াতে হলে মাত্র ষাট বলব কেন, উত্তর কাশীতে একবার এক যোগীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার বয়েস খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ—তার ভক্তরা আমাকে বলল, বাবার বয়েস নব্বুই। শুনে আমি পালিয়ে বাঁচি।

শুনতে মন্দ লাগল না। লক্ষ্য করছি আমিও। ভদ্রলোক সরস বচন-পটু বটেই। কিন্তু ভক্তরা আরো বেশি অভিভূত হয় বোধহয় তাঁর চোখের আকর্ষণে। চেয়ে থাকেন যখন, মনে হয় চোখও কথা বলে। এত স্বচ্ছ অথচ গভীর চাউনি আমি কমই দেখেছি।

সিগারেট ফেলে ঘড়ি দেখলেন।—দশটা পঁচিশ—খাওয়ার পাট সেরে ফেলা যাক, কি বলেন ?

—হ্যাঁ···।

মেয়ের বোধহয় খিদে পেয়েছে। বলার আগেই উঠে খবরের কাগজ পেতে টিফিন ক্যারিয়ার রাখল। স্ত্রী তার সুটকেশ খুলে প্লাস্টিকের বড় ডিশ আর গেলাস বার করে একটু ধুয়ে নিলেন। তিনি জানালার ধারে, তাই ওঠার দরকার হল না।

ও-দিকে অবধূতের সঙ্গে দেখলাম পরিপাটি-ব্যবস্থা। পেটো কার্তিক একটা বড়-সড় প্লাস্টিকের সেট পাতল। বেশ বড় দুটো ডিনার ডিশ আর কাচের

গেলাস সাজালো। বড় একটা চামচ বার করল। ডিশের কোণে একটু নুন আর দুটো কাঁচা লঙ্কা রাখল। তারপর পেট-মোটা বেঁটে একটা টিফিন ক্যারিয়ার প্লাস্টিকের শিটের ওপর রাখল।

অবধূত করিডোরের জানলায় গিয়ে মুখে-হাতে জল দিয়ে এসে বসলেন। পেটো কার্তিক প্রায় বড় ডিশ জোড়া দুটো মোটা মোটা পরোটা তার ডিশে রেখে পরের বাটি খুলল। আর তার পরেই আমি আর মেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। মস্ত বাটিটা ভরতি পেল্লায় সাইজের পাকা পোনার খণ্ড। এক এক খণ্ডের ওজন দেড়শ গ্রামের কাছাকাছি হতে পারে। চামচে করে তার দু'খানা দ্বিতীয় ডিশে রাখা হল।

এ-দিকে আমাদের প্লাস্টিকের ডিশে লুচি আর আলুর দম। স্ত্রীর ডিশে পটলের তরকারি। আর আলুর দম ছাড়া বাটিতে মেয়ের জন্য একটা ডিমের কারি।

আধখানা লুচি আর আলুর দম মুখে তুলে দেখি অবধূত হাত গুটিয়ে চুপ-চাপ স্ত্রীর দিকে চেয়ে আছেন। গভীর চাউনিও একটু যেন বিষণ্ণ মনে হল। স্ত্রী-ও হয়তো খেয়াল না করেই তাকালেন তাঁর দিকে।

দু'-হাত জোড় করে অবধূত বললেন, মা-গো ছেলের একটা অনুরোধ রাখবেন?

আমার স্ত্রী হকচকিয়ে গিয়ে চেয়ে রইলেন।

—আপনার খুব হাই ডায়বেটিস দেখতে পাচ্ছি, তাই আলুর দমের বদলে পটলের তরকারি···এক টুকরো মাছ এখান থেকে দিতে অনুমতি পেলে আপনার এই ছেলে খুব তৃপ্তি করে খেতে পারবে।

যে-ভাবে মা-গো দিয়ে শুরু করলেন আর যে-ভাবে নিজে তৃপ্তি করে খেতে পারবেন বলে শেষ করলেন—আপত্তির কথা মুখে আনাও মুশকিল। স্ত্রী অসহায় চোখে আমার দিকে তাকালেন।

কিন্তু অনুমতি যেন পেয়েই গেছেন। অবধূত নিজে উঠে চামচসুদ্ধ মোটা বাটিটা হাতে নিয়ে নেমে এলেন। চামচে করে একটা মাছ তুলে ডিশে রাখতেই স্ত্রী আঁতকে উঠলেন, এত বড় মাছ খাব কি করে···

—ছেলের মুখ চেয়ে ঠিক খেতে পারবেন, আপনার হাই প্রোটিন ঠিক মতো পড়ছে না। দ্বিতীয় বারে একটু গ্রেভি তুলে দিলেন। তারপর তেমনি বড় আর একখণ্ড মাছ মেয়ের ডিশে দিয়ে বললেন, মাছ খাও, ডিম সরিয়ে রাখো, তোমার লিভারের গণ্ডগোল আছে, জিভের এক-পাশ কালচে দেখলাম—ডিম খাওয়া উচিত নয়—ওটা শেষ হলে আর একটা দেব।

মেয়ে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো একটু, তারপর হেসে ফেলে বলল, একখানা পরোটা দেবেন না?···চমৎকার গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ পাচ্ছি—

আনন্দে ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠলেন।—এই তো চাই—কার্তিক শীগগির পরোটা দে!

বাটি নিয়ে এবার আমার দিকে তাকাতেই তাড়াতাড়ি দু'হাতে নিজের ডিশ ঢাকলাম।—আর না, আর না, এবারে আপনি খান!

—দেখুন মশাই, মায়েদের নিয়ে আমার ভাবনা ছিল, না সরালে হাতের ওপরেই বাটি উপুড় করে দেব—খাওয়ার থেকে খাইয়ে কি কম আনন্দ নাকি! হাত সরান বলছি—

আমার ডিশেও তেমনি পরিপুষ্ট একটা খণ্ড পড়ল। বললাম, আপনাদের আর কি থাকল, ওই দেখুন কার্তিকের মুখ শুকিয়ে গেছে!

কার্তিক তক্ষুণি জোরালো প্রতিবাদ করল, কক্ষণো না! লোক পেলে বাবা ওই-রকম মিলে মিশে খান বলে সব সময় বেশি যোগাড় থাকে—ওই শেষের বাটিতে আরো তিন চার পিস মাছ আছে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, তাছাড়া আপনাদের আলুর দমের ভাগ একটু পাব না—খাসা চেহারা দেখছি।

আমার স্ত্রী তখনো খাওয়া শুরু করেননি। ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। অবধূত এক হাতে নিজের পরোটার ডিশটা তুলে সামনে ধরলেন, এতেই দিন—

চারটে আলুর দম দিতেই তিনি ডিশ সরালেন।—লাগলে আর থাকলে পরে চেয়ে নেব। ডিশ জায়গায় রেখে মাছের বাটি নিয়ে আবার মেয়ের

দিকে এগোতে সে বলল, আমি আর না, এই একটা মাছ খেলেই পেট প্রায় ভরে যাবে—

প্রায় ভরলে তো চলবে না, ডিম তুমি খাবে না বললাম না—ওটা কার্তিকের জন্য সরিয়ে রাখো, মাঝে-সাজে এক আধটা পোচ খেতে পারো — হাত সরাও, আমার খিদে পেয়ে গেছে।

মেয়ে হাসি মুখে আরো এক টুকরো মাছ নিল।

—ভেরি গুড। এবারে নিজের জায়গায় আয়েস করে বসলেন।—কার্তিক, আর দেরি করিস না, তুইও খেয়ে নে।

কার্তিক অম্লানবদনে আর একটা ডিশ বার করে বসে গেল।

খাওয়া চলল। ভিতরে ভিতরে এবার আমার একটু অবাক হবার পালা। ···আমি ভুক্তভোগী বলেই এ-সব লোকের ক্ষমতা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। স্ত্রী বা মেয়েরও নেই। এই ভদ্রলোককে ভালো লেগেছে কারণ, তান্ত্রিক অবধূত হলেও তাঁর মন জয় করার রীতি আলাদা। তাতে ভড়ং-চড়ং কম। কপাল দেখে বা লক্ষণ দেখে ভাদ্র মাসে জন্ম বলে দিলেন তাও আমার কাছে কোনো শক্তির নজির নয়!···কিন্তু স্ত্রীর ডিশে পটলের তরকারি দেখেই খুব হাই ডায়েবেটিস আঁচ করে ফেললেন। তাও না হয় হল, মেয়ের লিভার খারাপ কিনা জানি না, শরীর ভালো যাচ্ছে না বলে ইদানীং তাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে—সেই ডাক্তারও ওকে পারলে ডিম না খেতেই বলেছে, আর খেলে পোচ ছাড়া অন্য কিছু খেতে বারণ করেছে।

অবধূত খাইয়ে আনন্দ পান সে-তো দেখলামই। নিজেও বেশ ভোজন রসিক। আরো একটু আলুর দম চেয়ে নিয়ে ওই-রকম চার পিস মাছ আর তিনখানা ঢাউস পরোটা পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠলেন। পেটো কার্তিকও খুব পিছনে থাকল না। সে খেল চারখানা পরোটা, আমার স্ত্রীর দেওয়া আলুর দম ডিমের কারি, আর দু'পিস ওই দেড়শ গ্রাম-ওয়ালা মাছ। ততক্ষণে সে আরো অন্তরঙ্গ অমায়িক হয়ে উঠেছে। আমাদের খাওয়া হতে প্রায় হুকুমের সুরেই বলল, ডিশ-টিশ টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি যেমন

আছে থাক, খাওয়া হলে আমিই ধুয়ে নিয়ে আসছি—হরিদ্বার পর্যন্ত আপনাদের আর কুটোটি নাড়তে দিচ্ছি না—সার আমাকে যতো বাজে লোক ভেবেছেন, অতটা নই—বাবা সাক্ষি।

খাওয়ার পর অবধূত আবার সিগারেট ধরিয়েছেন। পলকা গম্ভীর মুখে সায় দিলেন, তা বটে। খুব ঠাণ্ডা ছেলে, অন্যের মাথা উড়িয়ে দেবার জন্য বোমা বানাতে গিয়ে হাত-মুখের ওই দশা—আজকালকার ছেলেরা বোমাকে পেটো বলে, তাই ওর নাম পেটো কার্তিক।

স্ত্রী আর মেয়েরও পেটো কার্তিকের মুখ নতুন করে নিরীক্ষণ করার পালা। সে হতাশ গলায় বলে উঠল, যা-ও একটু মন পাওয়ার চেষ্টায় ছিলাম, বাবা দিলেন পাংচারড করে।···আচ্ছা মা, হাত আর মুখের যে দশাই হোক, ওই করতে গিয়েই বাবার আশ্রয় তো পেয়ে গেলাম, আমার বরাত খারাপ কে বলবে—বাবা আমাকে নিজের কাছে রেখে শুধু প্রাণে বাঁচালেন না—পুলিসের হাত থেকেও বাঁচালেন।

যুক্তির কথাই। পেটো কার্তিককে সত্যিই এখন খারাপ লাগছে না।

খাওয়া হতে দুই টিফিন ক্যারিয়ার ডিশগুলো আর সাবান নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। কারণ গাড়ির গতি একটু শিথিল হয়েছে। ওর নামার স্টেশন আসছে।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো। ট্রেন তখন সবে থেমেছে। অবধূত তাকে সাবধান করলেন, রাতে আর খবরদার নাববি না বলে দিলাম, সকালের আগে আমার খবর নেবার দরকার নেই। তোর কোচ নম্বর কত?

জবাব দিয়ে পেটো কার্তিক আমাকে বলল, বাবাকে একটু দেখবেন সার তাহলে—

—তোমার বাবা সকলকে দেখেন আর আমি তাঁকে দেখব?

অবধূত তাড়া দিলেন, সর্দারি না করে তুই নাম এখন!

চলে গেল। অতি আপনার জনকে একলা রেখে যাওয়ার দুশ্চিন্তা মুখে।

আমার মনে পড়ল, হাওড়া স্টেশনের প্রণামীর টাকা সব ওর পকেটে। মনে হয়, অবধূতের ট্রেজারারও পেটো কার্তিকই হবে। তাই হয়তো এ নিয়ে কেউ কিছু উল্লেখ করল না।

ট্রেন ছাড়লে শোয়ার তোড়জোড় হবে। অবধূত নতুন সিগারেট ধরিয়েছেন। খাওয়ার পরে আমাকেও সিগারেট সেধেছিলেন। নিইনি। তোয়ালে আর সাবানের কেস নিয়ে স্ত্রী উঠলেন। শোবার আগে তাঁর বেশ করে হাত-মুখ না ধুলে চলে না। মেয়েও তাঁর পিছনে গেল।

অবধূত জিগ্যেস করলেন, আপনার স্ত্রীর ব্লাড-সুগার কতো?

—তিনশ'র ওপরে। খাবার আগে ত্বুবেলা ইনসুলিন নিতে হয়।

—নিজে নেন?

—হ্যাঁ।

—আজ আমাদের জন্যেই বাদ পড়ল···

—কোথাও বেরুলে এ-রকম বাদ পড়ে।

—ওঁর ব্লাড-সুগার কি হিরিডিটরি?

—না।

—মেয়ের তো বিয়ে হয়নি···আপনাদের কাছেই থাকে না হস্টেল-টস্টেলে থেকে পড়ে?

—আমাদের কাছেই থাকে।···কেন?

—আপনার স্ত্রীকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হল, তাই। সিগারেট মুখে তুলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

ওরা বাথরুম থেকে ফিরে আসতে আমি গেলাম। ততক্ষণে গাড়ি আবার নড়েছে। মনে হল, ডায়বেটিসের চিকিৎসা ভালো জানা আছে কিনা জিগ্যেস করলে ভদ্রলোক খুশি হতেন। কিন্তু আমি আর ও-দিক মাড়াতে রাজি নই। আমার স্ত্রীকেও রাজি করানো যেত না।

আমি ফিরে আসার পর অবধূত উঠলেন। বেরুলেন।

মেয়ে মন্তব্য করল, ভদ্রলোক সিগারেট খান বটে—থামা নেই, দরজা বন্ধ করার পরেও খাবেন না তো?

—কি করে বলব···কেমন দেখলি অবধূতকে ?
সাফ জবাব, অবধূতগিরির বুজরুকি বাদ দিলে বেশ ভালো।
স্ত্রী বিরক্ত।—তোব ও-ভাবে বলার দরকার কি ?
মেয়ে বলল, তবে তোমার ভাদ্রয় জন্ম, শিল্প বা সাহিত্য করো, মায়ের ডায়বেটিস, আমার ডিম খাওয়া বারণ—বেশ জল ভাতের মতো বলে গেলেন—এ-সব কি ওঁদের অকাল্ট সায়েন্সের মধ্যে পড়ে ?
স্ত্রী বাধা দিলেন, থাম না, এসে যাবেন···।
—এলেই বা, মাছ খাইয়ে মাথা কিনে ফেলেছেন নাকি যে ইচ্ছে মতো কথা বলতে পারব না ! হেসে ফেলল, যা-ই বলো, খাসা মাছ কিন্তু, আর পরোটাও খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের বাবা—একটাই তল করতে পারছিলাম না।
এবারে স্ত্রীর ধমক।—তুই থামবি ?
ফুঁ দিয়ে আমাব আর মেয়ের রবারের বালিশ ফোলানোর মধ্যে অবধূত এসে গেলেন। নিচের বার্থেও সুজনি পাতা হয়ে গেছে। আমার ওপরের বার্থ বাকি। সেটা নিজেই পাতলাম।
মা-কে একটু জব্দ করার জন্যেই হয়তো মেয়ে খুব নিরীহ মুখে অবধূতকে বলল, আপনি কি রাতেও সিগারেট খাবেন নাকি ?
ওর মা কেন, আমিও একটু বিব্রত বোধ করলাম। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন, না মা না, রাতে আর না—ইস্, তোমার অসুবিধে হচ্ছিল আমাকে বললে না কেন !
মেয়ে হাসি মুখেই মাথা নাড়ল।—জানলা দরজা সব খোলা ছিল, আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছিল না—আপনাকে জিগ্যেস করলাম বলে মায়ের মুখ দেখুন—তোমাকে বললাম না, মানুষ হিসেবে উনি দারুণ ভালো ?
প্রসন্ন মুখে হাসছেন ভদ্রলোক। মেয়ের দিকেই চেয়ে আছেন। বললেন, আর অবধূত হিসেবে দারুণ ভাঁওতাবাজ, এই তো ?
মেয়ে এবারে নিজের কলে নিজে পড়ল। মুখ লাল করে আত্মরক্ষার চেষ্টা।
—তা কেন···

তেমনি হাসছেন।—আমি যেমনই হই, মেয়ে তুমি কত ভালো এ কিন্তু নিজেও জানো না। আচ্ছা গুড্ নাইট।

উনি ওঁর জায়গায় উঠে গেলেন। আমি প্রথমে দরজা পরে মেয়ের দিকের জানলাও বন্ধ করলাম। স্ত্রীর মাথার জানলা খোলা থাকলো, ওটা বন্ধ করতে গেলে বাধা দেবেন জানা কথাই।

···এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। ওপরের সামনের বার্থে অবধূত নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। মেরুদণ্ড সোজা। দুচোখ বোজা। ঘড়ি দেখলাম। রাত সাড়ে তিনটে।

এরপর আবার ঘুম ভাঙলো সকাল সাড়ে পাঁচটায়। অবধূত তেমনি বসে আছেন। তবে এখন চোখ বোজা নয়। চোখোচোখি হতে হেসে একটু মাথা নাড়লেন। নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম, স্ত্রী-ও বসে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। মেয়ে ও-পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে।

আমার কেমন মনে হল সেই রাত থেকে সিগারেট খেতে না পেয়ে ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে। নিচে নেমে এলাম। ফিসফিস গলায় স্ত্রীকে বলতে তিনিও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আমি দাঁড়িয়ে অবধূতকে বললাম, আপনি নেমে এসে বসুন, এতক্ষণ সিগারেট খেতে না পেয়ে আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি।

তিনি হাসলেন, হাতের কাছে থাকলে খেয়ে যাই—আবার না খেলেও কষ্ট-টষ্ট খুব কিছু হয় না···ব্যস্ত হবেন না, ওঁরা উঠুন—

স্ত্রী উঠে বসেই আছেন, উনিই নিচে নেমে বসতে বললেন আপনাকে।

খুশি মুখে নেমে এলেন। কাঁধে তোয়ালে, এক-হাতে সোপ কেস্, টুথ-ব্রাশে পেস্ট লাগানো, অন্য হাতে সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার। আমাকে বললেন দরজাটা খুলুন, এ-পাট সেরে আসি।

আধ-ঘণ্টা বাদে ফিরলেন।···আমি রাত সাড়ে তিনটে থেকে ওঁকে বসা দেখেছি, তারও কত আগে থেকে বসেছিলেন জানি না। কিন্তু তরতাজা মুখ। হাতের তোযালে হুকে ঝুলিয়ে টুথ-ব্রাশ আর সাবান ওপরের বার্থের

ভি. আই. পি. ব্যাগে রাখতে রাখতে বললেন, পর পর তিনটে সিগারেট খেয়ে এলাম, মা-মণির ঘুম ভাঙার আগে আর খাচ্ছি না।
আর ঠিক তক্ষুণি মা-মণি আড়মোড়া ভেঙে এ-দিক ফিরল। একবার চোখও তাকিয়েছে। আবার বুজতে গিয়েও বুজল না। সামনের লোকের বসনের লালের ধাক্কায় ঘুম একটু চটে গেল বোধহয়। উঠে বসল। মেঝের স্যাণ্ডেলে পা গলাতে গলাতে বলল, আপনারা গল্প করুন, আমি বাবার জায়গায় গিয়ে শুই—এখনো অনেকক্ষণ ঘুমোবো।
সামনের সিঁড়ি দিয়ে প্রায় চোখ বুজেই ওপরের বার্থে উঠে গেল। ওর রাজসিক ঘুম। ইচ্ছে করলে বেলা ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ঘুমোতে পারে। তবে গত দেড় মাস ধরে ঘুমনো থেকে ছটফটই করত। আশা করছি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে ওর অন্তত উপকার হবে।
অবধূত আমাদের মুখোমুখি বসলেন। বললেন, গাড়ি ঘণ্টাখানেকের মতো লেট যাচ্ছে, ছ'টা ক'মিনিটে গয়া পৌঁছনোর কথা, সাতটা বেজে যাবে—গয়ার আগে ব্রেকফাস্টের আশা নেই।
ভদ্রলোক ব্রেকফাস্টের ব্যাপারটা নিজের ঘাড়ে তুলে নেবেন মনে হতে বললাম, ব্রেকফাস্ট অন্ মি, আগে থাকতেই বলে রাখছি।
হাসছেন মিটিমিটি।—কেন, মাছের জবাবে আলুরদম তো হয়ে গেছে। দুধের বদলে ঘোল।
ঘোল কি দুধের থেকে খারাপ জিনিস নাকি মশাই! অবস্থা বিশেষে দুধ বিষ, ঘোল অমৃত।...তা আমার আপত্তি করার কোনো কারণ নেই, এই জীবনটা পরের ওপর দিয়েই দিব্বি চালিয়ে যাচ্ছি।
হাসতে গিয়ে আমার স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তে একটু থমকালেন। উনি আমার দিকে পিঠ রেখে জানলা দিয়ে দূরের দিকে চেয়ে আছেন। অপলক চোখে খানিক তাকে দেখার কারণ কি ঘটল বুঝলাম না। সকালের তাজা হাসি মুখখানা একটু যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। কালও একবার এই ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। উঠলেন। নিজের ওপরের বার্থ থেকে ভি. আই. পি. ব্যাগটা নামিয়ে আবার বসলেন। পাশে লাইটার আছে, সিগারেট নেই।

অর্থাৎ ফুরিয়েছে। ওটা খুলে আর একটা ডবল প্যাকেট বার করলেন। কিন্তু সেই ফাঁকে এমন কিছু চোখে পড়ল যে ভিতরে ভিতরে বেশ অবাক আমি। কাল রাতে বিলিতি হুইস্কির বোতলটা পুরো ভরতি দেখেছিলাম। আজ এই সকালে দেখছি বোতলের জিনিস অনেকটা নেমে এসেছে। বোতলটা শোয়ানো অবশ্য, কিন্তু তবু বেশ বোঝা যায়। যেটুকু কম সেটুকুর সদ্গতি রাতের মধ্যেই হয়েছে সন্দেহ নেই।

ব্যাগ বন্ধ করলেন। ওটা পাশেই পড়ে থাকল। প্যাকেট খোলার ফাঁকে স্ত্রীকেই লক্ষ্য করছেন। একটা সিগারেট বার করলেন। বারকয়েক সেটা প্যাকেটে ঠুকে স্ত্রীকেই জিগ্যেস করলেন, মায়ের কি রাতে প্রায় ঘুম হয় না নাকি?

স্ত্রী জানলার দিক থেকে মুখ ফেরালেন। অস্ফুট জবাব দিলেন, হয়…।

আমি জানি হয় না। একদিন দু'দিন নয় প্রায় চৌদ্দ বছর যাবতই হয় না। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ অবাঞ্ছিত আমার কাছে।

সিগারেটটা হাতে করেই কিছুটা সরে গিয়ে স্ত্রীর মুখোমুখি বসলেন তিনি। বেশ গম্ভীর।—মা, ছেলেকে যে হাতখানা একটু দেখাতে হবে।

বিব্রত মুখে স্ত্রী আমার দিকে তাকালেন।

আমি ঘর-পোড়া গোরু। এ-সবে কোনদিনই বিশ্বাস ছিল না—এখন তো বিরক্তিকর। কিন্তু তাহলেও ভিতরে মানুষটা আমি খুব সবল নই। স্ত্রীর স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে উতলা হবার মতোই কিছু বলে বসার সম্ভাবনা। কারণ তাঁর দেহের স্বাস্থ্য মনের স্বাস্থ্যের খবর আমি জানি। আপত্তির সুরেই বললাম, থাক না—আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু জানার কৌতূহল নেই।

দু'চোখ আমার মুখের ওপর ফেরালেন। এ সেই চোখ। স্বচ্ছ অথচ গভীর ব্যঞ্জনাময়। এই দৃষ্টির প্রভাব তুচ্ছ করার মতো নয়। বললেন, আপনার মনের ভাব বুঝতে পারছি। আমি গায়ে পড়ে কারো ভবিষ্যৎ বলতে যাই না। নিজের শিক্ষার জন্যেই একবারটি মায়ের হাতখানা দেখতে চাইছি… একবারটি দেখান মা।

অগত্যা স্ত্রী আস্তে আস্তে বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিলেন। ঝুঁকে বেশ নিবিষ্ট

চোখে দেখলেন খানিক।—ডান হাতও একটু দেখি···

দেখলেন। তারপর সরে এসে আমার মুখোমুখি বসলেন। গম্ভীর ঠিক নয়, আরো বিষণ্ণ মনে হল।—আপনাকেও একটু বিরক্ত করব, ডান হাতটা একটু দেখান।

বিরক্ত নয়, আমার রেগে যাওয়ারই কথা। কিন্তু এই মুখের দিকে চেয়ে হাত কেন যেন আপনিই উঠে এলো। কম করে মিনিটখানেক দেখলেন উনি। তারপর পিছনে গা ছেড়ে দিয়ে বড় নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। হাতের সিগারেটটা ধরালেন। স্ত্রী এখন উতলা মুখে তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। সিগারেটে পর পর দু'তিনটে টান দিয়ে বিষণ্ণ গম্ভীর চোখে অবধূত আমার দিকে তাকালেন। ভারী গলায় বললেন, আপনাদের একমাত্র ছেলেটি বুঝি অনেককাল ভুগে কিছুদিন আগে চলে গেল···?

গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। স্ত্রীও স্তব্ধ। অবধূত এই দুঃখের অতীত দেখার জন্য হাত দেখতে চেয়েছেন এ কে ভাবতে পারে! আমি বিস্মিত বিমূঢ় চোখে তাঁর দিকে চেয়ে আছি।···হ্যাঁ, হাত দেখার আগেও এঁকে বিষণ্ণ মুখে চেয়ে থাকতে দেখেছি।

—আপনি হাত দেখে এটা বুঝে ফেললেন?

—হাত আমি খুব কমই দেখি।···দরকার হয় না। কাল রাতেও মায়ের ভিতরে আমি শোকের ছায়া দেখেছিলাম। আজও দেখলাম। শিওর হবার জন্য আজ হাত দেখতে চাইলাম।···কত বছর বয়েস হয়েছিল?

—আঠারো।

—অনেক দিনের পুরনো অসুখ?

—হ্যাঁ, মাসকুলার ডিসট্রফি···চৌদ্দ বছর ভুগে দেড় মাস আগে চলে গেল।

এবারে শান্ত মুখেই স্ত্রী জিগ্যেস করলেন, আপনার হাতে এলে আপনি কিছু করতে পারতেন?

—কিচ্ছু পারতাম না মা, কেউ পারত না।

নিজের অগোচরে একটু রুক্ষ স্বরে বলে উঠলাম, না পারলেও আপনারা

পারার আশ্বাস দেন কেন? অভয় ছান কেন? সতেরো রকমের ক্রিয়া-কলাপ করান কেন?

যে-ভাবে চেয়ে রইলেন, আমি নিজেই অপ্রস্তুত একটু। চাউনির মতো গলার স্বরও ঠাণ্ডা।—আপনি অনেকের কাছেই গেছলেন?

—আমার কোনদিনই এ-সবে খুব বিশ্বাস ছিল না…এ রোগের চিকিৎসা নেই শোনার পর স্ত্রীর ইচ্ছেয় যেতে হয়েছে। চুপচাপ বসে তো আর দেখতে পারি না।…প্রচার আছে, ভারতবর্ষের এ-রকম প্রায় সব গড্-ম্যানের কাছে ছেলে নিয়ে আমরা গেছি।

সিগারেট এরপর হাতেই পুড়তে থাকল। বিমনা মুখে ভদ্রলোক বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। সিগারেটের আগুন আঙুল ছুঁই-ছুঁই হতে ওটা ফেলে দিলেন। নিজের মনেই বার দুই বললেন, গড্-ম্যান…গড্-ম্যান। আমার দিকে তাকালেন।—গডের হদিস কেউ কখনো পেয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু এ-টুকু মনে হয়, পেলে তার আর গড্-ম্যান হবার সাধ থাকে না।…আপনার বিচারে ভুল খুব নেই, তবু একটু আছে। মানুষ দুঃখ কষ্ট ভয় কারো না কারো কাছে জমা দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়। কিছু কাজ পেলে আমাদের গড্-ম্যান তারাই বানায়। তাদের বিশ্বাসের পুঁজি বাড়তে থাকে।

—যেটুকু কাজ পায় তা হয়তো আপনাদের কাছে না এলেও পেতে পারত।

—নিশ্চয়ই পেতে পারত, কিন্তু সব-সময় নয়। আমাকেই ধরুন। আমি ওষুধে বিশ্বাস করি, কিছু ওষুধ নিজেও জানি।…আপনাদের মেডিক্যাল সায়েন্সের ওষুধের কথা বলছি না, ও-ছাড়াও পৃথিবীতে কত রকমের ওষুধ আছে তা কে বলতে পারে? সে-রকম ওষুধ জানা থাকলে লোকের কাজ হয়।

—কিন্তু তার জন্যে কারো অবধূত কারো মহারাজ হয়ে বসার দরকার কি? ওষুধ দিলেই তো হয়? হাসলাম।

—আপনার খুব রাগ আমাদের ওপর।…কিন্তু আমাদের কাছে লোক

এলে তবে তো ওষুধ! আসবে কেন? আসে ভয়ে, ভয় জমা দিতে। কিছু পেয়ে হোক বা অপরকে দেখে হোক, তার ভিতরে বিশ্বাসের প্রবণতা আসে।···এই বিশ্বাস কি জিনিস আপনি জানেন? আপদে-বিপদে এর মতো ক্যাটালিটিক এজেন্ট খুব কম আছে। সব ছেড়ে শুধু এই বিশ্বাসের জোরেই কত লোককে কত রকমের বিপদ কাটিয়ে উঠতে দেখেছি শুনলে আপনি অবাক হবেন। মাঝখান থেকে নাম হয়ে যায় আমাদের। আর পতনও হয় শুধু আমাদেরই। কারণ সেই অহঙ্কারে আমরাও ওদের দেওয়া গড্-ম্যানের নামাবলীটা আঁকড়ে থাকি।

অবধূত সিগারেট ধরালেন।

আমি চেয়ে আছি। এমন সহজ যুক্তির কথা কম শুনেছি বটে। এই গোছের লোকের সঙ্গে এমন সদয় অথচ অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগও কম পেয়েছি। লোকটি যে দস্তুর মতো শিক্ষিত তাতেও ভুল নেই। নইলে ক্যাটালিটিক এজেন্টের উপমা দিতেন না। কিন্তু আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছি ছেলের প্রসঙ্গের পর থেকে।

—কি দেখছেন?

বললাম, আপনার কিছু ক্ষমতা আছে।

এবারে চোখে কৌতুকের আভাস।—কি রকম?

—কাল আমার কপাল দেখে জন্ম মাস আর পেশা বলে দিলেন, স্ত্রীর হাই ডায়বেটিস বললেন আর তাঁর ভিতরে শোকের ছায়া দেখলেন, মেয়ের জিভ দেখে লিভারের কথা বললেন, আর আজ আমাদের এত বড় শোকের ব্যাপারটাও আপনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

হেসে উঠলেন।—একটু-আধটু আছে অস্বীকার করছি না—কিন্তু জেনে রাখুন, এই ক্ষমতার একটুও ঐশ্বরিক নয়—এ-ও একটা সায়েন্স—এই সায়েন্স ফলো করলে আপনিও এই ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন—লোকের কাছে আমরা অবশ্য এটাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলেই ক্যাশ করে থাকি।

বড় ভালো লাগল। হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে বসে ভক্ত সমাবেশে দেখে

এই মানুষ যে এমন নিরহঙ্কার একবারও ভাবতে পেরেছি!

স্টেশন প্রায় এসেই গেছে খেয়াল করিনি। গাড়ির গতি খুব শ্লথ। অবধূত বললেন, এবারে গলা ভেজানোর তোড়জোড় করা যাক—আপনি ব্যস্ত হবেন না, ট্রেন থামলেই কার্তিকের শ্রীমুখ দেখা যাবে।

—বাবা আমারও চা নিও। ওপরের বার্থ থেকে মেয়ের গলা। গলার স্বর থমথমে। চেয়ে দেখি সে শেকলের কাছে কাত হয়ে অবধূতকেই দেখছে। চোখ লাল-লাল।

অবধূত বললেন, যাক, ঠিক সময়ে তোমার ঘুম ভেঙেছে। চট-পট নেমে মুখ-হাত ধুয়ে এসো।

আমার মনে হল মেয়ে জেগেই ছিল। চুপ-চাপ নেমে এলো। তারপর অবধূতকে অপ্রস্তুত করে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

—এ কি গো মা! সকালে উঠেই প্রণাম কেন?

ভার-ভার গলায় মেয়ে জবাব দিল, আপনার কার্তিকের থেকেও আমি বেশি অপরাধ করেছিলাম—তাই।

তোয়ালে সোপ-কেস আর পেস্ট লাগানো টুথ-ব্রাশ হাতে করে বেরিয়ে গেল।

অবধূতের বিড়ম্বিত মুখ আরো কমনীয় দেখালো।—কি কাণ্ড, মেয়ে তো ওপরে শুয়ে আমাদের কথা সব শুনেছে!

বললাম, শোনার মতো কথা, শুনে ভালোই করেছে।

ট্রেন থামার এক মিনিটের মধ্যে পেটো কার্তিক হাজির। মেঝেতে সোজা শুয়ে পড়ে বাবার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম সারল। তারপর উঠে আমার দিকে ফিরে বলল, আজ আর বঞ্চিত করবেন না সার, পায়ের ধুলো নিতে দিন। তারপর হাত ঠেলে সরিয়ে আমার স্ত্রীকেও একটা প্রণাম ঠুকে উঠল।

ব্রেক-ফাস্টের মেনু ব্রেড-বাটার, ডবল ডিমের পোচ, দু'পট চা আর কলা পেলে কলা। আর ছোট এক পট চা চিনি ছাড়া।

স্ত্রী মেয়ের দিকে চেয়ে এক আঙুল দেখিয়ে ইশারা করতে ও বলল, মা

সিঙ্গল পোচ খাবে বলছে, আমার কিন্তু ডবলই চাই।

পেটো কার্তিক গজ-গজ করে উঠল, এখন কলার খোঁজ—ডালা ভরতি ফল কাল সব দাতব্য করে বসলেন!

আমরা হাসছি। অবধূত বললেন, তুই কিছুই সরিয়ে রাখিসনি বলতে চাস?

—বাদাম আখরোট কিসমিস আছে, বিস্কুট আছে, মেওয়ার সন্দেশ আছে, চানাচুর আছে।

অবধূত টিপ্পনীর সুরে বললেন, ডিম টোস্ট কলা আর ওইসব দিয়েই কষ্ট করে ব্রেক-ফাস্টটা সেরে ফ্যাল—কি আর করবি?

এই ছেলেটাকেও আজ আমার ভালো লাগছে। বোমা-বাজ ছেলেটাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ভদ্রলোক ভালো ছাড়া মন্দ কি করেছেন।

চা-পর্ব শেষ হবার বেশ আগে ট্রেন ছাড়ল। পেটো কার্তিক জোর করেই দিদিকে কলা মিষ্টি খাওয়ালো, একটা মাত্র মিষ্টি খেলে মায়ের ক্ষতি হবে কিনা জিগ্যেস করল—হবে শুনে তাঁর ডিশে অনেকটা চানাচুর ঢেলে দিল।—চায়ের সঙ্গে খান, বেশ ভালো চানাচুর।

এই অন্তরঙ্গ খুশির হাওয়া আমরা ভুলতে বসেছিলাম।

খাওয়া শেষে ট্রে-তে জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে একদিকে সরিয়ে রেখে পেটো কার্তিক বলল, দিদি আপনার কালকের সেই বইখানা দেবেন, সারের গল্পটা পড়ে ফেলি—

বলার ধরনটা আমাকে একটু অনুগ্রহ করার মতো। দিদি বই বার করে দিল।

অবধূতকে জিগ্যেস করলাম, আপনি আপাততঃ তাহলে দেরাদুনেই থাকছেন কিছুদিন?

—দিন পনেরোর বেশি নয়, তার মধ্যে দিন দুই মুসৌরিতেও কাটানোর ইচ্ছে আছে।

—চেঞ্জে?

—আমার আবার চেঞ্জ, যাচ্ছি এক ভক্তর টানা-হেঁচড়ায়।

বইয়ের দিকে চোখ, পেটো কার্তিকের গম্ভীর মন্তব্য।—ভক্ত টাকার আণ্ডিল, কিন্তু হাড় কেপ্পন, আমার সেকেণ্ড ক্লাসে যাবার ভাড়া পাঠিয়েছে ···ফাঁক পেলে আমি ঠিক শুনিয়ে দেব।

অবধূত হাসি চেপে ধমকে উঠলেন, যেটুক জোটে তাতেই খুশি থাকতে পারিস না কেন?

তেমনি গম্ভীর উত্তর।—পারলে আর চেলাগিরি করব কেন, বাবাই হয়ে বসতাম।

মেয়ে তো বটেই আমার স্ত্রী-সুদ্ধ হেসে ফেললেন। গুরু-শিষ্যের এমন সদালাপও কম শোনা যায়।

অবধূত জিগ্যেস করলেন, আপনি হরিদ্বারে কতদিন থাকবেন?

—ভালো লাগলে ওই-রকমই—দিন পনেরো।

দু'চার দিনের জন্য দেরাদুনে চলে আসুন না—ভালোই লাগবে।

—আগে গেছি। ওখানে যাবার মতো গরম জামা-কাপড় সঙ্গে আনিনি, আমার আবার অল্পেতে ঠাণ্ডা লাগার ধাত···হরিদ্বারেই নিরিবিলিতে দিন কতক কাটিয়ে আসব, তাছাড়া এখন বেড়ানোর মন খুব নেই।

—হরিদ্বারে থাকছেন কোথায়, কংখল রামকৃষ্ণ মিশনে?

—সে রকমই ইচ্ছে।

—ইচ্ছে মানে···লিখে জায়গা বুক করেননি?

—এবারে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম, সেটা করা হয়নি।

—তাহলে তো মুশকিল, জায়গা পাবেন মনে হয় না। হাতের সিগারেট জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে হেসে বললেন, না মশাই আমি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করছি না—এই সময় থেকেই সেখানে যাত্রীর ভিড় হতে থাকে

—মহারাজদের সঙ্গে জানাশোনা আছে?

—তা আছে, কিন্তু ঘর খালি না থাকলে আর জায়গা দেবেন কোথা থেকে···তখন ভালো কোনো ধরমশালায় ওঠার চেষ্টা করব।

—কেন, মনের এই অবস্থা নিয়ে আপনি একজন গুণী মানুষ যাচ্ছেন—তাঁদের নিজেদের কারো ঘর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

হেসে জবাব দিলাম, সেই উচিত কাজটি তাঁরা করতে যাচ্ছেন বুঝলে আমি আগেই পালাব।
অবধূত বললেন, দেখুন পান কিনা, না পেলেও কিছু অসুবিধে হবে না, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
বই থেকে মুখ না তুলে পেটো কার্তিক মন্তব্য করল, মুখ দিয়ে যখন একবার বেরিয়েছে কংখলে ঘর পাবেন না—পাবেন না।
এবারে সত্যিই ধমকের সুরে অবধূত বললেন, তোর চোখ কোন্ দিকে আর কান কোন্ দিকে।
নিরুত্তর। নির্লিপ্ত।
ট্রেন মোগলসরাই পৌঁছতেও প্রায় ঘণ্টাখানেক লেট। গাড়ি থামতেই দু'রকমের ব্যাজ আর তকমা-পরা লোকের তৎপর আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। বেনারসে লাঞ্চ। অর্ডার নেবে। ট্রেন এক ঘণ্টার ওপর লেট হয়ে এক-দিক থেকে ভালোই হল। ঠিক সময়ে অর্থাৎ সাড়ে বারোটা নাগাদ লাঞ্চ পাব। একটা লোক আমাদের কেবিনে মুখ বাড়াতে তাকে ডাকলাম। সকলের লাঞ্চও 'অন্ মি'ই করতে চাই। এবং সেটা খুশি মনেই।
কিন্তু আমাকে অবাক করে অবধূত তাকে বলে দিলেন, দরকার নেই, যাও।
চলে গেল। আমি বললাম, সে কি, বেনারসে লাঞ্চ হবে না?
—হবে আশা করা যায়···সেখানে গিয়ে দেখা যাক না কি জোটে।
—কিন্তু বেনারসে আধ-ঘণ্টা স্টপ, তখন অর্ডার দিয়ে কিছু পাওয়া যাবে?
মুচকি হাসলেন। মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার বাবার বোধহয় বেজায় খিদে পেয়ে গেছে, বেনারসে কিছু না জুটলে বিপদেই পড়ে যাব দেখছি···।
বইয়ের দিকে চোখ, পেটো কার্তিকের ঠোঁটেও হাসি ঝুলছে।
অবধূত তেমনি হেসেই আবার বললেন, সকালের ব্রেকফাস্ট তো আপনার ওপর দিয়ে হয়ে গেছে, এরপর কাল হরিদ্বার পর্যন্ত যা কিছু সব আমাদের অদৃষ্টের ওপর দিয়েই হয়ে যাবে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বুঝলাম বেনারসে কারো কাছ থেকে খাবার আসবে। তবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। প্রথমত, এতে ঠিক অভ্যস্ত নই। দ্বিতীয়ত কলকাতা বা হাওড়া থেকে না-হয় নিজে টিফিন ক্যারিয়ার বোঝাই করে খাবার এনেছিলেন। কিন্তু এখানে আবার তিনজন বাড়তি লোকের খাবার কে জোগাবে?

ট্রেন ছাড়লে মোগলসরাই থেকে বেনারস সামান্যই পথ। ··মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। তার আগেই পেটো কার্তিকের আমার গল্প পড়া শেষ। মেয়েকে বই ফেরত দিতে দিতে বলেছে, ফার্স্ট ক্লাস—আর একবার সারের পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।

আর অবধূত হেসে মন্তব্য করেছেন, কার্তিককে কিন্তু হেলা-ফেলা করবেন না—দস্তুর মতো বি. এ. ফেল। তাঁর এই কথার মধ্যেই বেনারস এসে গেল। পেটো কার্তিকও চটপট উঠে পড়ল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তিনজন বয়স্কা মহিলা আর তিনজন বয়স্ক ভদ্রলোককে নিয়ে ফিরল। দেখলেই মনে হয় সকলেই অবস্থাপন্ন এঁরা। মহিলাদের বেশ-বাসের আড়ম্বর তেমন নেই, হাতে এক গাদা করে চুড়ি-বালা-আঙটি, গলায় মোটা হার, কানে হীরের দুল, দু'জনের নাকে হীরের ঝকঝকে নাক-ফুল। ভদ্রলোকদের পরনে পাট-ভাঙা ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি, ঝকঝকে সোনার বোতাম, কব্জিতে সোনার ব্যাণ্ডের ঘড়ি। আর প্রত্যেকের আঙুলে একটা করে হীরের আঙটি। মহিলাদের তিনজনেরই হাতে একটা করে প্যাকেট।

তাঁদের দেখে অবধূত হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকদের একজন জিগ্যেস করলেন, বাবার ট্রেনে কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না?

—কিচ্ছু না। তোমাদের মতো আপনারজনেরা থাকতে অসুবিধা করে কার সাধ্য—তা ভালো আছ তো সব? মায়েরা ভালো? ছেলে-মেয়েদের আনোনি বুঝি?

সামনে মহিলারা। একজন বললেন, ওদের সকলেরই স্কুল কলেজ··· আপনার ফেরার সময় দর্শন করবে।

হাতের প্যাকেট পায়ের কাছে রেখে তিনিই প্রথম মাথা রেখে প্রণাম করলেন। উঠতে দেখা গেল, পায়ের কাছে দু'ভাঁজ করে একশ টাকার নোট—একাধিক তো বটেই।

একে একে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মহিলাও প্যাকেট পায়ের কাছে রেখে ওই ভাবে প্রণাম করলেন। তাঁরাও ভাঁজ করা নোট রেখেছেন।

প্রণাম শেষ হতে অবধূত হাত দেখিয়ে তাঁর দিকের বার্থে বসতে বললেন। তাঁরা বসতে ভদ্রলোক তিনজন একে একে পায়ে কপাল ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠলেন। সামনের জন পিছনের জনকে বললেন, বাবার খাবার নিয়ে ওরা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আনতে বলো—

তিনি ও-দিক ফিরতে আমরা সরে গিয়ে বাকি দু'জনের বসার জায়গা করে দিলাম। অবধূত হাসি মুখে মহিলাদের মাঝখানে বসে তাঁদের বললেন, বোসো—এবারে আমি মস্ত এক গুণীজনের সঙ্গে সফর করছি—ইনি সাহিত্যিক ওমুক···এঁরা তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে। মহিলাদের জিগ্যেস করলেন, এঁর লেখা তোমরা পড়েছ?

বয়েস যার একটু কম তিনি হেসে জানান দিলেন, আমি অনেক বই পড়েছি, অনেক গল্পের সিনেমাও দেখেছি—

বড় নিঃশ্বাস ফেলে অবধূত বললেন, আমিই হতভাগা দেখছি—

যিনি বেরিয়ে গেছলেন তিনি একটা টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে ফিরলেন, তার পিছনে দু'জন লোকের হাতে বড়সড় দুটো করে ঝক-ঝকে কাঁসার পরাতের মতো, তার ওপর এনামেলের থালার ঢাকনা। জায়গা করার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পেটো কার্তিক প্যাকেটগুলো আর তিন গোছা নোট তুলে নিল। লোক দুটো কাঁসার দু'জোড়া ঢাকা পরাত মেঝেতে রাখল, ওগুলোর পাশে ভদ্রলোকের হাতের টিফিন-ক্যারিয়ার।

অবধূত বললেন, এত কি এনেছ—অ্যাঁ?

সামনের ভদ্রলোক হাত জোড় করে বললেন, মাছ আর গরম ভাত—আর কিছু না। একটু মাংস আনার ইচ্ছে ছিল, তা কার্তিকবাবু চিঠিতে জানালেন মাংস আনার দরকার নেই, আর কলকাতায় পাকা পোনাই খেতে হয়—

বাবার জন্য অন্য মাছের ব্যবস্থা করাই ভালো।

অবধূত হাঁ করে কার্তিকের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। আমার দিকে চেয়ে বললেন, ওর কর্তামো দেখুন।

হাত জোড় করে ভদ্রলোক হাসি মুখে কার্তিকের সহায় হলেন, এটা কার্তিকবাবুর সঙ্গে আমাদের ব্যাপার, উনি কেবল আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

—বেশ করেছে। নে এ-সব কোথায় রাখবি এখন ছাখ্, বাসনগুলো চটপট খালি করে দে—

একজন মহিলা বাধা দিলেন, ট্রেনে আবার বাসন খালি করবে কি করে, সব নষ্ট হয়ে যাবে—সঙ্গেই যাক, আপনার ফেরার সময় আমরা নিয়ে নেবার ব্যবস্থা করব।

এরপর খানিক ঘরোয়া প্রসঙ্গ আর ব্যবসার প্রসঙ্গে কথা হতে হতে গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেল। আর একবার পায়ের ধুলো নিয়ে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা নেমে গেলেন। ট্রেন ছাড়ল।

এবারের ব্যাপারটা কিন্তু হাওড়া স্টেশনের মতো খারাপ লাগল না। এই মানুষটিকে নিয়ে আমার আগ্রহ বাড়ছে। অনেক লোক যাঁর কাছে আসে তাঁর ওপর ঈশ্বরের বিশেষ দান কিছু থাকেই—শ্রীরামকৃষ্ণ এই গোছের কি-যেন বলেছিলেন। এই মুহূর্তে কথাটা মনে পড়ল কেন জানি না।

পেটো কার্তিক গম্ভীর মুখে বসে পকেট থেকে তিন থাক নোট বার করে গুনছে। অবধূত তার দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসছেন আর সিগারেট টানছেন। এক-এক থাকে পাঁচখানা করে একশ টাকার নোট আর একটা এক টাকার। সব মিলিয়ে পনেরশ' তিন টাকা। পেটো কার্তিক সবগুলো একসঙ্গে ভাঁজ করে এবারে নিজের প্যান্টের বাঁদিকের পকেটে গুঁজল। তারপর প্যাকেটগুলো খুলল। প্রত্যেক প্যাকেটে চকচকে টকটকে লাল সিল্কের চেলি আর কোয়ারটার হাত সিল্কের ফতুয়া। সেগুলো আবার প্যাকেটে রেখে পেটো কার্তিক বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। বলল, আমি যে একটা লোক বাবার সঙ্গে থাকি এ কারোর চোখেই পড়ে না।

আমরা হেসে উঠলাম। আলতো করে বাবা বললেন, টাকা-কড়ি তো সব আগের ভাগে তুই-ই হাতিয়ে নিস—
—হুঁ, আমি চিনির বলদ।
অবধূত ছদ্ম কোপে চোখ রাঙালেন, এই হারামজাদা, ওই টাকা থেকে তুই বিড়ি, সিগারেট, চপ, কাটলেট খাস না ?
লজ্জা পেয়ে পেটো কার্তিক চার আঙুল জিভ কাটলো। তারপর টিফিন-ক্যারিয়ারের গায়ে হাত রেখে বলল, ভাত গরম আছে, আর দেরি করে কি হবে ?
এক-একটা পরাতের ঢাকনা খুলতে আমাদের চক্ষু স্থির। প্রথমটাতে এক-গাদা বড় বড় মাছের ফ্রাই। তার নিচেরটাতে চিতল মাছের পেটির কালিয়া। ছ'পিস আছে, এক-এক পিসের ওজন আড়াইশ'র কম হবে না। তার পরের পরাতে আধ-হাতেরও বড় এক-একটা পাবদা মাছ—সর্ষের ঝাল। সে-ও আট ন'পিস হবে। ওটার নিচের পরাতে তোপসে মাছের পাতলা ঝোল—এও দেখার মতো সাইজ, গোটা বারো চোদ্দ হবে।
দেখেই আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। ওই সাইজের ছুটো ফ্রাই আর এক-খণ্ড করে চেতল মাছের পেটি খেলে পেট টাঁই হবার কথা।
অবধূত হাসছেন, এ-সব মাছ আনার জন্য তুই চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলি ?
হৃষ্টবদন পেটো কার্তিক জবাব দিল, তা কেন, আপনি যাচ্ছেন জেনে ওঁরাই আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, বেনারস স্টেশনে আপনার দুপুরের খাবার নিয়ে আসবেন—বাবা কি-কি আনলে পছন্দ করবেন। আমি শুধু লিখে দিয়েছিলাম, পাকা পোনা আর মাংস বাদে অন্য সব মাছই বাবা ভালো খাবেন—মাংস আর পোলাউ তো লক্ষ্ণৌয়ের পার্টি নিয়ে আসবেন।
আমার মেয়ে হঠাৎ খিল-খিল করে হেসে উঠল। হাসি থামতেই চায় না। তারপর অবধূতের দিকে চেয়ে বলল, এরপর আপনার কবে কোথায় যাবার প্রোগ্রাম হয় আমাদের আগে থাকতে জানাবেন তো !
অবধূত হেসে সায় দিলেন, জানাবেন।

আমি বললাম, তা তো হল, ছু'জনের জন্য ওঁরা এই খাবার এনেছেন ?

পেটো কার্তিক জবাব দিল, তা না, পথে কারো না কারো সঙ্গে বাবার আলাপ হয়ে যায়ই, আর বাবা না দিয়ে থুয়ে খান না, এ সব ভক্তরাই জানেন।

সকলে গলা পর্যন্ত খেয়েও সবই বেশি হল। আমার পরের কথায় আর কেউ না হোক স্ত্রী অসন্তুষ্ট হলেন। বলেছিলাম, যা রইলো তার কিছু রাতে কাজে লাগতে পারে—আমার স্ত্রী মাংস খান না।

অবধূত ব্যস্ত হয়ে পরিষ্কার মতো টিফিন-ক্যারিয়ারে সরিয়ে রাখতে বললেন। আমার দিকে চেয়ে স্ত্রী রাগ করেই জিগ্যেস করলেন, এরপর রাতে আর দরকার হবে ?

মেয়ে জানান দিল, আমার অন্তত দরকার হবে না।

অবধূত বললেন, রাতের কথা রাতে—তোমার মা এক-এক পিসের বেশি কিছুই খাননি, তোপসে মাছ পাতেই নেননি।

মেয়ে ছেলেমানুষের মতো জিগ্যেস করে বসল, আচ্ছা আপনি কি রোজই এ-রকম খান ?

জবাব দিল পেটো কার্তিক।—সপ্তাহের মধ্যে অনেক রাত বাবার খাওয়াই হয় না। শনি মঙ্গলবার তো কোনো না কোনো শ্মশানে কাটান, অন্য-বারেও এক-একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকেন, তখন মা-ও ডেকে বিরক্ত করেন না—তাছাড়া ঘরে বাবা শাক-ভাত ডাল-ভাত সমান আনন্দ করে খান—তখন আমার আবার বেজায় কষ্ট।

মুখের সিগারেট নামিয়ে অবধূত বললেন, এই, তোকে কি আমার পাব্‌লিসিটি অফিসার রেখেছি ?

...এরপর ভক্ত আর ভক্তি দেখলাম লক্ষ্ণৌ স্টেশনে, আর দেখলাম পরদিন সকালে হরিদ্বারে পৌঁছেও। হরিদ্বারের ভক্তদের মধ্যে যে প্রৌঢ়টি বিশিষ্ট, তাঁর নাম পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী। ইউ. পি-রই মানুষ। অনেক ফলমূল আর মিষ্টি নিয়ে এসেছে। আর এসে পর্যন্ত ছু'হাত জোড় করেই ছিলেন। অবধূত তাঁকে ডেকে বন্ধু বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক

পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেন। তাঁকে জিগ্যেস করলেন, তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে তো?

—জি মহারাজ।

—স্ত্রী আর মেয়ে নিয়ে ইনি দিন পনেরো হরিদ্বারে থাকবেন। কংখলে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ওঠার কথা, তুমি এদের সঙ্গে করে কংখলে নিয়ে যাও —সেখানে ঘর না পেলে তোমার বাড়িতে নিয়ে তুলবে--আমার ঘর দুটো ছেড়ে দেবে—পারি তো আমিও একবার দেরাদুন থেকে নেমে এসে দেখে যাব'খন।

তাঁর ঘর ছেড়ে দেওয়া আর নিজে এসে দেখে যাওয়ার কথা শুনেই হয়তো আমাকে মস্ত কেউ ধরে নিলেন। হাত জোড় করে মিনতির সুরে বললেন, উনি কংখল যাবেন কেন—আমার গরীবখানায় নিয়ে তোলার অনুমতি দিন।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আগে কংখলেই যাই, ঘর না পেলে কোনো ধরমশালা বা হোটেলে উঠব।

অবধূত বললেন, এঁরই দু'দুটো হোটেল আছে এখানে—কিন্তু মা ডায়-বেটিক রোগী, হোটেলে অসুবিধে হবে—আপনার অসুবিধে বুঝতে পারছি, আপনি না-হয় খাওয়া দাওয়ার বাবদ কিছু মূল্য ধরে দেবেন—

কাতর মুখে পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী বললেন, মহারাজ, কৃপা করে এ-রকম বলবেন না, আপনার দৌলতে আমার ভাগ্য—এই মহান মেহ্‌মানকে একটু সেবা করার আদেশ করুন।

মুচকি হেসে অবধূত জবাব দিলেন, তোমার এই ভাগ্যটা আমার হাতে নেই—দেখো কি হয়। আর দেরি কোরো না, এঁরা খুব ক্লান্ত।

ঝকঝকে অ্যামবাসাডারের দরজা খুলে হাত জোড় করে পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী জিগ্যেস করলেন, কংখলেই যেতে হবে?

আমিও হাত জোড় করে জবাব দিলাম, আপনার এত ব্যস্ত হবার মতো আমি কেউ নই···এখানে এলে বরাবর কংখলেই উঠি···জায়গা পেলে সেখানেই থাকব।

—জায়গা পেলে কেন, ঘর বুক করা নেই ?

—তা নেই, হঠাৎ চলে এসেছি।

শুনেই দুহাত কপালে ঠেকালো।—জয় মহারাজ! চলুন তাহলে—

মহারাজেরই জয় বটে। কংখলের আশ্রমে অতিথি উপছে পড়ছে। সব ঘর ভরতি। তিন চারটে ফ্যামিলি ওয়েটিং লিস্ট-এ থেকে একদিন দু'দিনের জন্যে হোটেলে আছে। আগে জানিয়ে আসিনি বলে এখানকার বড় মহারাজ দুঃখ করলেন। আর কোথায় উঠব তা-ও তাঁকে জানাতে বললেন।

আবার পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর গাড়িতে। ভদ্রলোক বেজায় উৎফুল্ল। তিনি সামনে, ড্রাইভারের পাশে। পিছনে আমরা। ঘুরে আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমি একটু নির্বোধ আছি।

—কেন ?

মহারাজ যখন বললেন, কংখলে জায়গা না পেলে আমার বাড়িতে তাঁর ঘর দুটো ছেড়ে দিতে তখনই বোঝা উচিত ছিল, কংখলে আপনি জায়গা পাবেন না।

আড় চোখে মেয়ে আর স্ত্রীর দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বিশ্বাসের রূপ দেখছে তারাও।···এমন বিশ্বাস মানুষের কি করে হয় ? কি পেলে হয় ? এই ভারতের তো আমি অনেকটাই দেখেছি। মানুষ দেখেছি। হিংসা-বিদ্বেষ-আক্রোশ দেখেছি। ত্যাগ-উদারতা-উদাসীনতাও কম দেখিনি। এর মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয়, এক-একজনের এমন কিছু সম্পদ আছে যা আমার নেই। সেটা অর্থ বা প্রতিপত্তি নয়। যা নেই তা এই আপোস-শূন্য বিশ্বাস। যে বিশ্বাসকে অনেক সময় আমার অন্ধ আর অহেতুক মনে হয়। কিন্তু সার ফলটুকু কি ? এরা ঠকছে না আমি ঠকছি ?

হঠাৎ একটু যাচাই করার লোভ মাথায় চাপল। বললাম, আমার স্ত্রী ডায়বেটিক পেশেণ্ট, তাঁর খাওয়া দাওয়ার একটু আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে—আপনি হোটেলে যেমন চার্জ করেন তেমনি চার্জ করতে হবে··· নইলে আপনার ওখানে থাকা আমার পক্ষে সুবিধে হবে না—অবধূতজীও তাঁ৷৹ আপনাকেও মূল্য নিতে বলেছেন।

অম্লান বদনে জবাব দিলেন, নেব, মহারাজার আদেশ অমান্য করব না—কিন্তু কত মূল্য তিনি বলেননি, আপনি এক টাকা দেবেন।

একে আর কিভাবে যাচাই করব আমি ? তবু বললাম, আপনি একটা বড় ভুল করছেন, অবধূতজীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ার পরে—তার আগে কেউ কাউকে চোখেও দেখিনি!

সাদা-সাপটা জবাব, আপনাকে দেখার জন্য মহারাজ দেরাদুন থেকে নেমে আসতে পারেন বলেছেন···আপনাকে নিজের ঘর ছেড়ে দিতে বলেছেন—আপনি কি লোক বা কতদিনের আলাপ আমার আর জানার দরকার নেই—আপনার সঙ্গে তাঁর কত জন্ম-জন্মান্তরের আলাপ আপনি জানছেন কি করে ?

···ঈশ্বর, তুমি কি কোথাও আছ ? যদি থাকো তো বলব, তুমি আমার অনেক নিয়েছ, কিন্তু দিয়েছও অনেক। শুধু এই বিশ্বাসটুকু দিলে না কেন? বিশ্বাসের এমন সহজ জোর থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে কেন ?

হর্‌-কি-পিয়ারীর কাছাকাছি সুন্দর বাড়ি পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর। ঝকঝকে তকতকে বাড়ি। শ্বেতপাথরের মেঝে। অবধূত বছরে দু'বছরে একবার হরিদ্বারে আসেন। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট এই দুটো বিশাল ঘর শুধু তখনই ব্যবহার করা হয়। এই প্রথম ব্যতিক্রম। ঘর দুটো আমি দখল করেছি। অ্যাটাচড্‌ বাথ। আরামের সমস্ত উপকরণ মজুত।

চারদিক দেখে নিয়ে স্ত্রী একটা খাটে বসলেন। বললেন, আমার বড় অদ্ভুত লাগছে।

জিগ্যেস করলাম, কেন ?

জবাব দিলেন, কি জানি।···কেবল মনে হচ্ছে, দুদিন যাঁকে ট্রেনে দেখলাম, তাঁর কিছুই জানা হল না।

মেয়ে সায় দিল।—সত্যি মা, কত তো দেখলাম, কিন্তু এ-রকম মানুষ তো কোথাও দেখিনি।···বাবা তুমি এঁকে নিয়ে কিছু লিখবে ?

হেসে বললাম, কি জানি যে লিখব ? কেবল তাঁর কল্যাণে তোফা খেলাম-দেলাম আরামে এলাম—আর এখনও তাঁর জন্যেই রাজসিক অভ্যর্থনা।

কিন্তু জানি, এ-টুকুই আমার মনের কথা নয়।

পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর আদরে যত্নে আমরা ব্যতিব্যস্ত। দশ পা রাস্তায় হাঁটার উপায় নেই। তাঁর গাড়ি সর্বদাই আমাদের জন্য মজুত। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি শুধু বুঝে নিয়েছেন, রান্নায় আলু আর মিষ্টি চলবে না। হরিদ্বারে কোথাও আমিষ চলে না। নিরামিষ আহারের এত আয়োজন যে, খেয়ে উঠতে পারি না, ফেলতেও পারি না।

পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী নিজেই নিজের গল্প করেছেন। নিজের গল্পের মধ্যে অবধূতজীর মাহাত্ম্যের কথাই সব। তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন হর-কি-পিয়ারীর ঘাটে, ব্রহ্মকুণ্ডুর পাশে। ত্রিপাঠীর তখন ভিকিরি দশা। বছর একুশ-বাইশ বয়েস। ধরমশালায় কোনোদিন খাওয়া জোটে কোনোদিন জোটে না। নিজের বাপ-মা নেই। দিল্লিতে কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, হাইস্কুল পাশ করার পরে কাজ জোটাতে পারেনি বলে আর আশ্রয়ও মেলেনি। ঘুরতে ঘুরতে ভবঘুরের মতো চলে এসেছিলেন হরিদ্বারে। হরির দরজায় এসে যদি কিছু হয়।

···হবার মতো আশার ছিটে ফোঁটাও দেখেন না। ভিক্ষে করতে পারেন না। আত্মহত্যা করে যন্ত্রণা শেষ করার মতো মনের জোরও পান না। এই সংকল্প নিয়ে মনসা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন একদিন। মনে হল কে যেন তাঁকে ঠেলে নামিয়ে দিল।

···নেমে আসতে হর-কি-পিয়ারীর ঘাটে মহারাজের সঙ্গে দেখা। তিনি নয়, মহারাজই তাকে কখন দেখেছেন কতক্ষণ দেখেছেন জানে না। কাছে ডাকলেন। তারপর এমন চেয়ে রইলেন মনে হল ভিতরসুদ্ধ ফালা-ফালা করে দেখছেন। চাপা ধমকের সুরে বলেছেন, হরির দরজায় এসে মাথায় বদ মতলব নিয়ে ঘুরছ কেন—পবিত্র স্থানকে কলংকিত করার জন্য এখানে এসেছ?

···মহারাজের সঙ্গে তখন দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি একা। পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী তিন দিন তাঁর সঙ্গে তাঁর কাছেই কাটালেন। তারপর মহারাজ যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁকে বললেন তুমি এখানে ছোট করে একটা

হোটেল খোলো, লোক ঠকিও না।

ত্রিপাঠী বিমূঢ়। এক পয়সার সম্বল নেই, তিনি হোটেল খুলবেন কি!

মহারাজ নগদ পাঁচশ টাকা তাঁর হাতে দিলেন। বললেন, এই দিয়ে শুরু করো, আমি আবার এসে দেখব তুমি কতটা কি করলে।

…পঁয়ত্রিশ বছর আগে হরিদ্বারের এই চেহারা ছিল না। ছোট বড় ধরমশালা ছিল বটে, কিন্তু হোটেল নাম মাত্র। যাত্রীর মৌসুমে লোকের থাকার জায়গা খাওয়ার জায়গা মেলে না। একটি মাত্র রান্নার লোক আর একটা চাকর রেখে ছাপরা ঘরে হোটেল শুরু করেছিলেন। শুধু খাওয়ার ব্যবস্থা। নিজেই হাট-বাজার করতেন। লোকের খাওয়ার সময় সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করতেন। মহারাজের কৃপায় সেই থেকে আজ তাঁর এই অবস্থা—তুটো বড় হোটেলের মালিক তিনি, এই বাড়ি, গাড়ি।

এ যাত্রায় কালীকিংকর অবধূতের সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবিনি। ত্রিপাঠীর কাছ থেকে আমি তাঁর ঠিকানা চেয়েছিলাম। শুনলাম তিনি কলকাতায় থাকেন না। কোন্নগরে থাকেন। স্টেশন থেকে এক মাইলের কিছু বেশি হবে পথ। শ্মশানের কাছাকাছি। স্টেশনে নেমে সাইকেল রিকশঅলাকে অবধূতজীর বাড়ি বললেই সে নিয়ে যাবে।

…কিন্তু শুরু থেকে আমাদের এবারের সম্পূর্ণ যাত্রাটাই যেন আর কারো নিয়ন্ত্রণের ছকে বাঁধা ছিল। তেরো দিনের মাথায় অবধূত সত্যিই পেটো কার্তিককে নিয়ে হরিদ্বারে হাজির। আসছেন সে খবর অবশ্য আগের দিনই পেয়ে গেছলাম। সকলে মিলে তাঁকে স্টেশনে আনতেও গেছলাম। ত্রিপাঠীর মুখ দেখে মনে হয়েছিল এমন আনন্দের দিন তাঁর জীবনে বেশি আসেনি। আমার প্রতি দারুণ কৃতজ্ঞ। কারণ কোন্নগর থেকে তিনি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, এ যাত্রায় তাঁর হরিদ্বারে থাকা হবে না। ত্রিপাঠীর বদ্ধ ধারণা, আমার জন্যই তাঁর এমন সৌভাগ্য।

অবধূতকে বলেছিলাম, আপনি সত্যি আসবেন ভাবিনি।

তিনি হেসে জবাব দিয়েছেন, স্বার্থ ছাড়া কেউ এক পা নড়ে! দেরাদুনে তিনটি বাঙালী পরিবার আমার ভক্ত। সেখানকার গিন্নিরা আর ছেলে-

মেয়েরাও দেখলাম আপনার লেখার ভক্ত—তা আমি ভাবলাম আপনাদের মতো গুণীজনদের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে দেখলে আমার প্রেস্টিজ বাড়বে, খাতির কদরও বাড়বে—সেই লোভেই চলে এলাম।

হেসে বলেছি, সাহিত্যিক না হলেও আপনি বাক্-পটু আমার থেকে ঢের বেশি।

...এই মানুষের প্রতি আমি ট্রেনেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সেই আকর্ষণ হরিদ্বারের ছ'দিনে আর ফিরতি ট্রেনে একসঙ্গে আসার ছ'দিনে কত যে বেড়েছে আমিই জানি। ত্রিপাঠীর এখানে যা প্রভাব, অবধূত মুখের কথা আসাতে তিমি একই কুপেতে ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমাদের টিকিট করাই ছিল, কেবল অবধূতের বার্থ অদল-বদল করে নেওয়া।

হরিদ্বারে বা ট্রেনে আমাদের কোনোরকম আধ্যাত্মিক বা তন্ত্রমন্ত্রের আলোচনা হয়নি। তার থেকে রসের কথা ঢের বেশি হয়েছে। রাতের নিরিবিলিতে ছ'জনে ত্রিপাঠীর ওখানে বোতল নিয়েও বসেছিলাম। আমারও একটু আধটু চলে দেখে উনি মহা খুশি। তখনই কথায় কথায় বলেছিলেন, এর মতো জিনিস আছে মশাই—বছর চারেক আগে বিহারের কাকুরঘাটি মহাশ্মশানে আমি টানা প্রায় তিন বছর কাটিয়েছি —সেখানে বেশিরভাগ দিন আমার রাতের খাওয়া ছিল মুড়ি তেলেভাজা আর ওখানকার শস্তা দিশী মদ—আহা কি দিনই গেছে।

আমি থমকেছি।—শ্মশানে টানা তিন বছর কাটিয়েছেন...তা-ও বিহারের শ্মশানে—কেন, কোনো তন্ত্র-সাধনার ব্যাপারে?

হাসতে লাগলেন।—স্রেফ পালিয়েছিলাম মশাই, বন্ধন কাটানোর ঝোঁকে —এ আবার আমার অনেক কালের ঝোঁক, কেউ বেঁধে ফেলছে মনে হলেই পালানোর তাগিদ, কিন্তু হেরে গেছি।

কিসের বন্ধন? কোথা থেকে কোথায় পালানোর তাগিদ?

হাসছিলেন আর গ্লাসে চুমুক দেবার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে দেখছিলেন। ধীরে সুস্থে জবাব দিলেন, রমণীর বাহু বন্ধন থেকে। আমার অদৃষ্টে এই শেকল যে কি শেকল তা যদি জানতেন—সেটা ছেঁড়ার তাগিদে মাঝে

মাঝে আমার মাথায় ভূত চাপত—পালাতাম। সেই প্রথম আমার ভিতরের লেখক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কৌতূহল তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে-ছিল। কিন্তু অ-প্রসঙ্গ আর বিস্তারের দিকে গড়ায়নি। প্রস্তুতি হিসেবে বলেছিলাম, ফিরে গিয়ে ফাঁক পেলে আমি কিন্তু আপনার কোন্নগরের ডেরায় গিয়ে হাজির হব।

—নিশ্চয়ই আসবেন। আমিও যাব। আমরা মিউচুয়াল অ্যাডমিরেশন সোসাইটি গড়ে তুলব, আপনার কি হবে জানি না, আমার পশার বাড়বে। পরের কথায় গলায় একটু রহস্যের ছোঁয়া পেলাম। বললেন, আসবেন··· আপনার ভালোই লাগবে হয়তো···অনেকের লাগে।

হরিদ্বারে আর ফেরার সময় ট্রেনেও অবধূতের কিছু কথা আমার মনে দাগ কেটেছে।—আমার চোখে এই জগতের সব-কিছুই বড় আশ্চর্য লাগে। জন্ম-মৃত্যু-সৃষ্টি-ধ্বংস সবই যেন কেউ সাজিয়ে সাজিয়ে যাচ্ছে। মানুষ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাণীর এমন বায়োলজিকাল পারফেকশন কি করে হয়—কে করে? একটা ফুলের বাইরে এক-রকম রঙ ভিতরে এক রকম, পাপড়ির গোড়ায় এক রঙ, মাথার দিকে অন্য রকম—এমন নিখুঁত বর্ণ বিন্যাস কি করে হয়—কে করে? আপনারা লেখেন, ঘটনা কতটা দেখেন আপনারাই জানেন। আমি শুধু ঘটনা দেখে বেড়াই, যা দেখি তা কোনো বইয়ে পাই না, কোনো চিন্তায় আসে না। যেখানে যাই, দেখি কিছু না কিছু ঘটনার আসর সাজানো—পরে মনে হয়েছে আমি নিজের ইচ্ছেয় আসিনি, কিছু ঘটবে বলেই আমার টান পড়েছে—আমার কিছু ভূমিকা আছে বলেই আমাকে সেখানে গিয়ে হাজির হতে হয়েছে—এমন কেন হয়, কি করে হয় বলতে পারেন? এই দেখুন না, ক'দিন আগেও আপনি আমাকে চিনতেন না, আমিও আপনার অস্তিত্ব জানতাম না, আমার এই বেশভূষা আর হাওড়া স্টেশনে ভক্তদের সঙ্গে আমাকে দেখে আপনারা বিরূপই হয়েছিলেন, পরেও আপনার আলাপের কোনো আগ্রহ ছিল না, উল্টে বিরক্ত হচ্ছিলেন—অথচ এই ক'টা দিনের মধ্যে দেখুন পরস্পরকে আমরা আত্মীয় ভাবছি—এ-ই বা কি করে হয়, কেন হয়?

আমি জবাব দিয়েছি, এর সবটাই আপনার গুণে হয়েছে।

—তা নয়, আপনাকে দেখেই যদি আমার ভালো না লাগত এমন হত না, আপনার স্ত্রীর দিকে চেয়ে যদি শোকের ছায়া চোখে না পড়ত তাহলেও এমন হত না—সব-কিছুর পিছনে অবধারিত কিছু কার্য কারণ সম্পর্ক থাকে —মানুষ দেখে দেখে আমার এটুকুই অভিজ্ঞতা।

২

কলকাতায় এসে আমাদের তিন জনেরই মন অনেকটা সুস্থ। বিদায় নেবার আগে অবধূত আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, মা, আপনার প্রাণের জিনিসই তো জমা দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন—এবার দুঃখটুকুও জমা দিতে চেষ্টা করুন, তাতে আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তিনি বন্ধন মুক্ত হবেন।

দিন পনেরো বাদে স্ত্রীকে বললাম, একবার কোন্নগর থেকে ঘুরে আসি, মনটা বড় টানছে।

স্ত্রী তক্ষুণি সায় দিলেন।

দিনটা রবিবার। ড্রাইভারের ছুটি। নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ছুটির দিনে রাস্তা অনেকটাই ফাঁকা থাকবে আশা করা যায়। স্নান সেরে সকাল ন'টায় বেরিয়েছি। অবধূত বলে দিয়েছিলেন, যে-দিন আসবেন সকালেই চলে আসবেন—খেয়ে আসার অজুহাত শুনব না।

না খেয়েই বেরিয়েছি। তাঁর কাছে অন্তত এ ব্যাপারে আর কোনো সংকোচ নেই। কোন্নগর স্টেশনের পথ থেকে তাঁর ডিরেকশন ধরে মিনিট পাঁচ-ছয় ড্রাইভ করতে একজন বাড়ি দেখিয়ে দিল।

বেশ পুরনো ছাতলা-পড়া একতলা বাড়ি। এক-নজর তাকালেই বোঝা যায় অনেক দিন সংস্কার হয়নি। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় যাঁর সঙ্গে পরিচয়, যাঁর অমন পয়সাঅলা সব শিষ্য—এক দেড় দিনে দু'আড়াই হাজার টাকা প্রণামী পড়তে দেখেছি—শিষ্যের ডাকে যিনি দেরাদুন-মুসৌরি যাতায়াত করেন—হরিদ্বারে ত্রিপাঠীর বিলাসবহুল ঘরে যাঁর সঙ্গে থেকে এসেছি—তাঁর নিজের এমন বাড়ি ভাবতে পারিনি।

ছোট্ট আঙিনার মধ্যে বাড়িটা। সামনে কোমর উঁচু বাঁশের গেট তারের খাঁজে আটকানো। গেটের দু'পাশে দুটো শ্বেত করবী আর লাল করবীর গাছ। এক দিকে ফুলবাগান, তাতে কিছু বুনো ফুল ফুটে আছে। অন্য

দিকে দুটো জবা গাছ, ছোট বড় কয়েকটা কলা গাছ, মাঝারি সাইজের দুটো নারকেল গাছ আর একটা আম গাছ।

গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে হর্ন দিলাম। দরজা খুলে যিনি সোজা গাড়ির দিকে তাকালেন, এমন এক সুদর্শনার অবস্থান এখানে আশা করিনি। কেউ আমাকে ভুল বাড়ি দেখিয়ে দিল কিনা এমন সন্দেহও হল। আমাকে দ্বিধান্বিত দেখে মহিলা দরজা ছেড়ে সামনের দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন। অগত্যা গাড়ি থেকে নেমে বাঁশের গেট সরিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। চোখে ধাঁধাই লাগছে।

—এটা কালীকিংকর অবধূতের বাড়ি?

—হ্যাঁ আসুন···তিনি একটু বেরিয়েছেন, আপনি আজ আসতে পারেন বলে গেছেন—এখুনি ফিরবেন মনে হয়।

আবার একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আমি আজ আসতে পারি অবধূত সেটা অনুমান করতেও পারেন ··কিন্তু আমিই যে সেই লোক তা এই মহিলার আঁচ করা সম্ভব কি করে! তাছাড়া আমার আসা একে-বারে হঠাৎ। সকালে চা খেতে খেতে ঠিক করেছি।

দাওয়ায় দরজার দু'দিকে দু'জোড়া বেতের চেয়ার পাতা। একদিকের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন। একটু ব্যস্ত পায়েই ভিতরে চলে গেলেন।

আমি বিমূঢ়ের মতো বসে। খুব সাদাসিধে বেশবাসে এ আমি কোন্ দিব্যাঙ্গনাকে দেখলাম! মহিলা বলছি, মুখের অচপল গম্ভীর অভিব্যক্তি দেখে, নইলে বয়েস বড় জোর বছর ত্রিশেক হতে পারে, পরনে চওড়া লাল পেড়ে চকচকে কোরা শাড়ি—মুখের রঙ গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে। গায়ে শেমিজ, টিকালো নাক, আয়ত-গভীর কালো চোখ, কপালে সিকি সাইজের টকটকে লাল সিঁদুর টিপ, সিঁথিতে মোটা করে টানা সিঁদুর, হাতে গলায় বা কানে গহনা নেই, বাঁ হাতে লোহা-বাঁধানো গোছের কিছু। দীর্ঘাঙ্গী, নিটোল স্বাস্থ্য, সুডোল বাহু—সব থেকে বাহারের বোধহয় চুল, পিঠে ছড়ানো চুল কোমর ছাড়িয়ে হাঁটুর কাছাকাছি। চলে যাবার সময় পায়ের দিকে চোখ গেছে, আলতা-পরা এমন দু'খানি পা-ও

যে রমণীর এক বিশেষ রূপ—কলকাতায় থেকে তা ভুলেই গেছি।

…অবধূতের ঘরে এমন দিব্যাঙ্গনাটি কে? দিব্যাঙ্গনা ছাড়া অন্য শব্দ আমার মনে আসছে না। অবধূতের বয়েস যদি ষাট হয়, তাঁর মেয়ে হওয়াই সম্ভব। কিন্তু অবধূতের গায়ের রং বড় জোর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যেতে পারে। এ যদি মেয়ে হয় তো মা-টি অতি রূপসীই হবেন সন্দেহ নেই।

আবার সচকিত আমি। মেয়েটির হাতে (মেয়েটিই বলি) পাথরের ডিসের ওপর বসানো বড় একটা পাথরের গেলাস। সামনে ধরতে মনে হল, গেলাসে গুড়ের সরবত। ব্যস্ত হয়ে বললাম, এক্ষুণি এর কি দরকার ছিল …অবধূতজী আস্থন—

—রোদের মধ্যে ড্রাইভ করে এসেছেন, ভালো লাগবে।

গেলাসটা তুলে নিলাম। আঁখি গুড়ের সরবতই বটে, কিন্তু তাতে সুগন্ধ লেবু আর কিছু মশলার গুঁড়ো মেশানো। ভারী সুস্বাদু লাগল।

—যাঃ। গলা দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এলো।

ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস।

বললাম, অবধূতমশাই হয়তো আমি আসব ভাবেন নি…আর কারো কথা বলে গিয়ে থাকবেন—

চাউনিটা স্পষ্ট, সোজা।—আপনার কথাই বলেছেন…কলকাতা থেকে আসছেন তো?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

—দেরাছুন যাবার সময় আপনার সঙ্গেই তো ট্রেনে পরিচয়?

আর কোনো সন্দেহ থাকল না যে অবধূত আমিই আসতে পারি আশা করেছেন। জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করল, উনি আশা করলেও তুমি জানলে কি করে যে আমিই সেই লোক। কিন্তু জিগ্যেস করা গেল না, বয়েস যা-ই হোক, রূপের সঙ্গে এমন এক শান্ত ব্যক্তিত্ব মিশে আছে যে চট করে তুমি বলতেও বাধে। দু'চুমুকে সরবত খেয়ে জিগ্যেস করলাম, উনি কে হন?

ঠোঁটের হাসি আবার একটু স্পষ্ট।—আপনাদের অবধূত?

পাল্টা প্রশ্নটা কি-রকম যেন লাগল। মাথা নাড়লাম।

—হন্ কেউ একজন ··

বলতে বলতে বাঁশের গেটের দিকে চোখ। আমিও দেখলাম। পেটো কার্তিক। হাতে বাজারের থলে। আমাকে দেখে ছোট-খাটো একটু হাঁ করে ফেলল। তারপরেই উল্লাসে ছুটে এলো।—আপনি এসে গেছেন সার! দাওয়ায় উঠেই ডান হাতের ব্যাগ বাঁ-হাতে নিয়ে ঝুঁকে একটা প্রণাম ঠুকে ফেলল।—বাবা তো ঠিকই বলেছেন মাতাজী উনি আজ আসতে পারেন, আমিই বরং ভাবছিলাম মাংস আনব কি আনব না—ভাগ্যিস এনেছি।

পেটো কার্তিকের মুখে মাতাজী শুনে আমি বিমূঢ় হঠাৎ। স্থান-কাল ভুলে রমণীর দিকে তাকালাম। থলেটা কার্তিকের হাত থেকে নিয়ে উনি বলছেন (মাতাজী শোনার পর উনি ছাড়া আর কি বলব!), যা তো বাবা, বোসেদের ছেলের অসুখ, ওঁকে সেখানে ডেকে নিয়ে গেছে—কোথাও গিয়ে বসলে তো আর ওঠার নাম নেই—একটা খবর দে।

পেটো কার্তিক তক্ষুণি ছুট লাগালো।

পাথরের গেলাস মাটিতে নামিয়ে রাখতে যেতে মহিলা নিঃসংকোচে হাত বাড়ালেন। দ্বিধাগ্রস্ত মুখে গেলাস এগিয়ে দিলাম।

—এবারে একটু চা করে আনি?

ব্যস্ত হয়ে জবাব দিলাম, উনি আসুন—

চলে গেলেন। আমার মনে হল চোখের গভীরে একটু কৌতুকের আভাস দেখলাম।···আমার মুখের অবস্থা দেখেই কি?

···হরিদ্বারে রাতে ত্রিপাঠীর বাড়িতে বোতল-গেলাস নিয়ে বসে উনি যে কথাগুলো বলেছিলেন মনে পড়ল।···বলেছিলেন, কেউ বেঁধে ফেলছে মনে হলেই তাঁর পালানোর ঝোঁক—বন্ধন কাটানোর তাগিদ। আমি জিগ্যেস করেছিলাম, কিসের বন্ধন থেকে?···গেলাসে চুমুক দিয়ে মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, রমণীর বাহুবন্ধন থেকে।···আর বলেছিলেন, তাঁর অদৃষ্টে এই শেকল যে কি শেকল তা যদি জানতেন—সেটা ছেঁড়ার

তাগিদে মাঝে মাঝে আমার মাথায় ভূত চাপত—পালাতাম।

…এখন বুঝতে পারছি কি অমোঘ শেকলের কথা তিনি বলেছিলেন। কিন্তু আমার ভেতরটা একটু বিরূপ হয়ে উঠল। হতে পারে অবধূতের প্রতি এই মহিলার আকৃষ্ট হবার মতো মতিভ্রমই হয়েছিল, এ-লাইনের লোকদের বশ করার ক্ষমতা তো কিছু আছেই—তাই মহিলার চোখে বয়েসের তফাৎটা বড় বাধা না-ও হতে পারে। কিন্তু মেয়ের বয়সী এক-জনের বাহুবন্ধনে শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়ে অবধূত পাষণ্ডের মতোই কাজ করেছেন।

পেটো কার্তিকের সঙ্গে অবধূত মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরলেন। একমুখ হাসি।—একলা যে, মা এলেন না?

হেসে জবাব দিলাম, সবে তো শুরু।

—ড্রাইভার দেখছি না, নিজে ড্রাইভ করে নাকি?

—ড্রাইভারের রোববারে ছুটি থাকে।

হাসছেন।—সকাল থেকেই কি-রকম মনে হচ্ছিল আপনি আসতে পারেন। হাঁক দিলেন, কই গো!

—বসুন, ব্যস্ত হবেন না, ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আসার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার সরবত খাইয়েছেন।

পেটো কার্তিক ভিতরে চলে গেছে। বেতের চেয়ারটা মুখোমুখি টেনে নিয়ে বসলেন। এক চোখ টিপে জিগ্যেস করলেন, সরবত বেশি মিষ্টি লাগল না ওঁকে?

হাঁকের জবাবে মহিলা এসে উপস্থিত। অবধূতের রসালো প্রশ্ন কানে গেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু লাজ-লজ্জার অভিব্যক্তি চোখে পড়ল না। অবধূতই আরো সরস হয়ে উঠলেন। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, এসো, লেখককে জিগ্যেস করছিলাম, সরবত বেশি মিষ্টি লাগল না সরবতদাত্রীকে?

—বুড়ীকে নিয়ে এই এক ঢঙের কথা আর কতবার কত জনকে বলবে? আমার দিকে ফিরলেন, এবারে চা দিই?

তা তো দেবেই। অবধূতের কড়া মেজাজের গলা।—আমার চির-যৌবনা

স্ত্রীকে তুমি বুড়ী বলো কোন্ সাহসে? উনি আমারও পঞ্চাশের নিচে বয়েস ভেবেছিলেন সে ভিন্ন কথা—তা বলে তোমার বেলায়ও ভুল হবে নাকি? আচ্ছা, আপনি তো মশাই একজন নামী লেখক···বেশ করে ওঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে বলুন তো, খুব বেশি হলে ওঁর বয়েস কত হতে পারে—আমি যে লোকের কাছে পঞ্চম পক্ষের স্ত্রী বলে পরিচয় দিই—সেটা খুব বেশি বলি কিনা? দেখুন না, লজ্জা কি, পাসপোর্ট তো পেয়ে গেছেন!

প্রথম দর্শনে কোনো রূপসী মহিলাকে সোজাসুজি দেখতে যাওয়ার নানা বিড়ম্বনা। অনুমতি পেয়ে হাসি মুখে একটু ভালো করেই দেখলাম। ফলে মনে হল তিরিশের কিছু বেশিই হবে। অবধূতের কথায় আরো একটু গার্ড নিয়ে বললাম, মহিলারা এই প্রসঙ্গ সব থেকে অপছন্দ করেন শুনেছি—তবু ধরুন ওকে নিয়ে যদি আপনার লিখতে হয়, কত লিখবেন?

—বছর পঁয়ত্রিশ।

অবধূত হা-হা করে হেসে উঠলেন, আমার কথা শুনেই বাড়িয়ে বললেন তো? তেত্রিশ···

ছদ্ম কোপে মহিলা বললেন, এরপর তোমার কাছে কেউ এলে আমি আর বাইরে আসব না। আমার দিকে ফিরলেন, শুনুন, আরো একত্রিশ বছর আগে আমার কুড়ি আর ওঁর উনত্রিশ বছর বয়সে আমাদের বিয়ে হয়েছে—তাহলে বুঝুন আমার বয়স কত—সক্কলের কাছে আমাকে ডেকে এনে এই ব্যাপার করা চাই।

অবধূত বলে উঠলেন, বুঝুন ঠেলা, বিশ্বাস করবেন কিনা আপনিই বলুন।

আমি বিমূঢ় একেবারে। একত্রিশ বছর আগে কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে মানে এঁর বয়েস এখন একান্ন। বয়েস বেঁধে রাখারও কোনো জাদু আছে নাকি! হতভম্বের মতো খানিক চেয়ে থেকে মহিলাকে বললাম, আপনার কথা সত্যি হলে অবধূত মশাইয়ের কোনো দোষ নেই—এই দেশের সব মেয়েদের ডেকে ডেকে এনে আপনাকে দেখানো উচিত।

অবধূত গম্ভীর মন্তব্য করলেন, ডাকতে হয় না, আপনিই আসে—তবে

মেয়েরা নয়, বেশিরভাগই ছেলে। হরিদ্বারে আপনি আমার বাড়ি আসবেন বলতে আপনাকে এই জন্যেই বলেছিলাম, এলে ভালো লাগবে—অনেকের লাগে।

হালছাড়া রাগে মহিলা বলে উঠলেন, আচ্ছা, যারা এখানে আসে সকলে আমাকে মাতাজী বলে ডাকে—এ-ভাবে বলতে তোমার মুখে আটকায় না?

—মাতাজী বলে তাতে কি হলো, মাতাজীকে ভালো লাগতে পারে না? আচ্ছা মশাই আপনিই বলুন, একে দেখে আপনারও যে ভালো লেগেছে এ-তো চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পারছি—ভালো লাগাটা কি দোষের—এরপর আমার এখানে আসতে আপনার কি আরো ভালো লাগবে না?

আমার হাঁসফাঁস মুখ দেখে ভদ্রমহিলা দ্রুত চলে গেলেন। অবধূত হাসছেন।

আমি বললাম, কংগ্র্যাচুলেশনস—থাউজেণ্ড কংগ্র্যাচুলেশনস।···আপনি এই শিকল ছিঁড়ে পালাতে চেষ্টা করেছেন?

—অনেকবার। শেষের বারে বিহারে টানা তিন বছর।

—উনি জানতেনও না আপনি কোথায় আছেন?

—নাঃ।

—আপনি যত বড় অবধূতই হোন, আপনাকে নরাধম বলতে ইচ্ছে করছে। তিন বছর ধরে আপনি ওঁকে যন্ত্রণার মধ্যে রেখেছেন!

নিঃশব্দ হাসিতে মুখখানা ভরাট শুধু নয়, সুন্দরও হয়ে উঠল। বললেন, আপনি তাহলে ওকে খুব বুঝেছেন।···আরে মশাই যন্ত্রণার মধ্যে আছে জানলে তো আমার পালানো সার্থক ভাবতাম! যন্ত্রণা দূরে থাক, একটু তাপ-উত্তাপও যদি দেখতাম। যেখানে যত দূরেই যাই, শেকলটা যে আমার গলায় পরানোই আছে সেটা উনি খুব ভালো করেই জানতেন। সেবারে ছাড়া পেয়েছি বিকেল চারটের পরে। সঙ্গে ড্রাইভার থাকলে রাতের আগে ছাড়া পেতাম না।

সেই থেকে আমার কোন্নগরে যাতায়াত শুরু। পনেরো দিন বা তিন সপ্তাহে

একবার করে যাই-ই। অবধূত নিজেই বলেছিলেন উনি ঘটনা দেখেন। আমি চরিত্র দেখে বেড়াই। সম্প্রতি বর্তমানে এই একটি চরিত্র নিয়ে আমার আগ্রহের সীমা-পরিসীমা নেই। একটি নয়, আগ্রহ তাঁর স্ত্রীকে নিয়েও। ছ'জনেরই বিশেষ একটা অতীত আছে যার আভাস এখনো আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। হবে, আশা রাখি।···কোন্নগরের এই বাড়িতে লোকের আনাগোনা লেগেই আছে। যে রবিবারে আমি প্রথম গেছলাম, বিকেল চারটের মধ্যে কম করে পনেরো-ষোলজন লোককে অবধূত ফিরিয়ে দিয়ে হতাশ করেছিলেন। সেটা আমার খাতিরে। পেটো কার্তিক আমাকে টিপ দিয়ে রেখেছিল। এর পরে এলে বুধবারে আসবেন, ওই একদিন বাবা অনেকটা ফাঁকা থাকেন, লোকের চিঠিপত্রের জবাব দেন, বা ওষুধ-টষুধ তৈরি করেন।

লক্ষ্য করেছি অবধূতের কাছে বেশির ভাগ লোক কিছু না কিছু সংকট ত্রাণের আশা নিয়ে আসে। অবশ্য সংকটের রকম-ফের আছে। এদের ভিতর দিয়ে অবধূতকে বোঝার জন্য বুধবার ছেড়ে এক-একদিন অন্য বারেও এসে হাজির হয়েছি। সত্যিকারের সংকটে পড়েই অনেকে আসে বটে। কিন্তু ব্যতিক্রমের মধ্যেও অন্য যে আসে তার সংকট তার কাছে অন্তত বিষম। একবার এক মহিলাকে দেখলাম, অবধূতের সামনে বসে খুব কান্নাকাটি করছেন। ব্যাপার সাংঘাতিক বইকি। তাঁর বড় আদরের বেড়ালটি হারিয়ে গেছে। তাকে ফিরে না পেলে তিনি প্রাণে বাঁচবেন না।

অবধূত গম্ভীর। চেষ্টা করে বিষণ্ণও।—আপনার ছেলেপুলে নেই তো?

—না বাবা, ওই পুষিই আমার সব।

—খুব দুঃখের কথা।···কিন্তু আপনাকে তাহলে কিছু ক্রিয়া করতে হবে।

মহিলা আশায় উন্মুখ।—আমি সব করব, কি করতে হবে বলুন বাবা?

—খুব গরিব দুঃখী একটা বা দুটো বাচ্চা ছেলে-মেয়ে আপনার চেনা-জানার মধ্যে আছে?

ভাবলেন একটু।—আছে বাবা, আমাদের যে ঘর ঝাড়-মোছ করে ঠিকে

ঝি-টা, তার গেদা বাচ্চা তু'টো ছেলে মেয়ে আছে—স্বামীটা অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বউটা কাজে বেরিয়েছে—তু'বেলা খাওয়া জোটে না।

—তাহলে ওই তুটো বাচ্চাকে আপনাকে পুষির মতো—না, পুষির থেকেও বেশি ভালো বাসতে হবে—আপনার ভালবাসা যত খাঁটি হবে—পুষির ফিরে আসার চান্স ততো বেশি।

—কিন্তু বাবা পুষি গেল কোথায়? সে বেঁচে আছে তো, না কেউ মেরে-টেরে ফেলল?

—বেঁচে না থাকলে আপনার কাছে আর ফিরছে কি করে? যান, যা বললাম, মনে-প্রাণে তাই করুন। পুষি ফিরে এলে আমাকে একটা খবর দেবেন।

পায়ের কাছে দশটা টাকা রেখে প্রণাম করে চোখ মুছতে মুছতে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন।

আমি হেসে বলেছি, বেশ, পুষি যদি আজ-কালের মধ্যেই ফিরে আসে?

অম্লানবদনে জবাব দিলেন, ওই জন্যেই ফিরে এলে খবর দিতে বললাম। ফিরে এলে উনি জানবেন, আমার অব্যর্থ ক্রিয়ার ফল, তখন ওই মানুষের বাচ্চা তুটোকে আরো বেশি ভালবাসতে বলতে হবে—নইলে পুষি আবার একদিন বরাবরকার মতো হারিয়ে যাবে।

কথা শেষ হতে না হতে একটি বছর তেইশ-চব্বিশের ছেলে আর বছর উনিশের মেয়ে এসে উপস্থিত। দেখে আমার মনে হলো এই প্রথম আসছে। লাল চেলি দেখে চিনল, ভক্তিভরে প্রণাম করল।

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর মুখে অবধূত জিগ্যেস করলেন, তু' জনেরই গার্জেনের আপত্তি?

ওরা হকচকিয়ে গেল একটু। ছেলেটি বলল, আজ্ঞে···?

—বলছি, তোমাদের বিয়ের ইচ্ছেয় তু'জনেরই গার্জেনের আপত্তি হয়েছে বা হবে?

তু'জনেই বিস্মিত এবং মুগ্ধ। ইতস্তত করে ছেলেটি একবার আমার দিকে তাকালো। অবধূত বললেন, উনিও একজন যোগীপুরুষ, ওইভাবে থাকেন

—বেশি সময় দিতে পারব না, চটপট বলো।—

ছেলেটি বলল, আজ্ঞে আপনি ঠিকই বলেছেন—ছু'জনেরই বাবা-মায়ের আপত্তি। বিশেষ করে আমার বাবার···

—আপত্তি কেন? জাতে-বর্ণে তো মিল আছে দেখছি?

তারা আরো মুগ্ধ।

—তোমার বাবা কি করেন?

—উকিল।

—তুমি এক ছেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনটি বোন আছে। আমার ছোট।

—তুমি চাকরি-বাকরি করো?

—বাবার সঙ্গে প্র্যাকটিস শুরু করেছি।

—তোমার বাবার কি ইচ্ছে, তোমার বিয়েতে অনেক টাকা পেয়ে তোমার পরের বোনের বিয়ের টাকা কিছুটা যোগাড় করে রাখবেন?

মেয়ে উন্মুখ। ছেলেটি শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ছে।—আপনি ঠিকই বলেছেন··· এখন একটা উপায় করে দিন।

—উপায় তোমাদের হাতে। তোমাদের মতি স্থির থাকলে তবেই তোমাদের বাবা-মায়েদের মতি ফেরা সম্ভব। ছু'তিনটে বছর এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে কাটাতে হবে তোমাদের।···তোমরা এখানে এসেছ কাউকে না জানিয়ে, কোনো আত্মীয় বা তোমার বাবার কোনো বন্ধুর মারফৎ তোমার বাবাকে একবার আমার কাছে পাঠাতে চেষ্টা করো—তোমরা আমার খবর পেলে কি করে?

ছেলেটি জানালো, এক মামা আমাকে খুব ভালবাসে—সে বলেছে আপনি কিছু করে বাবার মত ফেরাতে পারেন।

—তোমরা আমার কাছে এসেছ মামা জানেন?

—না···তিনি কারোর কাছে আপনার ক্ষমতার কথা শুনে আমাকে বলেছিলেন।

—তোমরা এখানে এসেছ তাঁকেও বলবে না। গিয়ে তাঁকেই একবার

আমার কাছে আসার জন্য ধরে পড়ো—সেটা পারলে তোমার বাবাকে এখানে আনাবার ব্যবস্থা আমি করতে পারব।

ইতস্তত: করে ছেলেটি বলল, আপনি যদি কিছু ক্রিয়া করেন···

—সেটি করতে হলে তোমার বাবাকে দরকার—ক্রিয়াটা তাঁর ওপর দিয়ে হবে। আর আবারও বলছি, সব নির্ভর করছে তোমাদের মতির ওপর—আপনি কি বলেন?

আচমকা শেষের প্রশ্ন আমাকে। কোনোরকমে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। —এ ছাড়া আর কি করার আছে···।

ওরাও একটা দশ টাকার নোট রেখে প্রণাম করে চলে গেল। ছেলেটি তার নাম ঠিকানা আর মামার নাম রেখে গেছে। তার আশা মামাকে পাঠাতে পারবে।

অবধূত হেসে বললেন, কত রকমের কেস আমার জোটে দেখছেন?···তবে এই ছেলের বাবাকে একবার নাগালের মধ্যে পেলে এ কেস জলভাত—এই বিয়ে দিয়ে সে তার নিজের ফাঁড়া কাটিয়ে বাঁচবে। ছেলের মতি ফেরানোর নাম করে মামাকে দিয়ে ওই বাপটিকে একবার এখানে আনাতে হবে। আমার মন বলছে এই বিয়ে হবে, ছেলে-মেয়ে দু'জনেরই কপালের লক্ষণ ভালো।

মাতাজীর নাম কল্যাণী। তাঁর কাছে যারা আসে তাদের মধ্যে নানা বয়সের পুরুষের সংখ্যাই বেশি। মেয়ে ভক্তও অবশ্য কম নয় একেবারে। সকলেরই তিনি মাতাজী। তাদের শ্রদ্ধাভক্তিতে ভেজাল আছে মনে হয় না। কারো ওষুধ-বিসুধের দরকার হলে মাতাজী তাকে অবধূতের কাছে পাঠান। আর কেউ দীক্ষা নিতে চাইলে অবধূত তাকে মাতাজীর কাছে পাঠান। অবধূত নিজে কাউকে দীক্ষা দেন না। কল্যাণী দেবী আমাকে বলেছেন, এই জন্যেই আমার কাছে পুরুষের ভিড় বেশি, কারো মনে ডাক দিলেই সে দীক্ষা নেবার জন্য ব্যস্ত হয়, আর আপনাদের অবধূত তখন তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে খালাস। দায় উদ্ধারের আশায় প্রথমে সকলেই আসে ওঁর কাছে, শেষে বিপাকে পড়ি আমি।

অবধূত হেসে বলেন, বিশ্বাস করবেন না মশাই, আমার আসল শক্তি যে উনি এটা সকলেই টের পেয়ে যায়।

অবধূতও আমার কলকাতার বাড়িতে বার কয়েক এসেছেন। আমি স্ত্রীকে আর মেয়েকে নিয়েও গেছি। অবধূতকে তাদের জানতে বুঝতে বাকি নেই। কল্যাণী দেবীকে দেখে দুজনেই মুগ্ধ। মেয়ে তাঁকে দেখে বলে উঠেছিল, আপনাকে তো আমি অনায়াসে আমার বড় বোন বলে চালিয়ে দিতে পারি।

তাঁর সম্পর্কে আমার মুখে আগেই শুনেছিল। কল্যাণী হেসে বলেছেন, তুমিও আর ওই এক রা তুলো না—আমার ছেলেপুলে থাকলে তোমার থেকে বড় বই ছোট হত না।

—কিন্তু এ বয়সেও আপনি এরকম স্বাস্থ্য আর শ্রী রাখলেন কি করে—আমাকে এটুকুই শিখিয়ে দিন।

তিনি হেসে জিগ্যেস করেছেন, তুমি স্বাস্থ্য চর্চা মনের চর্চা করো ?

—না তো !

—তাহলে কি করে হবে ?

—আপনি এক্সারসাইজ করেন নাকি ?

—করি বইকি···তবে আমার এক্সারসাইজ একটু অন্য রকমের। আচ্ছা এসো মাঝে মাঝে, যতটা পারি শিখিয়ে দেব।

খুশি হবার মতো কথা আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন নাকি। বলেছেন, মুখুজ্জে মশাই এলে (অর্থাৎ আমি এলে) উনি সব থেকে বেশি খুশি হন ! কেন জানেন ? এখানে স্বার্থ ছাড়া, বিপদ বা দায় উদ্ধারের আশা নিয়ে ছাড়া একজনও আসে না। কোনো স্বার্থ নেই এমন কেবল উনিই আসেন। কত লোকের কাছে ওঁর কথা বলেন উনি।

শুনে মনে মনে হেসেছি। স্বার্থশূন্য আমিও নই। আর আমার স্বার্থটা কি অবধূত তা একটুও আঁচ করতে পারেন না এমন মনে হয় না। তবু তাঁর অন্তরঙ্গতাটুকু অকৃত্রিম।

অন্তরঙ্গতার ফাঁক দিয়েই এই দম্পতীর অতীতের আভাস আমি মোটামুটি পেয়েছি।

কালীকিংকর অবধূতের পৈতৃক নাম প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডাক নাম চাঁদু। বাবা কোনো বে-সরকারি কলেজের অধ্যাপক। পাঁচ বছর বয়সে মা মারা যান। বাবা আবার বিয়ে করেছেন। যিনি এসেছেন তিনি এক-জন স্কুলের শিক্ষিকা। বিমাতা বলে তিনি নিষ্ঠুর বা নির্দয় ছিলেন না। কিন্তু তাঁর বাড়ির আচরণ-শাসন-অনুশাসন সব স্কুল মাস্টারের মতো ছিল। সব-কিছু নিক্তির ওজনে বিচার বিবেচনা করতেন। চাঁদুর ভালো লাগত না। মা না থাকার দরুন হোক বা যে কারণে হোক ছেলেবেলা থেকে সে জেদী আর একগুঁয়ে। পড়তে ইচ্ছে না করলে পড়বে না, খেতে ইচ্ছে না করলে খাবে না। সব থেকে গোল পাকাতো স্কুলে যাওয়া নিয়ে। রোজই বায়না ধরত স্কুল যাবে না।

স্কুল মাস্টার নতুন মা এসব বরদাস্ত করার মানুষ নয়। নিজে চেষ্টা করে না পারলে গায়ে হাত তুলতেন না, খোদ জায়গায় অর্থাৎ বাবার কাছে ধরে নিয়ে যেতেন। বাবার ধৈর্য খুব বেশি নয়। কলেজের চাকরি ছাড়া দু'দুটো টিউশনি করতে হয়, নিজের হাট-বাজার করতে হয়। তখনকার বে-সরকারি কলেজের মাস্টারদের কিই বা মাইনে। বাবা প্রথমে ভালো কথা বলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছেলের মতি ফেরাতে চেষ্টা করতেন। তাতে কাজ হতো না। ফলে অবধারিত মার-ধোর। তাতেও কাজ না হলে আরো মার বা অন্য শাস্তি। নতুন মায়েরও রাগ হতো। বলতেন, এইটুকু ছেলের এমন ঠ্যাটামো আর দেখিনি।

কিন্তু চাঁদু কি করবে, যা ভালো লাগে না তা কিছুতেই ভালো লাগে না। কত বই ইচ্ছে করে ছিঁড়ে ফেলে বাবার কাছে মার খেয়েছে ঠিক নেই। স্কুলের ক'টা ঘণ্টা বন্দী থেকে তার হাঁপ ধরে যায়, মনে হয় এমন দম-বন্ধ করা শিকল আর দুটি নেই। কিছু ওপরের ক্লাসে ওঠার পর স্কুল পালানোর

বিত্থে রপ্ত হলো। কিন্তু সে সময়ে স্কুল পালানো অত সহজ ছিল না। ধরা পড়তে হতো। তাই খেয়ে দেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে স্কুলে আসতই না। সমস্ত দিন টো-টো করে বেড়াতে মন্দ লাগত না। মানুষ আর মানুষের মিছিল দেখত। কিন্তু স্কুলে না গেলে কামাইয়ের চিঠি আনতে হয়। এই নিয়েই ধরা পড়ত। বাবার হাতে তখন বেদম মার।

সংসারে আরো তিনটে ভাই বোন এসেছে। তারা কিন্তু অন্যরকম। বাবার থেকে মা-কে বেশি ভয় করে। তারা কথা শোনে, কেউ অবাধ্য নয়। তাদের খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া, স্কুলের সময় স্কুল। তাদের নিয়ে মায়ের খুব গর্ব। তেমনি চিন্তা চাঁহুকে নিয়ে। ওটা অমানুষ হলে সকলে তো তাকেই দুষবে। বলবে সৎমা নিজের ছেলেকে তো দেখবেই, পরের ছেলে বয়ে গেলে তার কি। তার এই ন্যায্য দুশ্চিন্তার ফলে বাবার ক্রোধ এবং প্রহার। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ার সময়ও চাঁহু বাবার হাতে কম মার খায়নি।

সকলকে অবাক করে সে ম্যাট্রিক আর আই. এ. ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। বাবার খুব আপত্তি সত্ত্বেও সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। কেবল বাবা আর মায়ের কাছে ছাড়া এখন আর সে কারো কাছে চাঁহু নয়। প্রবোধচন্দ্র। মা টি এখনো তার মতি-গতি ফিরেছে বলে একটুও ভাবেন না। ভাববেন কি করে, যখন যা খুশি তাই তো করে বেড়াচ্ছে। বাপের শাসনের আওতা ডিঙোবার পর কাউকে আর পরোয়াই করে না। যে-দিন ইচ্ছে কলেজে গেল, যে-দিন ইচ্ছে গেল না। রাতে খাবার সময় বাড়ি থাকে না, ভাত ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়। বাপ তিনবার জিগ্যেস করলে একবার জবাব দেয়, দক্ষিণেশ্বরে গেছল, বা ময়দানে বসে-ছিল। এই কৈফিয়ত কারো কাছেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

...কিশোর বয়স থেকেই তার নিজস্ব জগতের খবর কেউ রাখত না। ওই বয়সের সেই জগৎ অনেকটাই শূন্য। নিজেকে বড় অসহায় মনে হতো। এই পৃথিবীতে নিজেকে বড় একলা মনে হতো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা-রকম কল্পনা দিয়ে শূন্য জগৎ কিছুটা ভরে তুলতে চেষ্টা করত। নানা-রকম

উদ্ভট কল্পনাও তার মাথায় আসত। স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই রাতে প্রায়ই ভালো ঘুম হতো না। রাত তার কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। এরপর একটা উপায় বার করল। আলো নিভিয়ে চোখ বুজে আর ঘুমোতে চেষ্টা করত না। বিছানায় গা হাত-পা ছেড়ে চোখ বুজে মনে মনে শিবঠাকুরের কৈলাসে চলে যেত। নন্দী-ভৃঙ্গী দোর আগলে বসে আছে। কল্পনার পাখায় ভর করে তাদের এড়িয়ে কোনো-না-কোনোভাবে ভিতরে ঢুকতই। ঢুকে কি শিবঠাকুরের খোঁজ করত ? মোটেই না। মা গৌরীর খোঁজে এ-দিক সে-দিক ঘুরত। বেশির ভাগ রাতেই হ্রদের ধারে পেত তাকে। চার দিকের ফুলের গন্ধে প্রবোধচন্দ্রের ফুসফুস ভরে উঠত। হ্রদের বুকে পূর্ণিমার চাঁদ খলখল করে হাসছে। তু'জোড়া রাজহাঁস মনের আনন্দে ভেসে চলেছে। হ্রদের কোনো এক ধারে বসে আছে মা গৌরী। প্রবোধচন্দ্রকে দেখে তার হাসি-হাসি মুখ, সদয় চোখ। প্রবোধচন্দ্র সটান গিয়ে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। মা হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

ব্যস, চোখ খুলেই দেখে সকাল। ঘুমের এমন মোক্ষম দাওয়াই আর বুঝি হয় না। পাছে নিত্য ব্যবহারে দাওয়াইর ফল কমে যায়, তাই তিন চারদিন ঘুম না হলে এক রাতে চোখ বুজে সে কৈলাস রওনা হয়। বি. এ. পড়ার সময়ও কৈলাস পাড়ি দিয়েছে।

...বাবা অনেক সময় মন্তব্য করেন, এ-ছেলের কিছু হবে না। বলেন, ওর তুর্ভোগ আছে। আর মুখে না বললেও মা-তো জেনেই বসে আছেন, কিছু হবে না তো বটেই, উল্টে এ-ছেলে নিয়ে তাঁদের তুর্ভোগ আছে।...তুর্ভোগ বলতে টাকা-পয়সার অভাব ছাড়া আর কি। তা এমন তন্ত্র-মন্ত্র বা দ্রব্যগুণ কি নেই নাকি যার জোরে ইচ্ছে করা মাত্র হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা এসে যাবে ? কল্পনার জোর থাকলেই আছে। সেই কল্পনার পাখায় ভয় করে কতবার প্রবোধচন্দ্র লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছে। তারপর কি-কি ভাবে অত টাকা খরচ করবে সেই হিসেব মেলাতে গিয়ে হিমসিম।

…বি. এ. পরীক্ষার ফল তেমন ভালো হলো না। মোটামুটি অনার্স পেয়ে পাশ করল। এম. এ-তে ভর্তি হলো। পড়ার খরচ অবশ্য বাবাই চালিয়ে আসছে। কিন্তু আই. এ. পাশ করার পর থেকেই প্রবোধচন্দ্র টিউশনি করা শুরু করেছিল। কেউ জানত না। পরে ভাইয়েরা জেনে বাবা-মাকে বলে দিয়েছে। বাবা খুব কিছু বলেননি। মা রাগ করেছেন।—আমাদের কাছে গোপন কেন, আমরা তোর টিউশনির টাকা কেড়ে নেব?

টিউশনি করে টাকা উপার্জন করার ব্যাপারে খুব যে ঝোঁক ছিল তা নয়। নিজের হাত খরচের জন্য বাবার কাছে হাত পাততে পারে না। তার থেকেও বড় কারণ, হঠাৎ-হঠাৎ মনে হতো, কিছু টাকা এক সময় তার দরকার হবে। কোন্ সময় কেন দরকার হবে জানে না। কেবল মনে হতো দরকার হবে—কিন্তু হলে তাকে টাকা দেবার মতো মানুষ কে আছে? এই কারণেই টিউশনি। রোজগারের টাকা খরচ প্রায় হতই না। জমত। অথচ জমানোর প্রতিও তার খুব একটা আগ্রহ ছিল না।

জীবনের ধারা বাঁক নিই এই এম. এ. পড়ার সময়। কিছুই ভালো লাগে না। ভিতরটা যেন কোথাও উধাও হবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু কোথায়, তার কোনো হদিস নেই।

বয়েস তখন একুশ। পর পর তিনদিন বাড়ি থেকে নিখোঁজ সে। চতুর্থ দিন বাড়ি ফিরতেই বাবার অগ্নিমূর্তি। চীৎকার করে উঠলেন, ফিরে আসার দরকার কি ছিল? কোথায় ছিলি তিন দিন?

প্রবোধচন্দ্রের জবাব, তারাপীঠে।

বাবা বিমূঢ় প্রথম।—তারাপীঠে! সেখানে তোর কি?

নিরুত্তর।

—বলে যাসনি কেন?

মা ইন্ধন জোগালেন, আমি বিশ্বাস করি না ও তারাপীঠ গেছল—তুমি খোঁজ নাও।

বাবা আবার ক্ষিপ্ত।—এইরকম স্বাধীন ভাবিস তুই নিজেকে, কেমন? তোকে দেখে তোর ছোট ভাই দুটো কি শিখছে? নিজের সর্বনাশ করছিস

সেই সঙ্গে ওদেরও সর্বনাশ করছিস? আমি এই লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম, এমন স্বাধীনতার পাখা আমি বাড়তে দেব না—দেব না!

পরদিনই আবার ঘর ছেড়েছে। সকলের অগোচরে। সঙ্গে ছোট্ট স্যুটকেশ। দু'চারটে জামা-কাপড়। নিজের আড়াই বছরের টিউশনির রোজগার শ'পাঁচেক টাকা। পৈতেয় পাওয়া সোনার বোতাম আর দুটো সোনার আঙটি। হাতের ঘড়ি। এই সম্বল।

প্রথমে পুরী গেছে। জনাদুই সাধকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তাঁরা ত্রাণ আর পরমার্থ লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু পাঁচ মাস না যেতে প্রবোধচন্দ্র দু'জনার কাছ থেকেই পালিয়েছে। তার কেবল মনে হয়েছে আলোর হদিস নেই, সে কেবল অন্ধকারের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ঘরের বদলে ভবঘুরের নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে। কাশী-হরিদ্বার-ঋষিকেশ-লছমনঝোলা-উত্তরকাশী-কেদারবদ্রী এসব কিছুই বাকি থাকেনি। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছে। হিমালয়ের গুহা-কন্দরে বিচরণ করেছে। হ্যাঁ, কোনো না কোনো যোগীপুরুষের সন্ধান পেয়েছে। কিছুকাল লেগে থাকার পর আবার একই দশা। তখন যেন প্রাণ নিয়ে পালানোর তাড়া।

…কামাক্ষ্যায় এক তান্ত্রিকের আশ্রয়ে এক বছর ছিল। ভেবেছিল আশ্রয় মিলল। কিন্তু শেষে দেখল ভৈরব-গুরুর যোগ-সাধনা ব্যভিচার মুক্ত নয়। আবার পথ সম্বল। বিহার আর মধ্যপ্রদেশেরও অনেক জায়গায় ঘুরেছে। ফল শূন্য।

লাভের মধ্যে এই চার বছরে সে রিক্ত, কপর্দকশূন্য। কারো অনুগ্রহ হলে আহার জোটে, না হলে জোটে না। ঘুরে ফিরে আবার সে এই বাংলায় ফিরে এলো। কলকাতায় নয়, এলো রামপুরহাটে। বয়স তখন পঁচিশ। কিন্তু মনের বয়েস যেন একশ পঁচিশ। ইচ্ছে, সেই তারাপীঠেই বামাক্ষেপার পঞ্চমুণ্ডির আসনে মৃত্যু পণ করে বসবে। জীবিত কাউকে পেল না। অমর লোকের ওই সাধক যদি পথের হদিস দেয়। বাড়ি ছেড়ে তিন দিনের জন্য এই তারাপীঠে এসেছিল বলেই বাবা বরাবরকার জন্য তাকে বাইরের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে সেই তারাপীঠেই আবার তাকে

টানছে। গত চার বছরে কম করে এক কুড়ি যোগীর সংশ্রবে এসেছে। এদের কেউ তান্ত্রিক কেউ বা ভিন্ন পথের। তন্ত্রের ওপরেই প্রবোধচন্দ্রের বেশি টান কেন নিজেও জানে না। এ সম্পর্কে যেটুকু ধারণা তার সবটাই ভাসা-ভাসা। এই সাধনার লক্ষ্য মোটামুটি জানা আছে। বৈদিক সাধনার তুলনায় তন্ত্রসাধনা অনেক বেশি রহস্যময় বলে মনে হয়। তাছাড়া বৈদিক সাধনার মধ্যে অপ্রকাশ কিছু নেই, গোপন কিছু নেই। তন্ত্রসাধনার সবটুকুই গোপন, গুহ্য। রহস্যময় মনে হওয়ার এও হয়তো একটা কারণ। কিন্তু এই মার্গের খাঁটি সাধক বা সিদ্ধপুরুষ কি নেই কোথাও? যারা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরতে চাইলো, তাদের কাছে ধরা দিতে পারা গেল না কেন? কামাচার-ব্যভিচার কোনো সাধনার অঙ্গ হতে পারে এই চিন্তা কিছুতেই মনে ঠাঁই পায় না। আশার থেকে অনেক বেশি হতাশা নিয়েই তারাপীঠ লক্ষ্য করে রামপুরহাটে এসেছে।

কিন্তু আসলে তার জন্য অন্য কিছু নির্দিষ্ট বলেই রামপুরহাট আসা।

এখানে খবর পেল বছর তিন চার হলো বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানের গায়ে একজন বিরাট তন্ত্রসাধক ডেরা করে আছেন। এর বহু আগে থেকেই বক্রেশ্বরের ওই মহাশ্মশান তাঁর সাধন ক্ষেত্র ছিল নাকি। কিন্তু তখন এক নাগাড়ে তিনি চার ছ'মাসের বেশি থাকতেন না। কোথায় চলে যেতেন কেউ জানে না। অনেকের ধারণা তিনি এখানেই থাকতেন কিন্তু অদৃশ্যভাবে থাকতেন। মোট কথা বছরে চার ছ'মাস করে প্রতি বছরই তাঁকে বক্রেশ্বরে দেখা যেত। কারো সঙ্গেই তিনি বড় একটা বাক্যালাপ করতেন না, কারো দিকে চোখ মেলে তাকাতেনও না বড়। কিন্তু যাকে ডাকতেন বা যার দিকে তাকাতেন, সকলেই বুঝতো সে বাবার কৃপা পেল। এ-রকম কৃপা এই রামপুরহাটেও কেউ কেউ পেয়েছে। যেমন এখানকার এক পুলিশ অফিসারের নাম সকলেই জানে। মোহিনী ভট্‌চায্‌। খুব জাঁদরেল লোক ছিলেন এক সময়। কিন্তু তাঁকে কেউ ভালো মানুষ বলে ভাবত না। মদ্যপ অত্যাচারী বলেই জানত। শুধু তিনি কেন, তাঁর ভাই ভাইপোও পুলিশে চাকরি করে। কেউ কম যায় না। এই মোহিনী

ভট্‌চায্‌কে যম-রোগে ধরেছিল। লিভার ক্যানসার। শিবের অসাধ্য রোগ। শুনে অনেকে খুশি হয়েছিল। হবে না কেন, মিত্রর থেকে তাঁর শত্রুই তো বেশি।

···মোহিনী ভট্‌চায্‌ পাগলের মতো হয়ে গেছলেন। সবই কৃতকর্মের অপ-রাধের ফল ভেবেছেন তিনিও। তারাপীঠ তো রামপুরহাটের গায়েই। স্টেশন থেকে আড়াই তিন মাইল পথ। মোহিনী ভট্‌চায্‌ তারা মায়ের সামনের চাতালে এসে হত্যা দিলেন। মায়ের সামনেই এই পাপ-দেহ যাক।

তিন দিন বাদে ভোরের দিকে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। কোনো মেয়েছেলের গলা যেন ধমকাচ্ছে তাকে।—এখানে পড়ে থাকলে তো মরবি, বাঁচতে চাস তো বক্কোমুনির থানে কংকালমালীর কাছে যা না! তার ঝাঁটা না খেলে এই রোগ পালায়?

···ঘুম ভাঙার পরেও সেই রমণী-কণ্ঠ যেন কানে লেগে আছে। বক্কো-মুনির থান মানে বক্রেশ্বরের মহাশ্মশান। আর সেখানকার ওই ভৈরবের নাম কংকালমালী। কংকাল যার গলায় মালা সে কংকালমালী। এক-কথায় রুদ্র, শিব। কিন্তু সেই ভৈরবের কংকালমালী নাম বটে, তার অঙ্গে কংকালের কোনো চিহ্নও নেই নাকি।

কংকালমালী ভৈরবের নাম মোহিনী ভট্‌চাযের শোনা ছিল অবশ্য। কৃপা হলে অনেকের আধি-ব্যাধি সারিয়েছেন এমন খবরও কানে এসেছে। কিন্তু কণামাত্র বিশ্বাস নেই বলেই তাঁর কথা মনে হয়নি। না ভোর-রাতের এই আদেশ তিনি নিজের অবচেতন মনের ক্রিয়ার ফল ভাবতে পারলেন না। গাড়িতে কত আর পথ বক্রেশ্বর। পুলিশের চাকরি, গাড়ি পেতেও অসু-বিধে নেই।

ডেরায় ভৈরব কংকালমালী নেই। কেউ বলতে পারল না তিনি কোথায়। অথচ এক ঘণ্টা আগেও অনেকে দেখেছে নাকি। মোহিনী ভট্‌চায্‌ তাঁকে মন্দিরে আর উষ্ণ প্রস্রবণগুলির দিকে খোঁজাখুঁজি করলেন। কোথাও তাঁর হদিস পেলেন না।

শ্রান্ত ক্লান্ত মোহিনী ভট্চায্ সন্ধ্যার দিকে একলা পাপহরার প্রবাহ ধরে এগিয়ে চললেন। এই পাপহরার ধারেই শ্মশান। অনেক দূরে একটা নিভু-নিভু চুল্লি লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন তিনি। নিজের ইচ্ছেয় নয়, পা দুটো আপনা থেকে সেই দিকে চলল। জায়গায় জায়গায় শেয়ালের শব নিয়ে কাড়াকাড়ি চোখে পড়ছে। কিন্তু মোহিনী ভট্চাযের তখন আর ভয়-ডর বলে কিছু নেই।

চুল্লির অদূরে কে একজন বসে। মাঝে মাঝে জোরে বাতাস দিচ্ছে, বাতাসে চুল্লির আগুন এক-একবার বাড়ছে। সেই আগুনে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। কাছে এগোলেন। আরো ভালো করে তাঁকে দেখলেন। সম্পূর্ণ নগ্ন। মাথার জটাজুট চুল-দাড়ি বুক-পিঠের নিচে নেমে এসেছে। গায়ের রং কালোর দিক-ঘেঁষা লালচে মনে হলো।

কেউ বলে না দিলেও ভট্চায্ যেন জানেন ইনিই কংকালমালী ভৈরব। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ বাদে ভৈরব ভাঁটার মতো চোখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে। তারপর কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একটা আধপোড়া চেলা-কাঠ নিয়ে তাড়া করলেন তাঁকে। মোহিনী ভট্চাযের প্রথম অনুভূতি পালানোর। তারপর মনে হলো মৃত্যুর খাঁড়া তো এমনিতেই মাথার ওপর ঝুলছে—পালাতে যাবেন কেন! হাত জোড় করে দাঁড়িয়েই রইলেন।

ভৈরব হুংকার দিয়ে উঠলেন, শালা মরনেকা লিয়ে আয়া—নিকালো হিঁয়াসে।

ভট্চায্ হাত জোড় করে দাঁড়িয়েই রইলেন। ক্রুদ্ধ ভৈরব হাতের জ্বলন্ত চেলাকাঠ নিয়েই হন-হন করে একদিকে চললেন।

মোহিনী ভট্চায্ কলের মতোই তাঁকে অনুসরণ করলেন।

অনেকটা পথ পেরিয়ে ভৈরব একটা ভাঙাচোরা চালাঘরের সামনে মাটির দাওয়ায় বসলেন। জোরে হাওয়া দিলে ভেঙে পড়বে এমনি ঘরের দশা। অন্ধকার। চেলা-কাঠের আগুনে যেটুকু দেখা যায়।

চোখের ইশারায় ভট্চায্‌কে সামনে বসতে বললেন।

ভট্চায্ বসলেন।

ভৈরবের সঙ্গে তিন দিন সেই চালাঘরে কাটিয়েছেন তিনি। না চালাঘরেও নয়, ওই দাওয়ায়। ভৈরব ঘরের মধ্যে রাত কাটিয়েছেন নয়তো শ্মশানে। গাঁয়ের লোক ভৈরবকে ফলমূল দিয়ে যায়। তিনি পা দিয়ে সেগুলো ওঁর দিকে ঠেলে দেন। এ-ছাড়া এই তিন দিনে আর কোনো আহার ছিল না। তিন দিনের মধ্যে ভৈরবকে তিনি কিছুই মুখে তুলতে দেখেন নি।

···তৃতীয় রাতে ঝোলা থেকে কিছু শেকড়-বাকড় বার করে তাঁর হাতে দিয়েছেন। রোজ একটু একটু করে জল দিয়ে ছেঁচে তারপর বেটে খেতে বলেছেন। তখনই স্পষ্ট বাংলা কথা শুনেছেন তাঁর মুখে। বলেছেন, শালা তুই অনেক পাপ করেছিস, তারই দুর্ভোগে পড়েছিস—এমনিতে তোর বিশেষ কিছুই হয়নি, এরপর সমঝে না চললে হাড়ে-মাংসে পচন ধরে মরবি। যা ভাগ—

···দিন সাতেকের মধ্যেই সুস্থ সবল মানুষ মোহিনী ভট্চায্! দেহে কোনো ব্যাধির চিহ্নমাত্র নেই। সেই থেকে ভদ্রলোক একেবারে বদলে গেছেন। এখনো কাজে বহাল আছেন এই পর্যন্ত। জপ-তপ সম্বল করে ভারী আনন্দে আছেন। আরো আশ্চর্য, শুধু তিনিই নন, পুলিশের চাকুরে তাঁর ভাই-ভাইপোরা পর্যন্ত একেবারে বদলে গেছে। কংকালমালী ভৈরব তাঁদের কাছে জাগ্রত শিব।

কিন্তু এই শিবের নাগাল পাওয়া ভার। মোহিনী ভট্চায্ সম্পূর্ণ সুস্থ হবার খবর শুধু রামপুরহাটে কেন—অনেক জায়গার লোকই জেনেছে। ব্যাধি নিরাময়ের আশায় আগেও লোক যেত তাঁর কাছে। এরপর ছোটা-ছুটির ধুম পড়ে গেল। কিন্তু কোথায় কংকালমালী ভৈরববাবা? তিনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। পরের বছরখানেক তাঁর আর কোনো পাত্তাই নেই।

তারপর শ্মশানের সেই ডেরায় হঠাৎই আবার তার দেখা মিলল। তখন আবার কাতারে কাতারে মানুষের ভিড়। ব্যাধিগ্রস্তদের আবেদন নিবেদন। মেজাজ হলে ভৈরব ওষুধ দেন। না হলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু

তাড়ালেই কি লোক সরে যায়। ফলে ভৈরবই আবার অদৃশ্য হন। এই করেই কয়েকটা বছর চলেছিল। বছরের মধ্যে মাস কয়েক ভৈরব-বাবা বক্কোমুনির এই শ্মশানের ডেরায় থাকেন। বাকি সময় তিনি কোথায় থাকেন কেউ জানে না। এখানে থাকেন যখন, একটি লোক সপ্তাহের বেশির ভাগ দিনই ভৈরবের ওখানেই পড়ে থাকেন। তিনি রামপুরহাটের মোহিনী ভট্চায্।

বছর চারেক হলো বাবার চালচলনের ব্যতিক্রম দেখছে সকলে। কংকাল-মালী ভৈরব এখানেই আছেন। আর যান না কোথাও। তাঁর শ্মশানের সেই ডেরা একবার তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ ভেঙে আরো অনেক বড় আর মজবুত করে ঘর তুলে দিয়েছেন মোহিনী ভট্চায্। দরকারও হয়ে পড়েছিল। কারণ, তারও তিন বছর আগে অর্থাৎ সাত বছর আগে ভৈরব-বাবার ডেরায় একজন বাসিন্দার আবির্ভাব দেখেছে সকলে। তিনি এক ভৈরবী। বয়েস বেশি নয়, অপূর্ব রূপসী। সেবারে বাবা এক বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। ফিরলেন যখন, সঙ্গে এই ভৈরবী। ভৈরববাবা কোথা থেকে এই ভৈরবী সংগ্রহ করেছেন, সঠিক কেউ জানে না। কিন্তু ভৈরবীকে নিয়ে কিছু কানাঘুষো শোনা যায়। তিনি নাকি বীরভূমেরই বড় কোনো ঘরের ঘরণী। অত্যাচারী লম্পট স্বামীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না বলে কলকাতায় বাস করতেন। তবে সবই শোনা কথা। এই ভৈরবীকে আগে চাক্ষুষ কেউ কখনো দেখেনি। আর এই কানাঘুষোও একটুও সরব হয়ে ওঠেনি ভয়ে। কারণ, যে ভৈরবীকে নিয়ে কথা, তাঁর ভৈরব স্বয়ং কংকাল-মালী—যিনি জাগ্রত শিব। কানাঘুষোয় বেশি কান দিয়ে কে তাঁর রোষের মুখোমুখি হতে চায়?

ভৈরবীর আবির্ভাবের পরে ও গোড়াব বছর তিনেক কংকালমালী ভৈরব নিয়মিত সাত আট মাস করে অদৃশ্যই থাকতেন। ভৈরবী মায়ের দেখা-শুনোর ভার তখন সম্পূর্ণই মোহিনী ভট্চাযের। তিনি তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করেন।...কিন্তু গত চার বছরে কংকালমালী ভৈরব আর ঠাঁই বদল করেননি। বক্কোমুনির থানে অর্থাৎ শ্মশানেই ভৈরবীকে নিয়ে আছেন।

রামপুরহাটে থাকাকালীন প্রবোধচন্দ্র এ-সব সমাচার শুনেছিল তারা-পীঠের এক বৃদ্ধ ভক্তর মুখে। তখন রামপুরহাট থেকে রোজই তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে একবার করে তারাপীঠে আসত। তখনই এই বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ। পরের জীবনের কালীকিংকর অবধূতের বিশ্বাস এ-ও এক সাজানো ঘটনা। নইলে ওই বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর এমন অন্তরঙ্গ যোগাযোগের আর কোনো তাৎপর্য নেই।

বৃদ্ধটিকে প্রবোধচন্দ্রের ভারী ভালো লেগেছিল।···সে বামাক্ষ্যাপার পঞ্চ-মুণ্ডির আসনে ধ্যানস্থের মতো বসেছিল। ফোঁস ফোঁস দীর্ঘনিশ্বাস কা ন আসতে দেখে পাশে ওই বৃদ্ধ বসে। পর পর তিন চারদিন একই ব্যাপার। কথায় কথায় আলাপ। বৃদ্ধের বড় দুঃখ তারা-মা কতজনকে তরিয়ে দিল, কিন্তু তাঁর প্রতি কৃপা আর হলো না। কোন্ কৃপার প্রত্যাশী তিনি?··· কিছু না। কেবল মা আছেন, এই বদ্ধ বিশ্বাসটুকুই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, এটুকুরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি দেখতে চান। ভদ্রলোক রেলের ভালো চাকরি করতেন। প্রৌঢ় বয়সে বউ মারা যায়। সংসার বলতে তিন ছেলে। রিটায়ার করার পর কলকাতায় বাড়ি করেছিলেন। ছেলেরা তখন সংসারী। রিটায়ার করার পরে মনে হয়েছিল তাঁদের সংসারে তিনি অবাঞ্ছিত। মনে হওয়া মাত্র সব ছেড়েছুড়ে পনেরো বছর ধরে তারাপীঠে পড়ে আছেন। পেনসনের টাকা ক'টি সম্বল। তা-ও সব নয়, পেনসনের তিন ভাগের এক-ভাগ ছেলেরা মাসে মাসে পাঠায়। সেই রকমই নির্দেশ ছিল তাঁর। দিব্বি চলে যায়।···কিন্তু মা দয়া করছেন না।

ভদ্রলোককে এত ভালো লেগেছিল যে প্রবোধচন্দ্র নিজের হতাশার কথাও তাঁকে বলেছিল। শুনে আন্তরিক পরামর্শই দিয়েছিলেন তিনি। বলে-ছিলেন, বাবা তুমি একবার বক্কোমুনির থানে গিয়ে কংকালমালী ভৈরবের শরণ নাও না—হয়তো যাঁকে খুঁজছ তাঁর মধ্যেই পেয়ে যাবে।

যতটুকু জানেন, কংকালমালী ভৈরবের সমাচার তিনি বলেছেন। প্রবোধ-চন্দ্রের খুব আগ্রহ হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও এক ভৈরবীর অবস্থান শুনে হতাশ হয়েছিল। বলেছিল, ভৈরবী-টৈরবী নিয়ে যাঁরা সাধনা করছেন

তাঁদের সংশ্রবে আর যেতে চাই না।

—কেন গো। তিনি অবাক।—আ-হা, সাক্ষাৎ মা জগদ্ধাত্রী তিনি—আমি নিজে গিয়ে একবার বাবাকে আর ভৈরবীকে দেখে এসেছি। ভৈরবী মা তো কেবল মাত্র লোককে ওষুধ দেওয়া ছাড়া আর কোনো ক্রিয়া-কলাপ করেন না—ভৈরব নিজের সাধন নিয়ে থাকেন, নিজে আর কাউকে ওষুধ দেন না—ওই ভৈরবী মা দেন।

শুনে আবার কৌতূহল হয়েছিল।—তাঁর ওষুধে লোকের অসুখ সারে?

—নিশ্চয়ই সারে। নইলে মঙ্গলবারে ওষুধের জন্য হাজারের ওপর লোকের লাইন পড়বে কেন?

—ভৈরবী মায়ের বয়েস কত হবে?

—এঁদের বয়েস তো ঠিক ধরা যায় না। মনে হয় তেত্রিশ-চৌত্রিশ হবে।

—আর কংকালমালী ভৈরবের?

—সেটা বলা অসাধ্য। কেউ বলে দেড়শ পৌনে দু'শ বছর, আবার কেউ বলে পঁচাত্তর-আশী। আমি কেবল দেখেছি বেশ শক্ত মজবুত দেহ।

··ভৈরবী মা অপূর্ব রূপসী আর বয়েস মাত্র তেত্রিশ-চৌত্রিশ শুনে প্রবোধ-চন্দ্রের আবার দ্বিধা। ভৈরবীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা কখনো ভালো ছিল না। তার মধ্যে নিজেরও কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।···হ্যাঁ, কামাখ্যা থেকে তাকে পালিয়েই আসতে হয়েছিল। সেখানে এক ভৈরবের করুণা পাবে আশা হয়েছিল। কিন্তু পাঠ শুরু হয়েছিল তাঁর ভৈরবীর কাছে। তার থেকে কম করে বিশ বছরের বড়। আরো বেশি হতে পারে। ভৈরবী-দের বয়েস সত্যিই আঁচ করা শক্ত।···সেই ভৈরবী প্রথমেই তাকে কামা-চারের পাঠ দিতে এগিয়েছিলেন। তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে আর নিজে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তার কোলে বসে হর-পার্বতীর এই রূপ ধ্যান করতে বলেছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেখান থেকে সেই রাতেই পালিয়েছিলেন। বক্রেশ্বর যাবে কি যাবে না স্থির করতে দুই একটা দিন কেটে গেল। একবার ভাবল, রাম-পুরহাটে মোহিনী ভট্চাযের সঙ্গে আগে গিয়ে দেখা করলে কি হয়? তার থেকে আগে নিজের চোখে গিয়ে একবার দেখে আসাই ভালো মনে

হলো। এই ভৈরবী মাতাজী এত লোককে ওষুধ দেন, সে-ও কেন যেন এক বাড়তি আকর্ষণের মতো মনে হলো তার।

এক মঙ্গলবারের ভোরেই বক্রেশ্বরে এলো।···তারাপীঠের বৃদ্ধ খুব অত্যুক্তি করেননি। সেই সকাল থেকেই ওষুধের আশায় কাতারে কাতারে লোক লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনল সুপুর-রামপুর-ইলামবাজার-বোলপুর-সাঁইথিয়া-রামপুরহাট-নলহাটি-সিউড়ী থেকে তো বটেই, ওষুধের আশায় মুশিদাবাদ-সাঁওতাল পরগনা-বর্ধমান এমন কি কলকাতা থেকেও লোক আসার বিরাম নেই। বক্কো বাবার থানে ভৈরবী মায়ের ওষুধের কথা ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের কানে কোনো না কোনো ভাবে পেঁৗছেই যায়।

সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে প্রবোধচন্দ্র ভৈরবী মায়ের ওষুধ দেওয়া দেখল। আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেখানে শৃঙ্খলার তদারক করছেন যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তিনিই কংকালমালী ভৈরবের অশেষ কৃপা-প্রাপ্ত মোহিনী ভট্চায্। অন্যরা তাঁরই ভাই-ভাইপো অথবা তাদের লোক।··ভৈরবী মা উঁচু বাঁধানো দাওয়ার আসনে বসে। তাঁর দু'হাতের মধ্যে কাগজ কলম নিয়ে বসে আর একটি লোক। পিছনে একটা লাল বস্ত্রের ওপর নানা আকারের ডালার মধ্যে ছোট বড় কাগজের মোড়ক। সেখানেও আর একটি লোক বসে। ভৈরবী মায়ের দাওয়ার দশ গজ তফাতে ছোট্ট একটা কাঠের গেট। সেটা সরিয়ে একজন করে লোক মায়ের সামনে আসছে। তার হয়ে গেলে সে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, লাইনের পরের লোক আসছে। বিশ গজ ফারাক থাকার দরুন কারো ব্যাধির কথা অপরে শুনতে পাচ্ছে না।···হ্যাঁ, অনির্বচনীয় রূপই বটে মাতাজীর। কিন্তু বড় স্থির, স্নিগ্ধ। অন্য ভৈরবীদের মতোই পরনে রক্তাম্বর বেশবাশ—এটুকুই শুধু মেলে, আর কিছু মেলে না।···কি মেলে না প্রবোধচন্দ্র সব ঠাওর করতে পারল না, কেবল মনে হলো রূপ তো নয়ই, কোনো কিছুই মেলে না।

ভৈরবী মা পারত-পক্ষে কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। যে আসছে স্থির

চোখে শুধু তাকে দেখছেন, তার নিবেদন শুনছেন। শোনা হলে একটু ঘুরে পিছনের লোক তাঁর ইশারায় ডালা সামনে এগিয়ে দিচ্ছে। তিনি ওষুধ তুলে আলতো করে প্রার্থীর অঞ্জলিবদ্ধ হাতে ফেলে দিচ্ছেন। ওষুধ কি-ভাবে খেতে হবে খুব সম্ভব মোড়কের গায়ে বা ভিতরে লেখা থাকে। ওষুধ পেলে প্রার্থী যুক্ত হাতে প্রণাম করে সামনের কাঠের বাক্সে একটি সিকি ফেলে চলে যায়। সমস্ত ওষুধেরই এই এক প্রণামীমূল্য। সকলেই জানে এটুকু শুধু ওষুধ সংগ্রহের খরচ। অর্থাৎ বিনা মূল্যেরই ওষুধ। মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করার রীতি নেই। দু'পা ঢেকে মা যোগাসনে বসে থাকেন। ওষুধ পেলে হাত জোড় করে প্রণাম করে চলে যেতে হয়। সকলেই ওষুধ পায় বা সকলেরই ওষুধ মজুত থাকে এমন নয়। যে পায় না বা যার ওষুধ মজুত থাকে না, নিবেদন শোনার পর মা আঙুলের ইশারায় ও-দিকে কাগজ কলম নিয়ে বসা লোকটিকে দেখিয়ে দেন। সেই লোক দু'চার কথায় কিছু লিখে রেখে তাকে এক বা দু'সপ্তাহ পরে আসতে বলে দেয়।

ভোর সাতটা থেকে বিকেল প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত একদিকে ঠায় দাঁড়িয়ে লোকের এই ওষুধ নেওয়ার পর্ব দেখে গেল প্রবোধচন্দ্র। এর মধ্যে লেখার লোক আর ওষুধের ডালা এগিয়ে দেবার লোক বদল হয়েছে, একমাত্র মোহিনী ভট্চায্ ছাড়া অন্য সব তদারকি লোকদেরও পালা করে এক-দেড় ঘণ্টার জন্য অনুপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। শুধু মোহিনী ভট্চায্ এক-ভাবেই তাঁর কাজ করে গেছেন, আর আসন ছেড়ে একবারও নড়েননি কেবল ভৈরবী মা।

···আর অনতিদূরে এই একটি ছেলে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে কেবল দেখে গেছে—এটুকু লক্ষ্য করেছেন ভৈরবী মা-ও। চোখ তুলে দুই একবার সোজা তাকিয়েছেন তার দিকে। প্রবোধচন্দ্রের তখন মাথা নিচু।

তখনও যারা আসছিল মোহিনী ভট্চায্ তাদের হাতের ইশারায় চলে যেতে বললেন। অর্থাৎ আর হবে না, ভৈরবী মা তাঁর আসন ছেড়ে উঠে

পড়েছেন। পয়সার কাঠের বাক্স, ওষুধের ডালা তিনিই দাওয়া থেকে ঘরে রেখে এলেন। অন্য সকলে বাইরে দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে। ভৈরবী মা দাঁড়িয়ে দুই এক মিনিট ভট্‌চাযের সঙ্গে কথা বললেন। প্রথমে দোর গোড়ায় পরে ভৈরবী মা-কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সকলকে নিয়ে অদূরে দাঁড়ানো একটা মোটরে উঠলেন তিনি। যাবাব সময় একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রবোধচন্দ্রকে ভালো করে লক্ষ্য করলেন। ঘুরে দেখলেন ভৈরবী মা-ও এই ছেলেটির দিকেই তাকিয়ে আছেন। কিছু না বলে তিনি চলে গেলেন।

বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। দাওয়ায় ভৈরবী মা দাঁড়িয়ে। গজ পনেরো তফাতে প্রবোধচন্দ্র। তার মাথা নিচু।

একবার মুখ তুলতে চোখাচোখি হলো। মনে হলো ভৈরবী মা মাথা নেড়ে তাকে কাছে আসতে ইশারা করলেন।

মাথা নিচু করে প্রবোধচন্দ্র পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। দাওয়ার তিন হাতের মধ্যে দাঁড়ালো।

—তোমার কি?

প্রবোধচন্দ্র মাথা নাড়ল। কিছু না।

—কিছু না তো সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

নিরুত্তর।

—কিছু বলবে?

মুখ না তুলে মাথা নাড়ল। কিছু বলার নেই।

ভৈরবী মা স্থির চোখে দেখছেন।—তাহলে না খেয়ে সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কি চাই?

—ভৈরব বাবার দর্শন। তাঁর কৃপা।

আবার নিরীক্ষণ করছেন।—তিনি কাউকে দর্শন দেন না, কারো সঙ্গে কথা বলেন না।

প্রবোধচন্দ্র নির্বাক।

ভিতর থেকে বিরক্ত গম্ভীর গলা শোনা গেল।—বাইরে কে দাঁড়িয়ে—কার সঙ্গে কথা বলছ?

—একটি ছেলের সঙ্গে।

—কি চায়?

—আপনার দর্শন আর কৃপা।

এবারে হুঙ্কার।—চলে যেতে বলো।

প্রবোধচন্দ্র ভয়ে ভয়ে ভৈরবী মায়ের দিকে তাকালো।

তিনি স্থির চোখে তাকেই দেখছেন। একটা হাত তুলে তাকে অপেক্ষা করতে ইশারা করে ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরলেন। এক হাতের চেটোয় শালপাতা, অন্য হাতে মাটির গেলাস।

—ধরো।

প্রবোধচন্দ্র মুখ তুলল। শালপাতায় খানিকটা মেওয়াগোছের কিছু। গেলাসে দুধ।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় গলা-বুক শুকিয়ে ঝামা হয়ে আছে খেয়াল ছিল না। দেখে তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়ালো। ভৈরবী মায়ের হাত থেকে আগে শালপাতা নিল। শুকনো গলা বুক, তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে বিষম খেল।

—আগে খানিকটা দুধ খেয়ে গলা ভিজিয়ে নাও।

প্রবোধচন্দ্র তাই করল। খাওয়া শেষ হতে মাটির গেলাস আর শালপাতা হাতে দাঁড়িয়েই রইলো।

ভৈরবী মা তার পা থেকে মাথা পযন্ত দেখছেন। গলা খাটো করে বললেন, কাল সকাল ছ'টার আগে এসো, দর্শন পাবে। কৃপা কতটা পাবে তিনি জানেন।

একটু এগিয়ে গিয়ে হাতের শালপাতা আর মাটির গেলাস ফেলে প্রবোধচন্দ্র একবার ফিরে তাকালো।

ভৈরবী মা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। চেয়ে আছেন।

রাতটা প্রবোধচন্দ্র মন্দিরের চাতালে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিল। ঘুম প্রায় হলোই না। আধো ঘুমের মধ্যে কতবার ভৈরবী মায়ের মুখখানা দেখল ঠিক নেই। আধো ঘুমের মধ্যেই এক-একবার মনে হলো সে যেন বিশেষ কোনো আনন্দের উৎসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই উৎসের মধ্যেও ভৈরবী

মায়ের মুখের ছায়া দুলছে। আর সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়ও থেকে থেকে মনে হয়েছে সে এই জীবনের কিছু একটা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাত চারটেয় মন্দিরের চাতাল ছেড়ে নেমে এসেছে। ছোট স্যুটকেশটা সেখানেই একজনের জিম্মায় রেখেছিল। একপ্রস্থ জামা-কাপড় বার করে ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে স্নানাদি সেরে ফেলল। তারপর অধীর প্রতীক্ষা। শ্মশানের কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করতে লাগল। কংকালমালীর ডেরার সামনে এসে দাঁড়ালো যখন, সকাল তখন সোয়া পাঁচটা হবে। ফাল্গুনের শেষ সেটা। ভোরের আলো তখনো খুব ভালো করে জাগেনি। তবে ফাঁকা শ্মশানে ভোর একটু তাড়াতাড়িই হয়।

ডেরার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালো। সদ্য স্নান সেরে ভৈরবী মা দাওয়ার তারে ভেজা বসন শুকুতে দিচ্ছেন। আদুড় গায়ে শুকনো রক্তাম্বর জড়ানো। দু'হাত তুলে তারে ভেজা কাপড় মেলে দিতে গিয়ে বুকের বসন অনেকটা স্খলিত।

কাপড় মেলে ভৈরবী মা থমকে দাঁড়ালেন। পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে গত সন্ধ্যার সেই ছেলেটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

দেখলেন একটু। তারপর ভিতরে চলে গেলেন। মিনিট তিন-চারের মধ্যে আবার বেরুলেন। রক্তাম্বর বেশ-বাস সুবিন্যস্ত। মাথা নেড়ে ডাকলেন।

প্রবোধচন্দ্র পায়ে পায়ে দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ালো। অপলক চোখে ভৈরবী মা তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। যাকে দেখছেন তার চোখ নিজের পায়ের দিকে।

মাটির দেয়ালের পেরেকে টাঙানো দুটো কুশাসন নামিয়ে দাওয়ার মেঝেতে মুখোমুখি পাতলেন।—ভিতরে এসে বোসো, তুমি একটু আগে এসে গেছ, বাবা মাঝ-রাত থেকেই শ্মশানে, এখনো ফেরেননি।

প্রবোধচন্দ্র দাওয়ায় উঠে আসনে বসল। হাত দুই তফাতে তিনিও আসনস্থ হলেন। প্রবোধচন্দ্রের মনে হয় মহিলার চাউনি স্নিগ্ধ, কিন্তু বড় বেশি স্থির আর অপলক।

—কাল রাতে তুমি ঘুমোওনি?

স্নানাদি সেরে পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, তবু আঁচ করলেন কি করে জানে না।—তেমন ভালো না···।

—এখানে কোথায় থাকো?

—এখানে থাকি না।

—কাল কোথা থেকে এখানে এসেছিলে?

—তারাপীঠ থেকে।

—তারাপীঠে থাকো?

—না।

—তাহলে?

—কোথাও থাকি না, যেখানে ঠাঁই মেলে থেকে যাই। একবারও মুখ না তুলে জবাব দিয়ে যাচ্ছে।

ভৈরবী মায়ের দু'চোখ তার মুখের ওপর তেমনি স্থির, অপলক।—তোমার নাম কি?

বললো।

—তোমার বাবা মা ঘর বাড়ি নেই?

—বাবা মা আছেন, কলকাতায় তাঁদের ঘর বাড়িও আছে।

—তাঁদের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই?

—না।

—তুমি কতদিন তাঁদের কাছ ছাড়া?

—চার বছর।

—তোমার বয়স কত এখন?

—পঁচিশ।

—মায়ের অনুমতি নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলে?

—না।···নিজের মা নয়।

আবার থমকে চেয়ে রইলেন। মার দিকে সে একবারও মুখ তোলেনি।—পড়াশুনো কত দূর করেছ?

—এম. এ. পড়ছিলাম।··পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

পরের প্রশ্ন করতে সময় নিলেন একটু। সেই ফাঁকে দেখে নিচ্ছেন।

—চার বছর তুমি কোথায় কোথায় ঘুরেছ?

— ভারতবর্ষের প্রায় সব সাধন-ভজনের জায়গায়।

—গুরু পাওনি?

—পেয়েছি···টিকে থাকতে পারিনি···নিজেকে সমর্পণ করার মতো কাউকে পাইনি।

—তন্ত্র সাধনার গুরু খুঁজছ?

—হ্যাঁ।

—কেন?

প্রবোধচন্দ্র বাঁধা বুলি কিছু বলতে পারত। কিন্তু সে চেষ্টা করল না। মুখ না তুলেও তার মনে হচ্ছিল ভৈরবী মা তার ভেতর-বার সবই দেখতে পাচ্ছেন। সত্যি জবাবই দিল।—জানি না···।

—কিন্তু এখানে এসে তোমার কি সুবিধে হবে, ভৈরব বাবা কাউকে সাধন দেন না, কৃপাও করেন না।

—আপনি কৃপা করলে হতে পারে।

ভুরুতে ভাঁজ পড়ল একটু।—আমি বললেও হবে না, তাছাড়া তিনি যা করেন না, আমি তাঁকে তা বলতে যাব কেন?

—সে-কথা বলছি না···আপনার কৃপাই চাইছি।

থমকালেন।—আমার কাছ থেকে সাধন নেবে?

ঘাড় গোঁজ করেই সামান্য মাথা নেড়ে সায় দিল।

—কিন্তু আমার তুমি কতটুকু জানো?

অকপটে মনের কথাই বললো প্রবোধচন্দ্র।—আপনাকে আমার ভালো লেগেছে···।

—কি ভালো লেগেছে?

—সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এত লোককে ওষুধ দেওয়া। উপকার না পেলে এত লোক আসত না।···এই সাধনটুকু পাওয়া আমার কোনো কিছু থেকে কম মনে হলো না।

অন্তত মিনিটখানেক আর সাড়াশব্দ নেই। ভৈরবী মায়ের ছু'চোখ এই ছেলের মধ্যে কি দেখছে তিনিই জানেন।

—মুখ তোলো।

প্রবোধচন্দ্র চেষ্টা করে ছু'চোখ তাঁর মুখের ওপর তুললো।

—তুমি আমার কাছ থেকে সাধন নেবে কি করে, তন্ত্র সাধনে দৃষ্টির সাধনা বড় জিনিস—তুমি তো আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতেও পারছ না?

দ্বিধান্বিত জবাব, আপনি কৃপা করলে পারব।

—আমি কৃপা করলে পারবে মানে? এখন পারছ না কেন?

নিরুত্তর। আবার মাথা নিচু।

—কেন পারছ না?

—ভয়ে···।

হতবাক একটু।—কিসের ভয়, কেন ভয়?

দ্বিধান্বিত জবাব।—কামাখ্যায় আমার সাধনের ভার সেখানকার ভৈরব-বাবা ভৈরবী-মাকে দিয়েছিলেন।···তাঁর আচরণে আমাকে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

হতভম্ব একটু।—কেন, তাঁর মেজাজ খুব কড়া?

—না···।

—তাহলে?

নিরুত্তর।

—কথার জবাব একবারে দেবে, তাহলে তোমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে কেন?

প্রবোধচন্দ্র মরিয়া হয়েই বলে ফেলল, ও-সব হর-গৌরীর আসন-টাসন আমার বিচ্ছিরি রকম নোঙরা মনে হয়েছিল···তাই!

ভৈরবী-মা হতভম্ব প্রথম। তারপর বিড়ম্বনা আর হাসি চাপার তাড়নায় সমস্ত মুখ লাল। গালে হাত রাখার মতো করে এক হাতে মুখ চাপা দিয়ে জিগ্যেস করলেন, সেই ভৈরবী-মায়ের বয়েস কতো?

—চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হতে পারে।

—মুখ তোলো। এবারে নিজের মুখ সদয়।

প্রবোধচন্দ্র মাথা তুলল। এই মূর্তি অনির্বচনীয় মনে হলো তার।

—সত্যিকারের কোনো সাধনেই নোঙরামির জায়গা নেই, তুমি ভুল লোকের কাছে গেছলে।...সে ভৈরবী নয়, পিশাচী...ভয়ে মুখ তুলতে চাও না কেন—আমাকে দেখেও তোমার সে-রকম মনে হয়?

প্রবোধচন্দ্র অপরাধী মুখে একটু জোরেই মাথা নাড়ল। মনে হয় না।

উনি উঠে গেলেন। মিনিট তিন-চারের মধ্যে মাটির ছোট মালসার মতো পাত্রে বড় দুটো সাদা বাতাসা, দুটো নারকেলের নাড়ু, আর কিছু ভেজানো মুগের ডাল নিয়ে ফিরলেন। অন্য হাতে মাটির জলের গেলাস। সামনে রেখে বললেন, খাও—।

প্রবোধচন্দ্র তক্ষুণি খেতে লাগল। গতকাল সকাল থেকে তার পেটে অন্ন পড়েনি।

খাওয়া শুরু করেই সচকিত। কঙ্কালমালী ভৈরব-বাবা আসছেন। পরনে সামান্য কৌপিন, হাতে লম্বা চিমটে! দূর থেকে তাকে দেখেই বিরক্ত রুষ্ট মুখ।

দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই ভৈরবী-মা আসন ছেড়ে উপুড় হয়ে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলেন, এ ছোঁড়া আবার কে?

প্রবোধচন্দ্রের বিড়ম্বনার একশেষ, এক হাত এঁটো, প্রণাম করারও উপায় নেই। ভৈরবী-মা জবাব দিলেন, কালকের সেই ছেলেটি...আপনার দর্শন আর কৃপার আশায় কাল সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল।

যে-ভাবে তাকালেন ভৈরব-বাবা, প্রবোধচন্দ্রের মনে হলো হাতের চিমটে দিয়েই মেরে বসবেন। তার বদলে গলা দিয়ে চাপা হুংকার বেরুলো।—দূর হ—দূর হ!

ঘরে ঢুকে গেলেন। ভৈরবী-মায়ের সদয় মুখ।—তুমি খাও বাবা।

খাওয়া শেষ হতে ভৈরবী-মা জিগ্যেস করলেন, দুপুরে খাবে কোথায়?

—ঠিক নেই।

—খাবার টাকা-পয়সা আছে?

তাড়াতাড়ি জবাব দিল, সে-জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মাটির পাত্র আর গেলাস হাতে উঠে দাঁড়ালো।

—ব্যবস্থা এখানেই হবে।··সাড়ে বারোটা-একটার মধ্যে এসে বাবার প্রসাদ নিয়ো।

প্রবোধচন্দ্র দাওয়া থেকে নামল। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, আমার খাওয়াটা বড় কথা নয়, অনেক দিনই না খেয়ে কাটে····আমার আরজি আপনি মনে রাখবেন?

চেয়ে আছেন। আরো সদয় মুখ। বললেন, আমি নিজে তো তোমার আরজি মঞ্জুর করার মালিক নই···দেখি চেষ্টা করে—দুপুরে এসো কিন্তু, আমি অপেক্ষা করব।

প্রবোধচন্দ্র মাথা নেড়ে জানালো, আসবে। একটু দূরে মাটির পাত্র মাটির গেলাস ফেলে বড় বড় পায়ে শ্মশান থেকে বেরিয়ে এলো।· আরজি মঞ্জুর করার মালিক, কংকালমালী-বাবা। তাঁর মেজাজও স্বচক্ষেই দেখল। তবু প্রবোধচন্দ্রের বুকের ওপর থেকে যেন একটা পাথর সরে যাচ্ছে। মন বলছে সে ঠিক জায়গায় এসেছে। এখানে আশ্রয় মিলবে। মিলবেই।

বেলা সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে আসার কথা। কিন্তু বারোটার মধ্যেই এসে হাজির। ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নায় আদৌ নয়। ভৈরবী-মায়ের আকর্ষণে। নিজের মা-কে মনেও পড়ে না। কিন্তু সমস্তক্ষণ এক মা-পাওয়ার আনন্দে ভিতরটা ভরপুর। মা নেই সে-দুঃখ কোনোদিনও ছিল না। কিন্তু এই মা-কে না পেলে যেন সর্বনাশ।

জুতো জোড়া খুলে নিঃশব্দে দাওয়ায় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে একটা রুষ্ট-গম্ভীর ঝাপটা কানে এসে লাগল। কংকালমালী-ভৈরবের গলা।

—ও-সব ঝামেলা আমার ভালো লাগে না, দূর হয়ে যেতে বলো! তন্ত্রের সাধনায় ও খুব কিছু এগোবে না।

—যেটুকু এগোয়, তাছাড়া ওষুধ শেখার ব্যাপারেই ওর বেশি আগ্রহ দেখলাম, আপনাকে বিরক্ত না করে ওর ভার আমিই নেব।

আবার হুংকার।—কেন, তোমার এত গরজ কিসের?
—ছেলেটির লক্ষণ বেশ ভালো। আমি খুব ভালো করে দেখে নিয়েছি।
—তা বলে যত লোকের লক্ষণ ভালো সকলকে তুমি এখানে ডেকে আনবে? আমাকে তুমি এখান থেকে তাড়াতে চাও?
—সকলের কথা বলিনি। সকলের তৃষ্ণা আর এই ছেলের তৃষ্ণা এক নয়—আমি শুধু একে নেব।
—হুঁঃ! স্পষ্ট অসন্তোষ।
—তাছাড়া আপনার ওষুধে লোকের কত উপকার হচ্ছে। এত বড় একটা জিনিস আমার পরেই শেষ হয়ে যাবে? আমি কি এই নিয়ে এখানে চিরদিন আটকে থাকব?
—হুঁঃ! এবারের হুঁ-টা তেমন জোরালো নয়।
প্রবোধচন্দ্র বাইরে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে।
—ও-মা, তুমি এসে গেছ! একটা গামছা টেনে নিতে গিয়ে দরজার কাছে এসে ভৈরবী-মা তাকে দেখেছেন। তাঁর মুখে চাপা হাসি। আরো একটু এগিয়ে এসে খাটো গলায় বললেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের ভিতরের কথা শুনছিলে বুঝি?
প্রবোধচন্দ্র মাথা নাড়ল। শুনছিল।
—ঠিক আছে, ভিতরে এসো। এবারে সহজ স্বাভাবিক গলা।—বাবাকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ চাও।...বাবা রাগ করে পা ছুঁড়লে সেটাও কিন্তু আশীর্বাদ ভেবো। এসো—
ভিতরে ঢুকল। বাবার পরনে এখন কৌপিনটুকুও নেই। সম্পূর্ণ নগ্ন। ঘরের দিকে চেয়ে মনে হলো এক্ষুণি তাঁর আহার শেষ হলো। মায়ের হাত থেকে গামছা নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু ওটা না দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে মা যত্ন করে তাঁর মুখ মুছিয়ে দিলেন। পিছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দু'পা ছড়িয়ে চাটাইয়ের ওপর আধশোয়া হলেন তিনি।
প্রবোধচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে তাঁর পায়ে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল। বাবার এখনো রুষ্ট মুখই, কিন্তু মায়ের ওই-রকম বলার দরুনই বোধহয় পা

ছুঁড়লেন না। প্রণাম সেরে উঠতে বললেন, যা শালা, খুব বেঁচে গেলি।

বাইরে দাওয়ায় বসে তার আহার সমাধা হলো। সামনে মা বসে। আহারের আয়োজন যৎসামান্য। মোটা চালের ভাত, কড়াইয়ের ডাল, আর একটু তরকারি। প্রবোধচন্দ্রের ধারণা ছিল, ভৈরব-ভৈরবীদের কারণ আর মাংস ভিন্ন আর কিছু রোচে না। কিন্তু এই খেয়ে তার মনে হলো তৃপ্তিভরে এমন পরমামৃত কোনো কালে খায়নি।

মা বললেন, তোমার দু'বেলার খাওয়ার ব্যবস্থা এখন থেকে এখানেই হবে— আর অসুবিধে না হলে রাতে এই দাওয়াতেই শুয়ে থাকতে পারো—সঙ্গে রাতে শোবার ব্যবস্থা আছে?

মুখের দিকে চেয়ে প্রবোধচন্দ্র অল্প হেসে নিঃসংকোচে জবাব দিল, আমার শোবার ব্যবস্থার দরকার হয় না—মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই পেলেই হলো। ···বাবার মেজাজ যেমনই দেখি না কেন, আমি ঠিক জানতাম আপনার আশ্রয় পেয়েই গেছি।

মায়ের জবাবে একটা ইংরেজী শব্দও বেরুলো।—অত সিওর হয়ে কাজ নেই, কয়েকটা দিন আগে দেখি তোমাকে।

প্রবোধচন্দ্রর সব থেকে আশ্চর্য লাগে ভৈরবী মায়ের পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে। রাতে দু'আড়াই ঘণ্টার বেশি ঘুমোন না। ভৈরব-বাবার সেবা তাঁর সব থেকে বড় কর্তব্য। কিন্তু বাবার সেবার চাহিদা এত কম যে মা-কে সে-জন্য বেশি সময় দিতে হয় না। সকাল থেকে রাতের বেশিরভাগ সময় কাটে ওষুধ সংগ্রহ আর ওষুধ তৈরির কাজে। বনে জঙ্গলে আর নানা জায়গায় ঘুরে শেকড় বাকড় অনুপানাদি আর দ্রব্য আনার জন্য তিন চার-জন লোক আছে। মা প্রত্যেকটা জিনিস যাচাই করে দেখে নেন। সন্দেহ হলে ভৈরব-বাবাকে দেখিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হন। প্রবোধচন্দ্রকে এক-একটা জিনিস বার বার দেখিয়ে নাম-গুণ ইত্যাদি মনে রাখতে বলেন। এক-একটা জিনিস কত রকমের ব্যাধিতে লাগে লিখে রাখতে বলেন। ওষুধ সালশা বা চূর্ণ ইত্যাদি বানাবার সঙ্গে তাঁর শিক্ষা দেওয়া চলতে থাকে।

দিন তিনেক বাদে রামপুরহাটের মোহিনী ভট্টচায্ এলেন। ভৈরব বাবার

ঘরে এক মা ছাড়া তাঁরই কেবল অবাধ যাতায়াত। ঘণ্টাখানেক বাদে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রবোধচন্দ্রের সামনে দাওয়ায় বসলেন। সস্নেহে তিনি বললেন, মায়ের আশ্রয় পেয়েছ তোমার বড় ভাগ্য বাবা···জেনে রেখো ভৈরব-বাবার সমস্ত শক্তির আধার এখন মা···মা তোমার প্রশংসা করলেন।

প্রবোধচন্দ্র হেসে বলল, আর বাবা?

—বাবার কথা ছেড়ে দাও, তিনি স্বয়ং রুদ্র, কিন্তু অন্তরে সদা প্রসন্ন।

এই মানুষটিকেও প্রবোধচন্দ্রের বড় ভালো লাগল।···ইনিই নাকি একদিন স্বেচ্ছাচারী ভোগী অত্যাচারী মানুষ ছিলেন। বাবার মহিমা প্রবোধচন্দ্র মনে মনে স্বীকার করে বইকি। কিন্তু বাবার মনোভাব বাইরে অন্তত তার প্রতি একটুও প্রসন্ন নয়। এখনো বেশিরভাগ রাতই শ্মশানে কাটান।. আসতে যেতে বলেন, শালা কোথা থেকে এসে জুটেছে!

মা বেরিয়ে এসে ভট্‌চায্‌মশাইয়ের হাতে একটা লম্বা লিস্ট ধরিয়ে দিলেন। প্রবোধচন্দ্র দেখলেন সাদা কাগজে মুক্তোর মতো হাতের লেখা। এ-গুলোও ওষুধেরই নানা উপকরণ। বললেন, রামপুরহাটে সব-কিছু পাবেন না বাবা—আপনাকে কলকাতায় লোক পাঠাতে হবে।

—আজই পাঠাবো···মায়ের যখন দরকার, সবই এসে যাবে।

ভৈরবী মায়ের উদ্দেশে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করে ভট্‌চায্‌মশাই বললেন, মঙ্গলবার ঠিক সময়ে ওদের নিয়ে এসে যাব মা। মা মাথা নাড়তে তিনি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। পুলিশের জিপ গাড়ি।

মঙ্গলবারে আসবেন কারণ সেদিন ওষুধ দেবার আর নেবার দিন।

অদ্ভুত ভালো লাগছে প্রবোধচন্দ্রের। বুকের তলায় এমন শান্তি আর যেন অনুভব করেনি। কাজ না থাকলে নিজের মনেই এদিক-ওদিক বেড়ায়। এমন শান্ত নীরবতারও একটা বিশেষ রূপ আছে। পথের দু'দিকে বড় বড় গাছ। অর্জুন-অশ্বত্থ-পাকুড়-কাঁঠাল-তেঁতুলগাছগুলোও যেন পরম আত্মীয়ের মতো তাকে গ্রহণ করেছে।

···আবার মঙ্গলবারের সেই ওষুধ দেবার দিন। বেশ ভোরেই মোহিনী

ভট্‌চায্‌ জিপে তাঁর লোকজন নিয়ে এসে গেলেন। ও-দিকে লাইনে লোক দাঁড়ানো আরও আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে। আরো আধ-ঘণ্টার মধ্যে স্নান সেরে মা তাঁর উঁচু দাওয়ার সামনে বসলেন। তাঁর নির্দেশে প্রবোধ-চন্দ্রও স্নান সেরে প্রস্তুত। অন্য লোকের বদলে এবারে ওষুধের ডালাগুলোর সামনে তার আসন। সে-ই ডালা এগিয়ে দেবে। কে কি রোগ বা কার কি অসুবিধের কথা বলে মা তা ও মন দিয়ে শুনতে বলেছেন।

মোহিনী ভট্‌চায্‌ ছোট কাঠের গেটের দড়ি খুলে দিতে ওষুধ প্রার্থীরা একে একে আসতে লাগল। একসঙ্গে দু'জনের আসার রীতি নেই। তবে কেউ অশক্ত বা অথর্ব হলে তার সঙ্গের চলনদার রোগী নিয়ে আসতে পারে। প্রবোধচন্দ্র রোগীর নিবেদন শোনার থেকে মায়ের মুখই বেশি লক্ষ্য করছে। মনে হলো, মা-ও নিবেদন শোনার থেকে স্থির চোখে দেখে নিয়ে রোগীর হাল বেশি বুঝতে পারছেন।

আজও বিকেল পর্যন্ত এই পর্ব চলল। এইদিন মা আর মোহিনী ভট্‌চায্‌ ছাড়া আর একজন সারাক্ষণের মধ্যে জায়গা ছেড়ে নড়ল না বা উঠল না। সে প্রবোধচন্দ্র। মা-ও তাকে একবারের জন্য উঠতে বললেন না, এটুকুও যেন তাঁর করুণাই মনে হলো। এই দিনে বাবার খাওয়া-দাওয়া বা সেবার ব্যবস্থা কি হয় প্রবোধচন্দ্র জানে না।

অবশ্য পরে জেনেছে। বাবা এমনিতেই সপ্তাহে দু'দিন বা বড় জোর তিন দিনের বেশি মুখে অন্ন তোলেন না। এক মঙ্গলবারের ছাড়া রান্না রোজই হয় বটে। কিন্তু বেশির ভাগ দিন তিনি হাত দিয়ে অন্ন-ব্যঞ্জন স্পর্শ করে দেন শুধু। যে-দিন ইচ্ছে হয় দুই এক গরাস মুখে তোলেন। রাতের আহার বহুকাল ধরেই ত্যাগ। মঙ্গলবারে মা-কে রান্নার কোনো আয়োজনই করতে হয় না।

এখানে প্রবোধচন্দ্রের রাতের খাওয়া কোনোদিন দু'খানা রুটি একটু গুড় আর দুধ। কোনোদিন বা ফল আর দুধ। মোহিনী ভট্‌চাযের ব্যবস্থায় দুধ একজন রোজই দিয়ে যায়। এ-ছাড়া ভক্তদের কাছ থেকে যে-দিন যেরকম জোটে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় ভৈরবী-মা তাকে বললেন, কাল শনিবার রাতে তোর দীক্ষা হবে।

মা খুব সহজে তাকে আরো আপনার করে নিয়েছেন। তুমি ছেড়ে তুই করে বলেন। দীক্ষা হবে শুনে প্রবোধচন্দ্রের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত।

—রাতে কখন দীক্ষা দেবেন মা ?

—বাবা থাকতে আমি দীক্ষা দিতে যাব কেন! তিনিই দেবেন—

প্রবোধচন্দ্র স্তব্ধ একটু। কথা ক'টা যেন শিরশির করে কানের ভিতর দিয়ে দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

—আমাকে কি করতে হবে ?

—ছ'হাত তুলে নাচতে হবে। মা হেসে ফেললেন, কি আবার করতে হবে, স্নান সেরে লাল চেলি পরে তাঁর কাছে গিয়ে সামনে বসতে হবে।

—লাল চেলি কই ?

—ভট্‌চায্‌ মশাইকে দিয়ে আনিয়ে রেখেছি।

রাত আর পরের দিনটা অধীর প্রতীক্ষায় কাটল। রাত বারোটাও এগিয়ে এলো একসময়। স্নান সেরে রক্তাম্বর পরে প্রস্তুত হতে মা তাকে বাবার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ভৈরব-বাবা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আধ-শোয়ার মতো কম্বলের ওপর বসে। সম্পূর্ণ নগ্ন। এই রাতের আঁধারে তাঁর মুখখানা আদৌ তুষ্ট মনে হলো না প্রবোধচন্দ্রের। চাউনি দেখে মনে হলো যেন আক্কেল দেবার অপেক্ষায় আছেন।

প্রবোধচন্দ্র তাঁর সামনে পাতা আসনে বসল। ভৈরব-বাবা সোজা হলেন। তার দিকে স্থির চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। প্রবোধচন্দ্রের সর্বাঙ্গে অদ্ভুত শিহরন। মনে হলো ওই চোখের ভিতর থেকে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো একটু কিছুর ধাক্কায় এ-রকম হচ্ছে।

চিমটেটা তুলে নিয়ে ভৈরব-বাবা তার ছ'কাঁধে একটু জোরেই ছ'টো ঘা বসিয়ে দিলেন। তারপর আবার চোখের দিকে তেমনি খানিক চেয়ে থেকে জলদ গম্ভীর গলায় হাঁক দিলের, কালীকিংকর।

কিছু না বুঝে প্রবোধচন্দ্র এ-দিক ও-দিক তাকালো। ভৈরবী-মা বললেন, আগের নাম ভুলে যাও—এখন থেকে বাবার দেওয়া কালীকিংকর নামেই তোমার পরিচয়। বলতে বলতে একটা ধ্যাবড়া কৌটো খুলে বাবার সামনে ধরলেন। ওতে রক্তবর্ণ সিঁদুর।

বুড়ো আঙুলটা সেই সিঁদুরে ডুবিয়ে ভৈরব-বাবা নাকের ওপর থেকে কপালের শেষ পর্যন্ত সোজা একটা সিঁদুরের দাগ তুলে দিলেন।—যা শালা, এবার লুটে পুটে খাগে যা!

ভৈরবী-মা বললেন, বাবাকে প্রণাম করে উঠে এসো।

সে উপুড় হয়ে বাবার ছড়ানো দু'পায়ে কপাল মাথা ঘষে মায়ের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলো।

মা জিগ্যেস করলেন, বাবা কি আশীর্বাদ করলেন বুঝতে পারছ?

মাথা নাড়ল, বুঝতে পারেনি।

মা বুঝিয়ে দিলেন।—জগৎ আনন্দময়। নিরানন্দের মধ্যেও আনন্দ ছড়িয়ে আছে। তুমি সেই আনন্দ লুটে নাও।

মায়ের দিকে চেয়ে আছে। চোখের পাতা পড়ছে না। আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসল। মায়ের দু'পায়ে মাথা রাখল। দু'হাতে পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে মাথা রেখে পড়ে থাকল।

···জীবনে কি কখনো কেঁদেছে? মনে পড়ে না। তার চোখের জলে মায়ের দু'পা ভেসে যাচ্ছে। কেঁদে এত আনন্দ তা-ও কি কখনো কেউ অনুভব করেছে?

—কালীকিংকর ওঠে···।

প্রবোধচন্দ্রের অস্তিত্ব ঘুচে গেছে। সেই খোলসেই যাঁর আবির্ভাব তিনি অন্য একজন। তিনি কালীকিংকর। কালীকিংকর অবধূত।

এই নতুন জীবনে মায়ের বাধা অনেক সময় আশ্চর্য রকমের স্পষ্ট এবং গম্ভীর। অমান্য করার জো নেই। যেমন অবধূতের সংকল্প, চুল দাড়ি রাখবেন, আর কাটবেন না, কামাবেন না। মায়ের স্পষ্ট আদেশ, চুল

দাড়ি রাখতে হবে না। ওসব কেটে আগের থেকেও পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

মোহিনী ভট্চায্ একদিন দরজি এনে কালীকিংকরের মাপ নিতে এলো। ভৈরবী-মা সামনে বসে। অবধূত বুঝলেন, তাঁর নির্দেশেই দরজি আনা হয়েছে। মাপ নেওয়া হতে দু'জোড়া কাপড়ের কথাও মা বলে দিলেন। সেই জামা, কাপড় আসতে কালীকিংকর অবাক। তার ধারণা রক্তাম্বর ধুতি আর জামা আসছে। তার বদলে বেশ মিহি জমিনের ধুতি আর ভালো কাপড়ের পাঞ্জাবি? মা-কে বলেই ফেলল, এ-সব আর পরব কেন?

মা-ও অবাক একটু।—তাহলে কি পরবি?

—আমার তো রক্তাম্বর পরার কথা।

—এমন কথা কে বলেছে?

কালীকিংকর চুপ। কেউ বলেনি। নিজেই ভেবেছিলেন।

মা ফতোয়া দিলেন, রক্তাম্বর ধুতি চাদর এক-প্রস্থ থাকলেই হবে, কাজে কর্মে পরবি—সব-সময় পরবার দরকার নেই।

এ-ব্যবস্থা কালীকিংকরের খুব মনঃপূত হয়নি। ভৈরবী-মা যেন অনেকটা গৃহস্থ বাড়ির ছেলের মতোই রাখতে চান। কিন্তু তাঁর নির্দেশ অমান্য করা চলে না।

মানুষের আদি-ব্যাধি নিরাময় করার বিদ্যে মা তাঁকে যত যত্ন করে শেখান, অন্যান্য বিষয়ে সাধন দেবার ব্যাপারে তাঁর অত আগ্রহ নেই। তন্ত্র সাধনার অনেক নিগূঢ় ক্রিয়া-কলাপ জপ-তপ আছে কালীকিংকর জানেন। কিন্তু তিন-মাস যাবৎ ভৈরবী-মা কেবল তাঁকে মনঃসংযোগ আর দৃষ্টি-সঞ্চালনের বিদ্যেয় রপ্ত করে তুলছেন। বলেন, মানুষের সেবা করতে হলে এ দুটোই সব থেকে বেশি দরকার। মনের স্থির সংযোগ হলে নিজের অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যায়। আর দৃষ্টি সঞ্চালন আয়ত্তে এলে মানুষের ভিতরের অদেখা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পর্যন্ত ঘুরে আসা যায়। ভৈরবী-মায়ের হাব-ভাব আর শিক্ষা দেখে কালীকিংকরের মনে হয়, নিজের মনঃসংযোগ এবং মানুষের আধি-ব্যাধির সেবা, আর মুখ দেখে লক্ষণ জানা বা চেনাই তাঁর কাছে

তন্ত্রসার।

মাস আড়াই তিনের মাথায় এক সকালে এখানকার বাঁধা-ধরা ছকে বেশ একটু বৈচিত্র্যের রঙ ধরতে দেখলেন কালীকিংকর। তিনি দাওয়ার সিঁড়িতে বসে দুটো লোকের আনা শিকড়-বাকড় লতা-পাতা দেখছিলেন। ভৈরবী মা সেগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে তাঁর পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। কোন্‌টা কি, কোন্‌ কাজে লাগে ইত্যাদি। লোক দুটো নতুন সাধুকে মায়ের এই জেরার মুখে পড়তে দেখে মজা পাচ্ছিল।

দশ হাতের মধ্যে একটা জিপ এসে দাঁড়ালো। মোহিনী ভট্‌চাযের চেনা জিপ। এই জিপে মেয়েছেলে আসতে দেখেও দু'চোখ অনভ্যস্ত নয় কালীকিংকরের। ভট্‌চায্‌মশায়ের আর তাঁর ভাইয়ের স্ত্রীরা মাঝে মাঝে আসেন। কিন্তু এই সকালে জিপ থেকে নামল যে মেয়েটি তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে না, চোখের ওপর এমন শাসন-ক্ষমতা কারো আছে কিনা কালীকিংকর জানেন না। তাঁর অন্তত নেই।

বছর ষোল সতেরোর মধ্যে হবে বয়েস। বেশ লম্বা। সুডোল স্বাস্থ্য। দুধে আলতা গায়ের রং। আয়ত টানা চোখ। টিকলো নাক। সকালে স্নান করে এসেছে, আধা-কোঁকড়া চুল পিঠের ওপর ছড়ানো—সেই চুলের গোছা কোমর ছাড়িয়ে হাঁটুর দিকে নেমেছে।

জিপ থেকে নেমে হাসি-হাসি মুখে অতি পরিচিতের মতো দাওয়ার দিকে এগুলো। ভ্যাবাচাকা খেয়ে কালীকিংকর দাওয়ার সিঁড়িতে বসেই ছিলেন, শশব্যস্তে উঠে সিঁড়ি ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। এগিয়ে আসতে আসতে মেয়েটি তাঁর মুখখানা একদফা দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করে নিল। দাওয়ায় উঠতে কালীকিংকরও ঘুরে তাকালেন। ভৈরবী-মায়ের আর লোক দুটোরও হাসি-হাসি মুখ।

দু'হাত কোমরে তুলে মেয়েটি ভ্রূভঙ্গি করে দাওয়ার শিকড়-বাকড় লতা পাতাগুলো দেখল। তারপর ভৈরবী-মায়ের দিকে চেয়ে বলল, তোমাদের জ্বালায় এ জায়গা থেকে ডাক্তার বদ্যিরা সব পালাবে দেখছি—

ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর ঘরের বাসিন্দা অর্থাৎ

কংকালমালী ভৈরবের উদ্দেশে একটু গলা চড়িয়ে যা বলল, শুনে কালী-কিংকরের কান খাড়া, শিরদাঁড়া সোজা।

—কই গো শিবঠাকুর, ঠিক-ঠাক মতো আছ? ভিতরে ঢুকব?

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ভৈরবের দরাজ গলার শব্দ, আমি ঠিক-ঠাক মতোই আছি, তোর অসুবিধে হলে একটু দাঁড়া, আমি বাঘ-ছালটা কোমরে জড়িয়ে নিই।

—জড়াও বাপু, আমার ক্ষমতা থাকলে তোমাদের হিমালয়ের মাথায় বসিয়ে রাখতাম, লোকালয়ে আসতে দিতাম না।

ঘরে হা-হা হাসির শব্দ।

কালীকিংকর দেখছেন, ভৈরবী-মায়ের ঠোঁটে হাসির আভাস। আর লোক দুটোর মুখে হাসি ধরে না।

ঘরের ভিতর থেকে ভৈরব বাবার হাঁক শোনা গেল, আ যা মেরে চৌদরী কা! চাঁদ-- দু'চোখ ভরে দেখি তোকে—

মেয়েটি হাসি মুখে ভিতরে চলে গেল। একটা থলে হাতে মোহিনী ভট্চায্ দাওয়ায় উঠে এসেছেন। কালীকিংকরকে বললেন, জিপে দইয়ের হাঁড়ি আর মিষ্টির হাঁড়ি আছে, নামিয়ে আনো তো বাবা—এই থলেতে মাংস আছে মা-বাবার কাছেই নিয়ে যাই?

ভৈরবী-মা জিগ্যেস করলেন, এত-সব কেন?

—কল্যাণী মায়ের হুকুম, বলল, শিবঠাকুরকে আজ এ-সব ঘুষ দিতে হবে।

তাঁরা দু'জনে হাসি মুখে দরজার দিকে এগোলেন। কালীকিংকর এ-টুকু শুধু বুঝলেন মেয়েটির নাম কল্যাণী। চটপট দই আর মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে এলেন। ভিতরে না ঢুকে ও-দুটো হাতে করে তিনি দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ভিতরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

জানু-আসনে বসে কল্যাণী ভৈরব বাবার পায়ে উপুড় হয়ে কপাল ঠেকিয়ে পড়েই আছে। কংকালমালীর গোঁপ-দাড়ি বোঝাই মুখে খুশি উপছে উঠছে। তিনি তার পিঠে হাত বোলাচ্ছেন। ওই মেয়ের পা ছেড়ে ওঠার নাম নেই, যেন মনের সুখে আদর খাচ্ছে।

দাবড়ানির সুরে ভৈরব বাবা বলে উঠলেন, ওঠ্ ওঠ্—খুব হয়েছে—আড়াই মাস না দেখে দু'চোখ অন্ধ হতে বসেছে—আর শালী এতদিন বাদে এসে খুব ভক্তি দেখাচ্ছে।

পা থেকে মাথা না তুলেই ঝাঁঝের গলায় মেয়ে জবাব দিল, তোমার ভৈরবীর হুকুম শুনে মুখ বুজে ছিলে কেন ?···পরীক্ষার আগে আর আসতে হবে না আদেশ শুনেও তো ভেজা বেড়ালখানার মতো মুখ করে বসে-ছিলে।

—আচ্ছা, আমারই দোষ, ওঠ্।

উঠল। তাঁর মুখোমুখি মাটিতেই বসল। ভৈরবী-মা আর মোহিনী ভট্‌চাযের হৃষ্ট মুখ।

ভৈরব-বাবার দু'চোখ তার মুখ থেকে কোমর পর্যন্ত ওঠা-নামা করল এক-বার।—তা পরীক্ষা দিয়ে দিগ্‌গজ হয়ে এলি ?

—হলাম কি হলাম না তুমি জানো। পাশ করলে আমার ক্রেডিট্ ফেল করলে তোমার দোষ।

—কেন, ফেল করলে আমার দোষ কেন ?

ফেল করলে লোককে বলব, তোমাদের ভৈরব-বাবা আমার মন কেড়ে নিয়ে বসেছিল, পড়াশুনায় মন দিতে পারি নি। শিবঠাকুরকে না দেখে পার্বতী কি তার বাপের বাড়িতে খুব সুখে ছিল, তাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হলে মজা টের পেত !

ভৈরব বাবার অট্টহাসি।—তোকে ফেল করায় কোন্ শালার বাপের সাধ্যি ! তুই সবেতে পাশ করেই বসে আছিস।

কালীকিংকর স্থান কাল ভুলে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ দিয়ে দেখবেন না কান দিয়ে শুনবেন ! চোখ-কান দুই-ই এমন আড়াআড়ি কাড়াকাড়ি করেও ভরাট হয় !

ভৈরব-বাবার চোখ হঠাৎই দরজার দিকে। ঝুঁকে চিমটেটা তুলে নিয়ে ছোঁড়ার ভঙ্গিতে মাথার ওপর তুলে হুংকার ছাড়লেন, এই ও শালা ! ওখানে দাঁড়িয়ে তুই হাঁ করে আমার পার্বতীর [illegible]

তোর ! এ-দিকে চোখ দিলে তোকে আমি বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব না ! ভাগো হিঁয়াসে !

দৈয়ের হাঁড়ি আর মিষ্টির হাঁড়ি মাটিতে নামিয়ে রেখে কালীকিংকর উঠে দাঁড়ালেন। এই মেয়ের সামনে এ-রকম ধমক খেয়ে তার জিভেও কোন্ সরস্বতী ভর করল কে জানে। হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন, বাপের নাম আমি এঁকে দেখার অনেক আগেই ভুলেছি বাবা—

দাওয়ার মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে চেয়ে শিকড়-বাকড় যোগাড়ের লোক দুটো হাসছে। ভিতরের কথা-বার্তা স্পষ্ট শোনা যায়।

ভৈরব বাবার হুংকার শোনা গেল। তাঁর পার্বতীকেই শাসাচ্ছে।—শালা সেয়ানা কত দেখলি ? খবদ্দার ওর কথায় ভুলবি না—ও-শালা আমার বুক ঝাঁঝরা করে দেবার মতলবেই এখানে এসে জুটেছে !

রসালো জবাবও শোনা গেল। কল্যাণী বলছে, অত দুশ্চিন্তায় থেকে কাজ কি, তোমার কপালের আগুনে ভস্ম করেই ফ্যালো না !

লোক দুটো শব্দ না করে হাসছে। ওদের একজনের নাম হারু। কালী-কিংকরের সঙ্গে তারই বেশি ভাব। সে-ও অনেক গাছ-গাছড়া শেকড়-বাকড় চেনায় তাঁকে। ইশারায় তাঁকে ডেকে দাওয়া থেকে নামলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, এতদিনের মধ্যে দেখিনি, এই মেয়েটি কে ?

হারু জানালো, এই দিদিমণির সঠিক পরিচয় সে জানে না। তবে এ-টুকু জানে, ভট্চায্‌মশাইয়ের কোনো আত্মীয়ের মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই বাপ-মা হারা। ভট্চায্‌মশাই তাকে নিজের ছেলে-মেয়ের থেকেও বেশি স্নেহে মানুষ করছেন। তার কারণ, ভৈরব-বাবা এই মেয়েকে দারুণ স্নেহ করেন। দশ বছর বয়সে বাবা তাকে নিজের কোলে বসিয়ে দীক্ষা দিয়েছেন। তাদের ধারণা, এই মেয়ে অশেষ শক্তির আধার। কালে দিনে বাবার আশীর্বাদে ভৈরবী-মায়ের থেকেও অনেক বেশি শক্তির অধিকারিণী হবে।

সময়টা যেন একটা বিভ্রমের মধ্যে কাটতে লাগল কালীকিংকরের। না,

কল্যাণী নামে ওই মেয়ে দুপুরের খাওয়ার আগে একবারও ঘর থেকে বেরোয়নি। অথচ, কালীকিংকর যেন সারাক্ষণ তার মুখ দেখছেন, হাসি দেখছেন আর কথা শুনছেন।

দুপুরে দাওয়ায় খাওয়ার তিনখানা আসন পাতা হলো। একখানা কালীকিংকরের। মুখোমুখি দুটো কল্যাণী আর মোহিনী ভট্চাযের। এত খাবার এসেছে, তাঁরাও প্রসাদ পেয়ে যাবেন বোঝা গেল।

খেতে বসে আরো যেন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলেন কালীকিংকর। ওই মেয়ে মাঝে মাঝে সোজা তাকিয়ে তাকে দেখছে। সামনে ভৈরবী-মা, পাশে ভট্চায্ মশাই, কিন্তু এ-জন্যে যেন কোনো দ্বিধার কারণ নেই। খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাচ্ছে। নিঃসংকোচে দেখে নিয়ে আবার খাচ্ছে।

কল্যাণী একবার মুখ তুলে ভৈরবী-মায়ের দিকে তাকালো। ভৈরবী-মাকে সামনা-সামনি সকলেই মা বলে। গম্ভীর মুখে মন্তব্য করল, মা, তোমার এই শিষ্যের কিস্সু হবে না, এখনো টনটনে জ্ঞান।

হাসি চেপে ভৈরবী-মা জিগ্যেস করলেন, কি টনটনে জ্ঞান?

জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে কল্যাণী আবার বলল, বাবার সেই শুকদেব ব্যাসদেব আর অপ্সরাদের গল্পটা ওঁকে শুনিয়ে সেই মতো তালিম দাও।

হাব-ভাব আর কথা শুনলে কে বলবে এই মেয়ে সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। বয়েস ষোল সাড়ে ষোলর বেশি হবে না। কালীকিংকর আড়-চোখে লক্ষ্য করলেন, ভৈরবী-মা গালে হাত দিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা কর-ছেন। আর, হাসি চাপার চেষ্টায় মোহিনী ভট্চাযের খাওয়ার দিকে আরো বেশি মনোযোগ। গোঁ-য়ের দিক থেকে বিচার করলে কালীকিংকরকে কেউ সাদা-মাটা মানুষ বলবে না। এই বয়সের একটা মেয়ের—তা সে যত রূপসীই হোক—তির্যক উপহাসের পাত্র হয়ে মাথা গোঁজ করে বসে খেয়ে যাবার পাত্র নয়। মুখ তুলে সোজা তাকালেন।

—মায়ের এই শিষ্য বলতে কে—আমি?

—আপনি ছাড়া মায়ের আর দ্বিতীয় শিষ্য নেই।

আপনি করে বলতে গিয়েও মুখে আটকালো কালীকিংকরের। বললেন, মায়ের শিক্ষার ত্রুটি তুমি বেশ ধরে ফেলেছ—আমার টনটনে জ্ঞান বিদ্ধ করার মতো মুনি-ঋষি-অপ্সরাদের গল্পটা বলে তুমিই আমাকে একটু এগোতে সাহায্য করো।

পিঠ টান করে মেয়ে সোজা হয়ে বসল একটু। দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকে থাকল কয়েক পলক। এই বয়সের মেয়ের এই দৃষ্টি সঞ্চালন বিদ্যেটা ভৈরব-বাবার কাছ থেকে পাওয়া কিনা কালীকিংকর জানেন না। কিন্তু এ-টুকুতেই যেন বেশ পর্যুদস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। সেটা অস্বীকার করার তাড়নায় সোজা চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইলেন।

মেয়ের বসার ভঙ্গি আবার শিথিল হলো একটু। আলতো সুরে বলল, গল্পটা এমন কিছু নয়, তবে আপনাদের মতো ভাবী যোগী-পুরুষদের শিক্ষার বিষয়।···ব্যাসদেব তাঁর ছেলে শুকদেবের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। দূর থেকে দেখলেন, রূপসী অপ্সরারা এক সরোবরে স্নান করছে। ছেলে তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। তারা ভ্রূক্ষেপও করল না। কিন্তু একটু বাদেই বৃদ্ধ বেদব্যাস সেখান দিয়ে যেতেই অপ্সরারা ত্রস্ত - যে যার বসন সামলাতে ব্যস্তসমস্ত। বেদব্যাস অবাক হয়ে তাদের জিগ্যেস করলেন, এই একটু আগে যৌবনে ঝলমল আমার যুবক ছেলে এখান দিয়ে চলে গেল, তোমরা এতটুকু চঞ্চল হলে না, ভ্রূক্ষেপ করলে না—অথচ আমার মতো বৃদ্ধকে দেখে তোমাদের এত লজ্জা—কি ব্যাপার?

···অপ্সরারা করজোড়ে নিবেদন করল, ভগবান শুকদেব তো শিশু, তাঁর নারী-পুরুষ জ্ঞান লোপ হয়ে গেছে···কিন্তু আপনার, এই জ্ঞানটুকু এখনো যে টনটনে প্রভু—তাই আমাদেরও লজ্জা।

কতটুকু আহত করা গেল নির্লিপ্ত চোখে একবার দেখে নিল। তারপর আহারে মন দিল। একটু ধমকের সুরে ভৈরবী-মা বললেন, বাবার আস্কারা পেয়ে তুই দিনে দিনে বড় বাচাল হয়ে যাচ্ছিস কল্যাণী। ওর কথায় কান না দিয়ে তুমি খাও তো বাবা—

শেষেরটুকু কালীকিংকরের উদ্দেশে।

বিকেলের দিকে মোহিনী ভট্চাষের সঙ্গে জিপে উঠে চলে গেল। আর কালী'কিংকরের মনে হলো তার চার দিকে সত্যিই শ্মশান। শোভা কিছু নেই। এ-রকম মনে হওয়া মাত্র কাল্পনিক কশাঘাতে নিজেকে সংযত করতে চাইলো। মনে মনে সন্ত্রস্ত একটু। পাছে ভৈরবী-মা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভেতর দেখে ফেলেন। আরো ভয়, ঘরে সেঁধিয়ে থাকলেও ভৈরব-বাবা সত্যিই যদি সর্বদ্রষ্টা হন, আর ওখানে বসেই তাঁর দিকে চোখ চালান, তাহলে রক্ষা নেই। বার বার নিজের পক্ষে জোরালো রায় দিলেন, তিনি দোষ কিছু করেননি, পাপ তাঁর মনের কোণেও উঁকিঝুঁকি দেয়নি।···ভালো লাগার মতো একটা মেয়ে এসেছিল। ভৈরবী-মায়ের ভালো লেগেছিল।···কংকালমালী মহাভৈরব-বাবারও খুব ভালো লেগেছিল। সেটা যেমন দোষের নয়, তাঁরও একটু ভালো লাগা কক্ষণো দোষের নয়।

পরের মঙ্গলবারে ওষুধ দেবার দিনে ভট্চায্-মশাই আর অন্য সকলের সঙ্গে কল্যাণীকেও জিপ থেকে নামতে দেখে কালীকিংকর নিজের মনের ওপর কড়া প্রহরী বসিয়ে দিলেন। দেখলেন ওই মনের গায়ে যেন এক ঝলক দক্ষিণের বাতাস লাগল। স্নায়ু টান করে কড়া হাতে তিনি ওই মনের চারদিকের জানালা দরজা বন্ধ করে দিতে চাইলেন।···সুন্দরী রমণী যুগে যুগে কত মহাতপার চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়েছে, ধ্যান ভঙ্গ করেছে। তাঁর সামনেও এ এক পরীক্ষা বৈ আর কিছু নয়। খুব সামান্য, সাধারণ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে বক্রোমুনির এই শ্মশানেই তাঁর গতি হোক। দেহের সঙ্গে সব কিছু ছাই হয়ে যাক।

রোগীদের প্রথম ক'ঘণ্টার ভিড়ের সময় এই মেয়েও সাহায্য করে গেল। তাঁর দু'হাতের মধ্যে একই কম্বলে বসে তাঁর সঙ্গে ওষুধের ডালা এগিয়ে দিতে লাগল। ফলে কালীকিংকরকে এই দিনে বার বার জায়গা ছেড়ে উঠতে হলো না। ওষুধ না পেলে যে লোকটি কলম দিয়ে লিখে রাখছে সে, আর ওষুধের তাগিদে যারা আসছে তাদেরও অনেকে এই মেয়েকে চেনে দেখা গেল। ভৈরবী-মায়ের পিছনে ওই মেয়েকে দেখে অনেক রোগীর

মুখে হাসি। ভৈরবী-মায়ের জয়ধ্বনির সঙ্গে তারা কেউ কেউ কল্যাণী-মায়েরও জয়ধ্বনি করছে। আর এ-দিকে এই মেয়ে মাঝে মাঝে চাপা গলায় বলছে, আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন, ওষুধ খেয়ে যমের টানাটানি বন্ধ করতে পারো কিনা দেখো।

বেলা একটা দেড়টার সময় অনেকের মতো সে-ও উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেল। তফাৎ, অন্যের বেলায় বদলি কেউ এসে দায়িত্ব নিয়েছে। কল্যাণীর বদলি কে আসবে। ঘণ্টা দেড় দুই বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বসল। একটু বাদে ভৈরবী-মায়ের হাতে একটা ডালা এগিয়ে দেবার ফাঁকে চাপা গলায় জিগ্যেস করল, কি হলো, যতক্ষণ এই উৎসব চলবে তোমার এই শিষ্যেরও নিরম্বু উপোস নাকি!

কল্যাণীর হাত থেকে এবার ওষুধের ডালা নিয়ে ভৈরবী-মা একবার কালী-কিংকরের দিকে তাকালেন। তারপর নিজের কাজে মন দিলেন।

বিকেলের শেষ রোগী বিদেয় করে ভট্‌চায্‌মশাই গেটে দড়ি বেঁধে দিলেন। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। তিনি স্পষ্টই শ্রান্ত। শ্রান্তির লেশমাত্র নেই ভৈরবী-মায়ের মুখে। কালীকিংকরের ধারণা তাঁর নিজের মুখেও নেই।

সকলেই দাওয়ায় দাঁড়িয়ে এখন। মোহিনী ভট্‌চায্‌ এগিয়ে আসতে কল্যাণী শূন্যে ঝাপটা মেরে বসল একটা।—মাঝে খাওয়া-দাওয়া আর একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা না থাকলে পরের মঙ্গলবার থেকে মেসোমশাইকে আর আমি এখানে আসতে দিচ্ছি না।

ভৈরবী-মা জবাব দিলেন, খেতে না চাইলে আমি কি করব?

—তুমি হুকুম করে দেখেছ—এখানে তোমার হুকুম অমান্য করার কারো সাধ্যি আছে?

মা হেসে জবাব দিলেন, আর কারো না থাক, ভৈরব-বাবার জোরে সেটুকু তোর আছে।

ধমকের সুরে মোহিনী ভট্‌চায্‌ বললেন, এই মেয়ে, আমার হয়ে তোকে উমেদারি করতে বলেছি? এই একটা দিন আমার কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরই পাই না।

—পুণ্যির হাওয়ায় ভেসে কেটে যায়।···আর এই যোগী ব্রহ্মচারীও ভৈরব-বাবার কাছ থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণী মন্ত্র নিয়েছেন নাকি—পুণ্যির তোড়ে মুখ শুকিয়ে যে আমসি একেবারে!
ভৈরবী-মায়ের মুখে সস্নেহ হাসি।—সবার পিছনে লাগিস কেন, তোর খাওয়া হয়েছে না হয়নি?
—আমার খাওয়া হবে না কোন্ দুঃখে, শিবঠাকুরের ঘরে ঢুকে দুধ কলা আম সন্দেশ চেটেপুটে খেয়েছি, তারপর শিবঠাকুরের গলা জড়িয়ে ধরে এক ঘণ্টা ফিসফিস গুজগুজ করে বিশ্রাম নিয়ে আবার এসেছি।
—এই শালী, মিথ্যেবাদী। ঘরের ভিতর থেকে ভৈরব-বাবার হুংকার।—তুই একবারও আমার গলা জড়িয়ে ধরিসনি!
কল্যাণী হাসি মুখে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।—ধরিনি! এইরকম মহাভৈরব তুমি! হাত দিয়ে গলা জড়ানো বুঝতে পারো, আর সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে গলা জড়ানো বুঝতে পারো না?
ঘরে কংকালমালীর অট্টহাসি।
স্থান-কাল ভুলে এই মেয়েকেই দেখছেন কালীকিংকর। ষোল সতেরো বছরের মেয়ের ভিতরে ঐশ্বর্যের যেন শেষ নেই। এর সবটুকুই কি কংকাল-মালী ভৈরবের কৃপা—তাঁর বিভূতি?
মোহিনী ভট্‌চায্‌ প্রতি মঙ্গলবার ছাড়াও সপ্তাহে মাঝে একদিন করে আসেন। ভৈরবী-মা অথবা ভৈরব-বাবার প্রয়োজন বুঝে নিতেই আসা। কিন্তু এই দিনেও এখন আর তিনি একলা আসেন না। সঙ্গে কল্যাণী থাকেই। আর এই দিনে তাদের সঙ্গে ভালো মাছ বা মাংসও আসেই। অন্য খাবার দাবারও থাকে। কল্যাণী এখানে সমস্ত দিন থাকে আর খেয়ে যায় বলেই নয়। আগেও সপ্তাহের এই ফাঁকা দিনে ভট্‌চায্‌মশাইয়ের সঙ্গে কিছু না কিছু খাবার আসত। কিন্তু ইদানীং আরো বেশি আসছে। ভৈরবী-মা বলেন, এত কেন!
ভট্‌চায্‌ মশাই ওই মেয়েকে দেখিয়ে দেন।—এত না হলে ওর মন ওঠে না।

মাঝের এই দিনে এসে কল্যাণী বেশিরভাগ সময় ভৈরব-বাবার ঘরেই কাটায়। আবার এক-একবার দাওয়ায় এসে ভৈরবী-মায়ের পাশে বসে তাঁকে একটু আধটু সাহায্য করে। ওষুধের জিনিস-পত্র হাতে হাতে গোছ-গাছ করে দেয়। মা-কে কিছু বলতে হয় না—এ-কাজে যেন অনেকদিন ধরেই অভ্যস্ত।

ভৈরবী-মায়ের শিষ্যকে যাচাইও করে একটু আধটু। নতুন কোনো শিকড় লতা বা ধাতুগুণের জিনিস দেখলে সেটা তুলে ধরে জিগ্যেস করে, এটা কি বলুন তো?

জানা থাকলে কালীকিংকর জবাব দেন।

—কি কি কাজে লাগে?

কি জিনিস চেনা থাকলে এই জবাবও জানাই থাকে।

ভেরি গুড।

জানা না থাকলে কালীকিংকর চুপচাপ মায়ের দিকে তাকান। মা বলেন, কি জিনিস আর কি কাজে লাগে এবার ওকে জিগ্যেস করো।

মেয়ে কোনোদিন হেসে ফেলে। কোনোদিন বা আত্মরক্ষার পথ দেখে। আমি বলতে যাব কেন, আমি কি তোমার কাছে এ-সবের পাঠ নিচ্ছি! চটপট উঠে বাবার ঘরে চলে যায়।

খেতে বসেও এক-একদিন কম মজা করে না। কল্যাণী আর মোহিনী ভট্‌চাযের আসন পাশাপাশি। মুখোমুখি আসনটা কালীকিংকরের। ভৈরবী-মা পরিবেশন করেন।

খেতে খেতে সেদিন হাত গুটিয়ে কল্যাণী কালীকিংকরের পাতের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বলল, তপস্বী আর তপস্বিনীদের শুনেছিলাম সকলের ওপর সম-দৃষ্টি।

মেসোমশাইয়ের অর্থাৎ মোহিনী ভট্‌চাযের স্বাভাবিক প্রশ্ন।—কেন, কি হলো?

একটা আঙুল তুলে কালীকিংকরের পাত দেখিয়ে দিল।—ভালো ভালো মাংসের পীসগুলো সব ওই পাতে—তুমি আমি হাড় চিবুচ্ছি।

ভট্‌চায্‌মশাই হেসে উঠলেন। কালীকিংকরের খাওয়া আপনি থেমে গেল। বকুনির সুরে ভৈরবী-মা বললেন, খাওয়ার সময়েও তুই পিছনে লাগতে ছাড়বি না—বেচারার খাওয়া থামিয়ে দিলি।

—আ-হা, বেচারা···ভালো করে খান।

কথা-বার্তা শুনে আর হাব-ভাব দেখে কে বলবে এই মেয়ে তাঁর থেকে বয়সে ন'বছরের ছোট। কালীকিংকর এতটা হজম করতে রাজি নন। গম্ভীর মুখে ভৈরবী মা-কে বললেন, মা আমি যদি একবারটি আসন ছেড়ে উঠি আবার বসতে পাব তো?

না বুঝে ভৈরবী-মা জিগ্যেস করলেন, কেন?

—আপনি সত্যি ভুল করেছেন দেখছি, ওর পাতে বেশির ভাগই হাড় পড়েছে, হাত ধুয়ে এসে আমি নিজে একটু মাংস বেছে দিই, বাচ্চা মেয়ের নজর লাগলে নিজে তাকে কিছু দিতে হয় শুনেছি।

—কোথায় শুনেছেন? আর এখানে বাচ্চা মেয়ে কে? কল্যাণীর সোজা-সুজি চ্যালেঞ্জ।—নজর কে কার দিকে দেয় আমি জানি না?

মোহিনী ভট্‌চায্‌ খাচ্ছেন আর মিটিমিটি হাসছেন। শেষের কথা শুনে ভৈরবী মা-ও হেসে ফেললেন।—বিতণ্ডা থামিয়ে যে-যার খেয়ে ওঠ্‌তো এখন। কালীকিংকরের দিকে চেয়ে বললেন, ও হাড় বেশি পছন্দ করে তাই ওর পাতে হাড় বেশি।

কল্যাণীও হেসে ফেলল। তারপরেই গলা চড়িয়ে হাঁক দিল, ও শিবঠাকুর, শুনছ? জেগে আছ না ঘুমোচ্ছ?

ঘরের ভিতর থেকে গম্ভীর জবাব এলো, জেগে আছি। ও-ছোঁড়ার পাখা গজিয়েছে, হাড় চিবুতে হলে আগে পাখ্‌না ছেঁটে দিতে হবে।

সময়ে কল্যাণীর পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। কালীকিংকর শুনলেন ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। কিন্তু আর নাকি পড়ার ইচ্ছে নেই। মেসোর ইচ্ছে এবারে কলেজে পড়ুক। সেই ইচ্ছে কল্যাণী ভৈরব-বাবাকে দিয়ে বরবাদ করিয়েছে। তাঁর কথার ওপর কার কথা? কিন্তু কালীকিংকরের এটা পছন্দ হয়নি। দুপুরে ভৈরব-মায়ের সঙ্গে বসে ওষুধ বানাচ্ছিলেন।

ছ'হাত ফারাকে বসে কল্যাণীও কি ঝাড়-বাছ করছিল। নিজের কাজের দিকে চোখ রেখেই কালীকিংকর বললেন, ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে আর না পড়ার কোনো মানে হয় না—আপনাদের জোর করা উচিত ছিল।

মন্তব্য ভৈরবী-মায়ের উদ্দেশে। কিন্তু ফোঁস যার করার সে করেই উঠল।

—আমাকে বিদ্যেধরী বানিয়ে আপনার কি সুবিধে হবে?

—আমার আর কি সুবিধে হবে, তোমার নিজেরই সুবিধে হবে।

—কি সুবিধে, চাকরি করতে বেরুবো?

—না বেরুলেও বেরুনোর যোগ্যতা থাকা ভালো। না পড়ে কি করবে?

—এম-এ পড়তে পড়তে আপনি পড়া ছাড়লেন কেন? আপনিই বা না পড়ে কি করছেন?

রাগ না করে কালীকিংকর বুদ্ধিমানের মতো হাসলেন।—নিজেকে আমি মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছি, কি করছি না করছি মা জানেন।

—নিজেকে আমি বাবার হাতে ছেড়ে দিয়েছি, কি করছি না করছি বাবা জানেন।

মায়ের হাত চলছে, কিন্তু নিঃশব্দে, হাসছেন। কালীকিংকর টিপ্পনীর সুরে বললেন, তুমিও তাহলে আমার মতোই ভেরেণ্ডা ভাজবে।

—আপনার মতো কেন, আমি তো কোনো মেয়ের আঁচলের তলায় বসে নেই—বাবার কাছে ক্রিয়া-কলাপ শিখে হাড় চিবুনোর বিদ্যেটাই ভালো করে রপ্ত করব!

কালীকিংকর অনেক দিন নিজেকে সমঝেছেন, এমন কি নিজের ওপর চাবুক চালিয়েছেন। এই মেয়েকে সকলেরই ভালো লাগে। যাঁদের সঙ্গে আসে তাঁদের ভালো লাগে। যাদের জন্য আসে অর্থাৎ রোগীদেরও ভালো লাগে। ভৈরবী-মায়ের ভালো লাগে। আর ভৈরব-বাবার তো চোখের মণি। ওপরওয়ালার কারিগরি বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে ভালো লাগার মতো মেয়ে করেই তাকে পাঠানো হয়েছে। কালী-কিংকরেরও শুধু ভালো লাগলে সেটা দোষের ভাবতেন না। কিন্তু ভালো

লাগা এক আর সমস্ত চিত্ত সংগোপনে তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা আর এক। নিজের কাছে এই আকর্ষণ যত স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কালীকিংকরের ততো অস্বস্তি। কল্যাণী মঙ্গলবারে তো আসেই, আর মাঝের একদিন বলতে শনিবারেই বেশি আসে। কালীকিংকরের মনে হয় সপ্তাহের এই দুটো দিনই যেন বড় বেশি দেরিতে আসে। আর দিন দুটো ফুরোয়ও বেশি তাড়াতাড়ি। কিন্তু কোনো শনিবারে না এলে মনে হয় এমন বর্ণশূন্য দিন জীবনে আর যেন কখনও আসেনি। ভট্চায্ মশাইকে জিগ্যেসও করতে পারেন না কেন এলো না। তখন ভৈরবী-মায়ের ওপরই রাগ হয়, কেন উতলা হন না, কেন জিগ্যেস করেন না এলো না কেন।

—এলো না তাতে তোর কি? তোর কি? তোর কি? নিজের ভিতর থেকেই এই গর্জন শুনতে পান কালীকিংকর। আক্রোশে নিজেকেই ফালা ফালা করে দিতে চান।—তোর কি আশা? তোর কেন এত দুরাশা? ...তুই না খোঁজার জগতের পথ পাড়ি দিতে চেয়েছিলি? এই পথের কেউ দোসর হতে পারে? তোর এই খোঁজার জগতে এখন কে ঘুর ঘুর করছে? শেষে কিনা একটা মেয়ে? তার থেকে তুই মরে যা! মরে যা, মরে যা, মরে যা!

ক্ষিপ্ত হয়েই নিজেকে শাসন করতে চেষ্টা করেন। তখন তাঁর হাব-ভাব আচরণ দেখে ভৈরবী-মাও এক-এক সময় চুপচাপ চেয়ে থাকেন।

একটা দুটো করে একে একে চারটে বছর কেটে গেল। তাঁর বয়েস উনত্রিশ। কল্যাণীর কুড়ি। ভৈরবী-মা একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, বাবা নাকি কুড়িতে বিয়ে দিতে বলেছিলেন ওই মেয়ের।...সেই কুড়ি। কালীকিংকর এমন নির্ভুল হিসেব রাখতে গেছেন কেন? কল্যাণীর কুড়ি বছর বয়সটা একটা যন্ত্রণার মতো এগিয়ে আসছে তো আসছেই। তবু হিসেব ভুলতে পারেন না কেন? এই মেয়ে এখন আরো নিটোল আরো স্থির যৌবনা। চাল-চলন স্বভাবের অস্থিরতা আগের থেকে কমেছে মনে হয়। কমেছে কারণ, সে যেন তার কদর জানে। জানে দুনিয়া তার বশ। ...খুব মিথ্যে জানে কি? এই মেয়েকে দেখিয়ে মোহিনী ভট্চায্ যার

দিকে আঙুল নাড়বেন সে-ই বর্তে যাবে, পরম সমাদরে নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলবে।

কিন্তু সংগোপনে এ কি যন্ত্রণা পুষছেন কালীকিংকর? বাসনার কোন্ অতলে নিঃশব্দে ডুবতে চলেছেন তিনি? একটি মেয়ের এমন ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে আছেন তিনি? এই মৃত্যু থেকে তাঁর যে সত্যিকারের মৃত্যু ভালো ছিল!

আর না। এবারে তিনি এই মৃত্যুর গহ্বর থেকে নিজেকে টেনে তুলবেন। তুলবেনই। বুদ্ধিনাশের এই জালে নিজেকে আর জড়াবেন না। ভৈরবী-মায়ের সঙ্গে কাজে বসে সেই দুপুরেই প্রস্তাব পেশ করলেন।—মা, চার বছর আপনার আশ্রয়ে কাটিয়ে দিলাম, এবার কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে···

ভৈরবী-মায়ের হাতের কাজ থেমে গেল। তিনি চেয়ে রইলেন।—শিক্ষা-দীক্ষা সব শেষ হয়েছে ভাবছিস?

—শুরু হয়েছে কিনা তাই জানি না মা, আপনার কাছে থেকে লোকের উপকার করার শিক্ষা কিছু পেয়েছি হয়তো—কিন্তু ভিতর থেকে এক পা-ও এগোইনি···।

—পা বাড়ালেই ভেতর থেকে এগুনো হবে?

—আপনি আশীর্বাদ করলে হবে।

—কাপুরুষকে আশীর্বাদ করব কি করে? অনেক দিন ধরেই তোকে অন্য-রকম দেখছি···পালানোর পথ কি কোনো পথ? কোথা থেকে কোথায় পালাতে চাস তুই?

ভৈরবী-মায়ের মুখে এ কি কথা! তিনি কি তাঁর ভিতরের কাটা-ছেঁড়া সব দেখতে পাচ্ছেন? তাঁকে বাসনার সমুদ্রে ডুবতে দেখছেন?

একটু চুপ করে থেকে আদেশের সুরে ভৈরবী-মা বললেন, অঘ্রান মাস পর্যন্ত অপেক্ষা কর্, সব ঠিক হয়ে যাবে।

···এটা ভাদ্র শেষ। মাঝে আশ্বিন কার্তিক। অঘ্রানে কল্যাণীর বিয়ে তাহলে।···ভৈরবী-মা তাঁর ভিতর দেখেছেন। তাই এই অমোঘ আদেশ।

দাঁড়িয়ে থেকে কল্যাণীর বিয়ে দেখে এই ক্রীতদাসত্বের মায়া থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে।

...তাই হোক। তিনি বলেছেন সব ঠিক হয়ে যাবে, এ-টুকুই সান্ত্বনা।

বিয়ে জানে বলেই হয়তো কল্যাণী শনিবারে আসা ছেড়েছে। সাহায্যের দরকার হয় তাই শুধু মঙ্গলবারে ওষুধ দেবার দিনে আসে। · সে কংকাল-মালী ভৈরবের বড় আদরের শিষ্যা।...বাবার কৃপায় তারও কি ভিতর দেখার চোখ হয়েছে ? নইলে মুখের দিকে ভালো করে না তাকিয়েও মনে হয় কেন, রমণীর চোখে মুখে কৌতুক উপছে উঠছে। কালীকিংকর পারত-পক্ষে তার দিকে তাকান না। কথা তো বলেনই না। তবু রোগী দেখা ওষুধ দেওয়ার পর্ব শেষ হতে কৌতুকে ডগমগ মুখের দিকে কালীকিংকরের চোখ পড়েই।

—তোমাদের অবধূতের কি এখন বাক্-সংযমের ব্রত চলেছে নাকি গো মা ?

কোনোদিকে না তাকিয়ে কালীকিংকর দাওয়া থেকে নেমে চলে এসেছেন।

নিজের হাত থাকলে অগ্রহায়ণ মাসটাকে কালীকিংকর টেনে হিঁচড়ে এগিয়ে নিয়ে আসতেন। তাড়াতাড়ি আসুক। তাড়াতাড়ি চলে যাক। মা বলেছেন, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

...সেই দিনটা জন্মাষ্টমী, কালীকিংকরের খেয়াল থাকার কথা নয়। ছিলও না। জিপ থামতে দেখল মোহিনী ভট্চাযের সঙ্গে কল্যাণী নামছে। ভট্চাযের হাতে তুটো মিষ্টির হাঁড়ি। আর কল্যাণীর হাতে বড়সড় একটা ফুলের ডালা। ফুল ছাড়া তাতে একটা চূড়ার মতো দেখা যাচ্ছে—সঙ্গে আরো কি।

ঘরের সামনে এসে গলা চড়ালো। শিবঠাকুর ঠিক-ঠাক আছ ? আসব ?

আয়, তুই হঠাৎ কোন্ টানে ?

ভিতরে ঢুকল। বাইরে দাঁড়িয়ে কালীকিংকর জবাব শুনলেন।—আজ জন্মাষ্টমী, ইচ্ছে হলো তোমাকে একটু সাজাবো—তাই।

হা-হা হাসি। জন্মাষ্টমীতে তুই ভৈরবকে সাজাবি! এই মতি হলো তোর।

...ফুলের সঙ্গে এ-সব কি মুকুট, চূড়া, বাঁশী!

—আমার হাতে পড়ে তুমি আজ মুরলীধর হবে।

—আর রাধিকা?

—আমি ছাড়া কে আবার তোমার রাধিকা হতে যাবে, যেমন কপাল।

—ঠিক আছে, সাজা। তারপর তোকে আমার কোলে বসে আমার সঙ্গে বাঁশি ধরতে হবে—যা ডবকাখানা হয়েছিস—রাধিকাও এমন ছিল না। মোটা গলা আর সুরেলা গলার সরব হাসি। কালীকিংকরের দাওয়া থেকে নেমে দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে। তাঁর বিষাক্ত মনে এমন সহজ রসিকতারও বিষ-ক্রিয়া। কিন্তু পা দুটো মেঝের সঙ্গে আটকে আছে। দাওয়ার ও-মাথায় দাঁড়িয়ে ভৈরবী-মা নিচু গলায় ভট্‌চায্‌মশাইয়ের সঙ্গে কি কথা বলছেন! বেশ কিছুক্ষণ বাদে ভৈরব-বাবার হাঁক শুনে কালীকিংকর সচকিত।—অবধূত! এই শালা ভূত—

ত্রস্তে ঘরে এসে দাঁড়ালেন। বাবাকে ফুল-সাজে সাজানো হয়েছে। ফুলের মালা, ফুলের বালা, ফুলের বাজুবন্ধ। মাথায় শিখি-চূড়া। হাতে বাঁশী।

—ছাখ্‌ ভালো করে ছাখ্‌—রাধিকা বলল, হিংসেয় জ্বলে পুড়ে যাবে—ডেকে দেখাও।···ঠিক বলেছে, জ্বলছিস—হা-হা-হা—এই শালা! আমার দিকে না তাকিয়ে তুই আমার রাধিকার রূপ গিলছিস? চোখ দুটো গেলে দেব না তোর। দূর হ, দূর হ!

কালীকিংকর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। সকলেই কি পরীক্ষার জালে কষে বাঁধছে তাঁকে? তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হবে—হতেই তো হবে! দাওয়া থেকে নেমে এলেন। লক্ষ্যহারার মতো শ্মশানের ভিতরের দিকে এগিয়ে চললেন। এটা ভাদ্রর শেষ।···অগ্রহায়ণের যে আরো অনেক দেরি!

সেই অঘ্রান মাস এলো। কালীকিংকর আরো স্থির আরো সংযত। বিয়ের দিন কবে জানা নেই। জানার আগ্রহও নেই। যে দিনেই হোক, তিনি গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু ভৈরবী-মা হঠাৎই এক বে-খাপ্পা আদেশ করে বসলেন। বললেন, আজ বিকেলের দিকে ভট্‌চায্‌ বাবার জিপ্‌ এসে তোকে নিয়ে যাবে—তোর সঙ্গে কথা আছে, তৈরি থাকিস।

তাঁর সঙ্গে ভট্‌চায্‌মশাইয়ের কি কথা থাকতে পারে কালীকিংকর ভেবে পেলেন না। হয়তো লোক-বল কম, সাহায্য দরকার।

জিপ এলো। তিনি উঠলেন। ফেরার সময়েও জিপ পাবেন আশা করা যায়। নইলে রামপুরহাট থেকে বাসে ফেরা আয়াসসাধ্য ব্যাপার। না কালীকিংকরের মনে এখন কোনো দুশ্চিন্তার ঠাঁই নেই।

ড্রাইভার বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে জিপ নিয়ে চলে গেল। কড়া নাড়তে দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে কল্যাণী।

খুব অমায়িক গলা করে বলল, অবধূতজীর আসতে পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?

—না।···এ-মাসেই তোমার বিয়ে শুনলাম···কংগ্র্যাচুলেশন্‌স।

—শুনলেন! চাউনি বিস্ফারিত-প্রায়।— এ-মাসেই আমার বিয়ে আপনি শুনলেন?

চাপা হাসিতে ঝকমক করছে সমস্ত মুখ। কালীকিংকর হঠাৎ জবাব দিতে পারলেন না।

—ঠিকই শুনেছেন—থ্যাংক্ ইউ। ও মেসোমশাই ইচ্ছে করে আসতে দেরি করছ কেন—?

দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল। হঠাৎ এমন মজার ব্যাপারটা কি হলো কালী-কিংকর বুঝলেন না।

মোহিনী ভট্‌চায্‌ এসে পরম আদরের অতিথির মতোই ব্যবহার করলেন তাঁর সঙ্গে। জলখাবারের আয়োজন ভোজের আয়োজনের মতোই। জিপ পাঠিয়ে হঠাৎ বাড়িতে ডেকে আনা হলো কেন কালীকিংকর তার কোনো হদিস পেলেন না। আপ্যায়নের পর ভট্‌চায্‌ গৃহিণী উঠে যেতে আর ধৈর্য থাকল না।—মা বলছিলেন, কি দরকারি কথা আছে···

—হ্যাঁ এইবার বলি। আজ পাঁচ তারিখ। সামনের চৌদ্দ তারিখে বিয়ের দিন ঠিক করলাম, অবশ্য ভৈরব-বাবাকে একবার জিগ্যেস করে নিতে হবে। ···মা বলছিলেন, কল্যাণীর ব্যাপারটা তোমাকে খোলাখুলি সব জানাতে, জানাবার ভারও তিনি আমাকেই দিয়েছেন, তাই তোমাকে ডেকে আনা।

কালীকিংকর বিমূঢ় হঠাৎ।—কল্যাণীর ব্যাপার আমাকে জানাতে বলে-ছেন···! আমাকে কেন ?

মোহিনী ভট্‌চায্‌ মিটিমিটি হাসছেন।—বিয়েটা হতে যাচ্ছে তোমার সঙ্গে, আর জানাতে যাব অন্য লোককে ডেকে এনে ?

দীর্ঘ চার বছর ধরে বিশাল একটা অনুভূতির বন্যাকে বুঝি কাঁচা মাটির বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার জন্য যুঝছিলেন কালীকিংকর অবধূত। কটা মাত্র কথায় সেই বাঁধ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সেই তোড়ে নিজেরই হাবু-ডুবু দশা।

মনের সেই অবস্থাতেই মোহিনী ভট্‌চায্‌ যা বলে গেলেন, তিনি বোবার মতো বসে শুনলেন।

···কল্যাণীর বাবার নাম পরমেশ চক্রবর্তী, মায়ের নাম মহামায়া। মহামায়াই এখন কংকালমালী ভৈরবের ডেরার ভৈরবী-মা। কল্যাণী তাঁর একমাত্র সন্তান। রামপুরহাটেই পরমেশ চক্রবর্তীর বাপের মস্ত অবস্থা ছিল। জমি-জমা আব প্রাসাদের মতো বাড়ি ছিল। কলকাতায় বাড়ি ছিল। অল্প বয়সে অগাধ বিত্তের অধিকারী হয়ে পরমেশের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আগেও তাঁর স্বভাবচরিত্র ভালো ছিল না। তাঁর চরিত্র শোধরানোর জন্য বাপ মা অনেক বাছাই করে রূপসী মেয়ে মহামায়াকে ঘরে এনেছিলেন। তাঁকে পেয়ে পরমেশ বিকৃতির পথে আরো বেশি এগিয়েছেন। তাঁর ভোগের লালসা অত্যাচার ব্যভিচার বেড়েই চলেছিল। কিন্তু মহামায়ার ভিতরেও আগুন কম ছিল না। শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পরেই একমাত্র মেয়েকে নিয়ে তিনি কলকাতার বাড়িতে চলে এসেছেন। এমন বাপের চোখের সামনে তিনি মেয়েকে রাখতে রাজি নন।

···নিজের এই চরিত্র পরমেশের। তার ওপর সন্দেহ রোগ। রামপুরহাটে থাকতে স্ত্রীকে ঘর-বন্দী রেখেছিলেন। চাকর-বাকরকে পর্যন্ত অন্দরমহলে ঢুকতে দিতেন না। স্ত্রীর এমন বিদ্রোহ তিনি বরদাস্ত করেন কি করে ? রামপুরহাট থেকে কলকাতা আর কত দূরে। মাতাল হয়ে আসতেন, অত্যাচার আর উৎপীড়নও দিনে দিনে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। স্ত্রীর প্রতি

সন্দেহের কীট তাঁর মাথায় প্রথম ঢোকে রামপুরহাটে প্রায় সমবয়সী নিজের খুড়তুতো ভাইকে নিয়ে। এই দেওরটিকে মহামায়া পছন্দ করতেন। সেই দেওরও তখন কলকাতাবাসী। নিজে সেধে এসে মহামায়ার দেখা শুনোর দায়িত্ব নিয়েছেন। এমন দরদের একটাই অর্থ জানেন পরমেশ চক্রবর্তী। আর নিজের স্ত্রীর কলকাতায় এসে থাকার কারণও তাঁর কাছে জলের মতো স্পষ্ট।

···ক্রমে তাঁর দিকে চেয়ে নিজের মৃত্যুর ছায়া আর সর্বনাশের ছায়া দেখতে লাগলেন মহামায়া। মানুষটা সেই যে কলকাতায় এসে বসেছেন আর নড়েন না। বাড়িতে যাদের নিয়ে ভোগের আসর বসে, অন্তঃপুরের দিকে তাদের হাঙরেব দৃষ্টি। বিদ্রোহের আগুন নিয়ে আবার স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। পরমেশের চোখে মুখে ক্রূর বিকৃত হাসি। বলেছেন, ভয় করছে ? স্বামীকে বাতিল করে কেবল একজনের আনন্দের খোরাক যোগাচ্ছ ··সেই একের জায়গায় পাঁচ জন হলে অত ভয়ের কি আছে ? ওই অ্যালসেসিয়ানগুলোকে এবার একদিনে ছেড়ে দেব ভাবছি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বেচারারা পাগল-পাগল করছে।

মহামায়ার মনে হলো সেই রকমই কিছু করতে পারে। রমণীর দেহ ছিঁড়ে খেতে দেখার উল্লাস দু'চোখ দিয়ে যেন গলগল করে উপছে উঠছে।··· আর, শেষে এই লোকের হাতে তাঁর মৃত্যু অবধারিত।

পরদিন মেয়েকে আয়ার সঙ্গে স্কুলে পাঠালেন না। তাকে প্রস্তুত করে নিজে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হলেন। পরমেশ জিগ্যেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

মহামায়া জবাব দিলেন, হেডমিসট্রেস দেখা করতে বলেছেন, মেয়ের সম্পর্কে কিছু বলবেন হয়তো···।

স্ত্রীর শান্ত মেজাজ দেখে পরমেশ হাসলেন। সেই বিকৃত হাসি।—ফেরার সময় একবার শিবুর সঙ্গে দেখা করে আসবে না—কবে আবার সুযোগ হয় ঠিক কি···।

শিবু সেই খুড়তুতো দেওর। সন্দেহের কীট-দংশনে এখন সমস্ত মস্তিষ্ক

ঝাঁঝরা। মহামায়া মেয়ে নিয়ে চলে গেলেন। পরমেশের চোখে এটা নতুন কিছু নয়। মেয়েকে নিয়ে অনেক দিনই তাঁকে স্কুলে যেতে দেখেছেন।

···মহামায়া নিজেও আর ফেরেননি। মেয়েও না।

কবে কিভাবে বক্রেশ্বর শ্মশানের কংকালমালী ভৈরব বাবার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ মোহিনী ভট্‌চায্‌ জানেন না! বাবার তলব পেয়ে একদিন ছুটে গিয়ে দেখেন, ঘরে একটি মহিলা আর সাত আট বছরের মেয়ে বসে। মেয়েটিকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বাবা হুকুম করলেন, এই মেয়ে তোমার কাছে গচ্ছিত থাকল, নিজের ছেলে মেয়ের থেকেও বেশি যত্নে একে প্রতিপালন করবে। কেউ জিগ্যেস করলে আত্মীয় পরিচয় দেবে।

মেয়েটিকে নয়, ওই মহিলাকে কি মোহিনী ভট্‌চায্‌ কখনো কোথাও দেখেছেন? ঠাওর করতে পারলেন না। এরকম এক তাজ্জব দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হলো বলেই আরো অবাক। কর-জোড়ে জিগ্যেস করলেন, ইনি কে বাবা?

সঙ্গে সঙ্গে হুংকার।—তোর তা দিয়ে কি দরকার রে শালা! আমার ভৈরবী—কেন, চোখে ধরেছে?

কল্যাণীকে নিয়ে মোহিনী ভট্‌চায্‌ প্রস্থান করে বেঁচেছেন।

রামপুরহাটে ভৈরবীকে নিয়ে একটা চাপা কানা-ঘুষো একটু একটু করে বেড়েছে। বছর ঘুরতে কিছু কানে গেছে পরমেশ চক্রবর্তীরও। তিনি এই শ্মশানে এসেছেন, দূর থেকে স্ব-চক্ষে ভৈরবীকে দেখেছেন।···হ্যাঁ, তখন তো তাঁর ভৈরবীরই বেশ।···দিন কতকের মধ্যে রামপুরহাটের বাড়িতে সাতটি নতুন মুখ দেখা গেছে।

···রাতে মদের নেশায় পরমেশ চক্রবর্তীর নীরব সংকল্প নিজেদের অগোচরেই হয়তো কিছুটা সরব হয়েছিল। একে পুলিশের চাকরি মোহিনী ভট্‌চাযের তায় কংকালমালী ভৈরবের এমন ভক্ত—তাঁরও কানে আসা খুবই স্বাভাবিক।···বাবার থানে বড় রকমের কিছু হামলা ঘটতে যাচ্ছে, রক্তাক্ত কাণ্ড কিছু হতে যাচ্ছে।

জিপ ছুটিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ভৈরব বাবার কাছে এসেছেন তিনি। পুলিশের

বড় চাকরিতে বহাল, বাবার হুকুম হলে সকলকে অ্যারেস্ট করে থানায় পুরতে অসুবিধে নেই।

ভৈরব বাবা নির্বিকার।—কিচ্ছু করতে হবে না, সময় হয়েছে, শালা নিজেই মরবে।

তবু সকলের অজান্তে বাড়িটাকে বেশ কড়া প্রহরায় রেখেছিলেন মোহিনী ভট্‌চায্‌।

ঠিক তিন দিন পরের যা সমাচার, পুলিশের চোখে ঘটনার দিকে থেকে তা অভিনব কিছু নয়। তবু কণ্টকিত শুধু মোহিনী ভট্‌চায্‌। বাবার নিরুদ্বেগ ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়েছে।

…সকালে রক্তাক্ত মৃত অবস্থায় পরমেশ চক্রবর্তীকে তাঁর শোবার ঘরে পাওয়া গেছে। ঘরের সিন্দুক হাঁ-করা খোলা। সাতজন নতুন মুখের মধ্যে দু'জন উধাও। পুলিশের জেরায় বাকি পাঁচজন কবুল করেছে, আগের দিন সকালে পরমেশ চক্রবর্তী সাত জনকে দেবার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে একুশ হাজার টাকা তুলে ওই সিন্দুকে রেখেছিলেন। লোক দুটোর সঙ্গে সেই টাকাও উধাও।

…পরের এই তেরো বছরের সমাচার সংক্ষিপ্ত। নিজের মেয়ের মতোই কল্যাণীকে বড় করেছেন মোহিনী ভট্‌চায্‌। অবশ্য বাবার কৃপাই এই মেয়ের সব থেকে বড় সম্পদ। বাবার নির্দেশে পরমেশ চক্রবর্তীর রামপুর-হাটের বাড়ি-ঘর, জমি-জমা আর কলকাতার বাড়ি বেচে নগদ টাকা সব কল্যাণীর নামে ব্যাঙ্কে জমা ছিল। সুদে আসলে সে টাকা ছ'লক্ষর ওপর দাঁড়িয়েছে। সে সাবালিকা হতে সব এখন তার হেপাজতে।

সেই দিনে ওই টাকার অঙ্ক শুনে কালীকিংকরের মাথাটা ঝিম-ঝিম করে উঠেছিল। ভট্‌চায্‌মশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জিপে ওঠার পরেও ভেবেছিল, বাবার ডেরায় ফিরে না গিয়ে একেবারে সটকান দেবে কিনা। ছ'লাখ টাকার ওপরে মালিক—বাপরে বাপ! রূপের ডালি এত বড়লোক মেয়ের জন্য এঁরা তাঁকে বাছাই করে নিলেন কেন কালীকিংকর ভেবে পেলেন না। ··কিন্তু পালানোর চিন্তা বেশিক্ষণ মাথায় ঠাঁই পেল না।

আজ চার বছর ধরে যে-মেয়ে তাঁর মন জুড়ে বসে আছে, সেই মনের সঙ্গে ওই মেয়ের কোনো টাকার যোগ ছিল না। ওই মেয়েকেই কেবল তাঁর মস্ত ঐশ্বর্য বলে মনে হয়েছিল। টাকার লোভের ছিটেফোঁটাও ছিল না, এখনো নেই।··এ-মাসেই বিয়ে বলে অভিনন্দন জানানোর জবাবে কল্যাণীর সেই মুখ, সেই বিস্ফারিত চাউনি, আর সেই কথাগুলো চোখ কান জুড়ে বসল। বলেছিল, শুনলেন। এ-মাসেই আমার বিয়ে আপনি শুনলেন।

···তার মানে কার সঙ্গে বিয়ে এ কেবল অবধূতই জানতেন না। আর সকলেরই জানা ছিল।

বিয়ে হয়ে গেল। ভট্‌চায্‌মশাইয়ের বাড়িতেই হিন্দু মতে বিয়ে। আবার সেই বাড়িতেই বউ-ভাত, ফুলশয্যা। এ-বিয়েতে তেমন আড়ম্বর বা জাঁক-জমক কিছুই হলো না।

ফুলশয্যার রাতে কল্যাণীকে নিরিবিলিতে পাওয়ার পরেও নিজের এই ভাগ্য কালীকিংকর যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তখনো ভাবছেন এমন ঘটনার বুনোট সম্ভব হলো কি করে? কে ঘটালো?

বলেই ফেললেন, ব্যাপারখানা কি রকম হলো?

নব-বধূর মুখের হাসিতে চাউনিতে বা কথায় লজ্জাটজ্জার লেশমাত্র নেই।

—কেন, এ-রকমই হবে তুমি জানতে না?

—আমি একটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলে, শ্মশানে ভৈরবী মায়ের কাছে পড়ে থাকি—আমার জন্য রাজত্বসুদ্ধ রাজকন্যা সেজে বসে আছে কি করে জানব।···তুমি জানতে?

—চার বছর আগে প্রথম যেদিন তোমাকে দেখলাম সে-দিনই জানতাম

—কি করে—কি করে? কালীকিংকর ব্যগ্র উন্মুখ।

—সে-দিনই দই-মিষ্টির হাঁড়ি হাতে তোমাকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিবঠাকুর হুংকার ছাড়লেন মনে নেই? বললেন, তুমি তাঁর বুক ঝাঁঝরা করে দেবার মতলবেই এখানে এসে জুটেছ—আমি তক্ষুণি বুঝে

নিয়েছি, ব্যাপারখানা এই দাঁড়াবে।…এর অনেক পরে অবশ্য শুনেছি, মায়ের সঙ্গে তোমার প্রথম সকালের ইণ্টারভিউতে তুমি ফার্স্ট-ক্লাস নম্বর পেয়ে গেছলে।

—কিন্তু আমার তো তুমি কিছুই জানতে না—মায়ের মতলব বুঝে তুমি খুব ধাক্কা খাওনি ?

—কি বুদ্ধি তোমার—বললাম না, প্রথম দিন শিবঠাকুরের ওই কথা শুনেই যা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি! মায়ের মনে যা-ই থাক, তাঁর ভৈরব-বাবার মত না হলে কারো এক পা এগোবার সাধ্য ছিল নাকি! …আর তিনি মত দিলে আমি ধাক্কা খেতে যাব কেন—আমার ভালো-মন্দ তাঁর থেকে বেশি কে জানে—কে বোঝে ?

পরদিন সকালে জিপে করে দু'জনে এলেন কংকালমালী ভৈরব আর ভৈরবী-মা-কে প্রণাম করতে। ভট্‌চায্‌মশাই দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও সেখানেই করেছেন।…বউ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ভৈরব বাবার বজ্র হুংকার।—শালা বেইমান। শালা নেমকহারাম! তো বেটীকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম না, এ-শালা আমার বুক ঝাঁঝরা করে দেবার মতলবেই এখানে এসেছে।

তাঁর পায়ের কাছে কল্যাণী জানু-আসনে বসল। আঁচলের গ্রন্থিতে টান পড়তে কালীকিংকর পিছনে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা যতটা সম্ভব বেজার করে কল্যাণী ভৈরব-বাবার দিকে তাকালো।…বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেব ?

—তাতে আর কতটুকু জুড়োবে—তুইও এমন নেমকহারাম—অ্যাঁ ? আমাকে ছেড়ে ওই শালাতে মজে গেলি ?

—অবলাকে তুমি রক্ষা করলে না, কি করব …?

আস্তে আস্তে তাঁর দু'পায়ের ওপর মাথা রাখল। পায়ের ওপর নিজের কপাল মুখ আর দু'গাল বুলোতে লাগল। এই প্রণাম দেখে কালীকিংকরের বুকের তলায় অদ্ভুত এক আবেগের ঢেউ। কংকালমালী ভৈরব হাসছেন মিটিমিটি। জটাজূট চুল-দাড়ি বোঝাই রুক্ষ মূর্তি ভৈরব বাবার এমন

কোমল মুখ কালীকিংকর আর দেখেননি।

প্রণাম করে উঠতে ভৈরবী মায়ের দিকে বাবা হাত বাড়ালেন। সিঁদুরের পাত্র হাতে তিনি প্রস্তুত। বাবা মোটা মোটা তিনটে আঙুল সিঁদুরে ডুবিয়ে কল্যাণীর কপালে আর মাথায় লেপে দিলেন।

সে উঠে সরে বসতে কালীকিংকর হাঁটু মুড়ে বসে বাবার পায়ে মাথা রাখলেন। দশ সেকেণ্ড না যেতে বাবা দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন, খুব ভক্তি দেখিয়েছিস শালা—এবারে ওঠ্।

উঠতে বাবা তাঁর কপালে সিঁদুর দিয়ে একটা ত্রিশূল মতো কিছু এঁকে দিলেন মনে হলো। পরে আয়নায় দেখেছেন ত্রিশূলই। ভৈরব কটমট করে খানিক সোজা তাঁর দিকে চেয়ে থেকে কল্যাণীর দিকে ফিরলেন।—এ শালা তোকে খুব ভোগাতে আর জ্বালাতে চেষ্টা করবে—তুই কিছু পরোয়া করিস না, যত চেষ্টা করবে শালা নিজে ততো ভুগবে আর জ্বলবে।

কল্যাণী আলতো করে বলল, জ্বালাতে আর ভোগাতে চেষ্টা যাতে না করে তুমি তাই করে দাও—ছ'জনেরই বাঁচোয়া।

ভৈরব-বাবা খেঁকিয়ে উঠলেন, আমি কি ঈশ্বর যে যা বলবি তাই করে দেব—ও-শালার খেলা না খেলে কারো পার আছে? ঝামেলায় পড়লে ওই শালাকেই ডাকবি—দেখবি এই শালারও নাকে আপনা থেকেই দড়ি পড়ে গেছে।

ও-শালা মানে ঈশ্বর, আর এ-শালা মানে কালীকিংকর।

বিয়ের দশদিন যেতেই ভৈরবী-মা জামাইকে তাড়া দিতে শুরু করলেন, আর বসে থাকিস না—দেখে-শুনে একটু জমি কিনে ছ'খানা ঘর তুলে নে—ভট্‌চায্‌মশাইয়ের ওখানে আর কতদিন পড়ে থাকবি?

—কিন্তু ভট্‌চায মশাই যে ছাড়তে চান না, বলেন হবে'খন, যাক কিছু দিন।

—তিনি অন্য আশায় বলেন, শিগগীরই নিজের ভুল বুঝবেন।···ভৈরব-বাবা কোন্নগরে গঙ্গার কাছাকাছি নিরিবিলিতে একটু জমি নিয়ে ঘর তুলতে বলেছেন তোদের।

ভট্চায্ মশাইয়ের কি আশা বা কি ভুল আর মাথায় থাকল না কালী-কিংকরের। জিগ্যেস করলেন, হুগলীর কোন্নগর? সেখানে কেন?

—জায়গাটা খুব পছন্দ, প্রথম জীবনে ভৈরব-বাবা সেখানকার শ্মশানেই কাজ করেছিলেন।

কল্যাণীকে বলতে সে-ও সায় দিল, হ্যাঁ, শিবঠাকুর মুখ ফুটে বলেছেন যখন, সেখানেই জমি ছাখো।

—কিন্তু এত তাড়ার কি আছে! আচ্ছা, এ-দিকে ভট্চায্‌মশাই আমাদের ছাড়তে চান না, ও-দিকে মা বলেছেন, উনি অন্য আশায় আছেন, শিগগীরই নিজের ভুল বুঝবেন···কি ব্যাপার বলো তো?

—ব্যাপার আর কি, মেসোমশাই ভাবছেন আমাদের বাড়ি ঘর না হওয়া পর্যন্ত মা আর তাঁর ভৈরব-বাবাকে আটকে রাখা যাবে—কিন্তু তা তো আর যাবে না, ওঁরা খুব শিগগীরই চলে যাবেন।

আকাশ থেকে পড়লেন কালীকিংকরও।—ওঁরা চলে যাবেন মানে—কোথায় যাবেন?

—তা কি করে জানব! তাছাড়া কত জায়গায় যাবেন ঠিক আছে!

—আর ফিরবেন না?

—মনে হয় না। আমার বিয়ের জন্যেই এতদিন এখানে আটকে ছিলেন, এখন যে কোনো দিন দেখব তাঁরা চলে গেলেন।

এ-খবর শুনে কালীকিংকর যত না অবাক, তার থেকে বেশি অবাক কল্যাণীর দিকে চেয়ে। না, ওই মুখে এতটুকু বিষাদের চিহ্নমাত্র নেই। আর ফিরবেন না জেনেও এমন নির্লিপ্ত থাকতে পারে কি করে? মায়ের প্রতি না হোক, ভৈরব-বাবার প্রতি তার আকর্ষণ তো নিজের চোখেই দেখা। জিগ্যেস না করে পারলেন না, তোমার মন খারাপ হচ্ছে না—কষ্ট হচ্ছে না?

তেমন সাদাসিধে জবাব, মন খারাপের কি আছে, আর কষ্টই বা হবে কেন—সেই দশ বছর বয়সে দীক্ষা নেবার পর থেকে শিবঠাকুর কি এক মুহূর্ত আমার কাছ-ছাড়া নাকি!

সত্যি দিন-কতকের মধ্যে ভৈরবী-মা আর কংকালমালী ভৈরব বক্কোমুনির

থান ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন কেউ জানল না।

কল্যাণী তেমনি নির্লিপ্ত, সহজ। বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করতে লাগল কেবল মোহিনী ভট্‌চাযের। আর কালীকিংকর অবধূতের। কল্যাণী তাঁর মনের অবস্থা আঁচ করে হেসেই মন্তব্য করল, তোমার সত্যিকারের অবধূত হতে ঢের দেরি।

জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হলো কালীকিংকর অবধূতের। এই অধ্যায়ে তাঁর সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিনী নিজের স্ত্রী কল্যাণী।

কোন্নগরে জমি কেনা হয়েছে। কালীকিংকর আর ভট্‌চায্‌ মশাইয়ের তৎপরতায় তিন ঘরের এক-তলা দালান উঠতেও সময় লাগেনি। তিনি আর তাঁর গৃহিণী এসে তাঁদের সংসার পেতে দিয়ে গেছেন।···তারপর দিনে দিনে নিজের স্ত্রীটিকেই আবিষ্কারে ঝোঁক নেশা এমন কি অসহিষ্ণুতাও কালীকিংকরের। তাঁর সহজ নির্লিপ্ততার আবরণ তিনি ভাঙতে চেয়েছেন। এর সবটুকুই একেবারে সহজাত এ তিনি কিছুতেই ভাবতে পারেন না, বা ভাবতে চান না।

এত টাকা যার দখলে তার মন যাচাই করার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয় খুব।
—এত টাকা তোমার, স্বামীকে খাইয়ে-পরিয়ে রাখছ, আমি তো তোমার ক্রীতদাস।

হু'চোখে সহজ কৌতুক উপছে উঠতে দেখেছেন।—ক্রীত নয় তবে দাস বলতে পারো।

—কি রকম?

—তুমি তো আমার কাছে আসো নি, শিব-ঠাকুরের ইচ্ছে বুঝে আমি নিজে সেধে তোমার কাছে গেছি—তাই ক্রীত আর কি করে হবে। আর, শুধু দাস তুমি নিজে হতে পারো যদি সেই রকম ভাবো—এর সঙ্গে টাকার কোনো সম্পর্ক নেই।

—নিজেকে আমি তোমার দাস ভাবি?

—মাঝে মাঝে এই রকমই মনে হয়, বেশি মনে হয় যখন বীরত্ব ফলাতে চেষ্টা করো। আসলে নিজেই তুমি সহজ হতে পারছ না।

নিজেকে জাহির করার তাড়নায় আর সেই সঙ্গে এক অমোঘ আকর্ষণে আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে ডুবতে চেয়েছেন। সেই ভোগ অনেক সময় প্রায় নির্দয় নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে চেয়েছে। কারণ, ভোগের দোসরের তখনো কোনো প্রতিবাদের আভাস মাত্র নেই। সর্বংসহার মতো অচঞ্চল, চোখে কৌতুক, ঠোঁটে হাসি। প্রত্যাখ্যানের অসহিষ্ণুতা নেই। আবার দিনের পর দিন এই ভোগ-পর্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েও দেখেছেন। তখনো কোনো আহ্বান নেই।

···এক এক সময় মনে হতো, সত্যি তিনি এক রমণীর দাস হয়ে পড়ছেন। এই রমণী তাঁর স্নায়ু সত্তা সব গ্রাস করে বসে আছে। বন্ধনের এই শেকল তাঁকে ছিঁড়তে হবে। জীবনটাকে তিনি এই মোহনায় টেনে এনেছেন এমন পরিণতির জন্য নয়। তখনই বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছেন। প্রথমে তিন-চার দিন, তারপর এক সপ্তাহ, তারপর এক দেড় তিন চার মাসের জন্যও উধাও হয়েছেন।···আবার এক বিচিত্র তৃষ্ণা তাঁকে ঘরের দিকে টেনেছে। তৃষ্ণাই শুধু নয়, সেই সঙ্গে একটা শূন্যতাবোধও। প্রতিবারই আশা করেছেন, ফিরে এসে স্ত্রীর দুশ্চিন্তাকাতর ম্লান মুখ দেখবেন। কিন্তু তার বিপরীত। হাসিমুখের টিপ্পনী শুনতে হয়েছে, অবধূতজীর ধৈর্য ফুরোলো?

মনের এই অবস্থায় একটা ভাঙচুরের নেশায় পেয়ে বসত কালীকিংকরকে। রক্তমাংসের এই রমণীর দেহই ভেঙে-চুরে রহস্য উন্মোচনের লক্ষ্য। তখনো প্রত্যাখ্যান নেই, বিরক্তি নেই। টানা বিরতির পরে আহ্বানও নেই। শেষে হাল ছেড়ে জিগ্যেস না করে পারেননি, আচ্ছা এতদিন আমি ছিলাম না—তোমার ভাবনা হয়নি?

দু'চোখে কৌতুক উপছে উঠতে দেখেছেন। জবাবটুকুও তেমনি সরস।—ভাবনা না হলে তুমি ফিরে এলে কি করে—ভাবনার টান পড়তেই তো এসে হাজির হলে।

একটু বাদে আবার বলেছে, আচ্ছা, আমার শিবঠাকুরের কাছে চার বছর থেকেও তুমি সহজ হতে পারো না কেন—উনি বলেছিলেন, তুমি আমাকে অনেক ভোগাতে আর জ্বালাতে চেষ্টা করবে, আর ঠিক তাই করতে গিয়ে

নিজেই ভুগছ জ্বলছ—সুখে থাকতে তোমাকে এমন ভূতে কিলোয় কেন ?

বছরের পর বছর কেটে যায়। কিন্তু কালীকিংকরের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আপনা থেকেই কি করে ভক্ত জুটছে—জোটে—জানেন না। নিজের কাজ অনুশীলন, তন্ময়তা নিয়ে বেশ কিছুদিন হয়তো বিভোর হয়ে রইলেন। তারপরেই ভিতর থেকে আবার একদিন ছোটার তাড়া। পালানোর তাড়া। কেউ আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধছে মনে হলেই বন্ধন ছেঁড়ার তাগিদ। পরে অবশ্য ভেবে দেখেছেন এটা নতুন কিছু নয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর এই স্বভাব। এখন বন্ধনের রকম-ফের হয়েছে শুধু। এখন স্ত্রীই বন্ধন। সোনার শিকল হলেও শিকলই। মনের একটা দিক এই শিকলে বাঁধা পড়ে আছে মনে হলেই বেরিয়ে পড়েন। এই করে দেশের অনেক জায়গায় আবার অনেক বার করে ঘোরা হয়ে গেল। অর্থের জন্য স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হতে হয় না। অর্থের যোগানদার আপনা থেকেই এগিয়ে আসে। কিন্তু তখনো তাঁর মনে হয়নি, ঘটনার আসর সাজানো আছে বলেই, আর সেই আসরে কিছু ভূমিকা আছে বলেই তাঁর টান পড়ে। তিনি ঠাঁই-নাড়া হন। কিন্তু নিজে ভাবেন, বন্ধন-দশা ঘোচানোর তাগিদেই তিনি বেরিয়ে পড়েন।

···শেকল ছিঁড়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বেরিয়ে পড়ার শেষ প্রহসন সাত বছর আগের। তখন নানা দিকে তাঁর অনেক ভক্ত, অনেক কদর। কিন্তু ঘরে স্ত্রী যেমন বন্ধন, এ-সবও যেন তেমনিই বন্ধন। কেবলই মনে হতো সব-কিছু ছেড়ে, সব-কিছু থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যদি কেউ-না কিছু-না বা কারো-না গোছের একজন হতে পারতেন, তাহলে নিজেকে পেতেন। কংকালমালী ভৈরব বাবা হয়তো এই পাওয়াই পেয়েছেন, সত্যিকারের সাধন-পথের যাত্রীদেরও হয়তো এই পাওয়াটুকুই লক্ষ্য।

···কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অভিমান বা অভিযোগ না রেখেই সেবারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঘর ছেড়েছিলেন। তিনি কেউ-না হবেন, কিছু-না হবেন, কারো-না হবেন।···বিহারে দ্বারভাঙ্গা জেলার কাকুরঘাটির মহাশ্মশানে এক অজানা অবধূত হিসেবে টানা তিন বছর কাটিয়েছিলেন।···তারপর এক

ঘটনার ধাক্কায় আবার ছিটকে বেরিয়ে পড়েছেন। ঘরে ফিরে এসেছেন। মনে হয়, তাঁর চোখ খুলেছে ! তখনই মনে হয়েছে সেখানকার সাজানো ঘটনায় তাঁর একটা বড় ভূমিকা ছিল বলেই টান পড়েছিল। তারপর থেকেই তাঁর জিজ্ঞাসা, এমন-সব ঘটনা কেন ঘটে, কে ঘটায়, কে সাজায় ?

···এরপর থেকে স্ত্রীকেও আর তিনি শেবল ভাবেন না। বরং শক্তি ভাবতে চেষ্টা করেন। চার বছরের মধ্যে আর ঘর-ছাড়ার টান অনুভব করেননি।

৪

আমার কোন্নগর যাতায়াতের একটা বছর ঘুরে গেল। যে দুটি মানুষকে কেন্দ্র করে এখানে অনেক মুখের মিছিল, তাঁদের একজন মাতাজী, অন্যজন অবধূত। অপরের চোখে যাঁরা গড্-ম্যান বা গড্-মাদার, তাঁদের প্রতি আমার একটা প্রতিকূল মনোভাব ছিল। কারণ নিজের ব্যথার জায়গায় তাদের কারো আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি কোনো কাজে লাগেনি। উল্টে আমাকে হতাশা আর বিভ্রমের অন্ধকারে ঠেলেছে। কিন্তু এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসার ফলে আমার মনোভাব কিছুটা বদলেছে।···মনে হয়েছে, এই পথের সকলেই নিজেদের গড-ম্যান বা গড-মাদার ভাবেন না। কালীকিংকর অবধূত আর মাতাজী অন্তত ভাবেন না। অবধূত তাঁর সাধ্য মতো মানুষের বিপদ আপদ নিরসনের পথ খোঁজেন। ব্যাধির হদিস পেলে ওষুধ দেন। অন্য-রকম আপদ বিপদে যাঁর যাঁর স্বভাব চরিত্র তলিয়ে দেখে নিয়ে আর বুঝে নিয়ে তাকে নিজের মনের ঘরে আর বিশ্বাসের ঘরে ফেরাতে চেষ্টা করেন। ফল যারা পায় তারা যদি তাঁকে গড্-ম্যানের আসনে বসিয়ে পুজোই করে—সেটা তাঁর অপরাধ নয়।

···মাতাজীরও তাই। মানুষের মঙ্গল লক্ষ্য। সেই মঙ্গল যদি ভক্তি বিশ্বাসের ভিতর দিয়েই আসে, তাকে তুচ্ছ ভাবার কারণ নেই। নিজে যে তিনি এমন স্থির শান্ত সুন্দর—জীবনের মহিমার এ-ও তো একটা দিক। এত ধৈর্য এত সহিষ্ণুতা তিনি পেলেন কোথা থেকে? পরিপূর্ণতার মধ্যেও এমন সহজাত নির্লিপ্ততার শ্রী হাজারে একজনের মধ্যে কি দেখা যায়? একান্নোতেও অনায়াসে যিনি একত্রিশের রূপ ধরে রাখেন, তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য মানুষকে টানবে এ বেশি কথা কি?

অবধূত হেসেই একদিন বলেছিলেন, আপনার চোখে পড়েনি বলেই এখনো মান বাঁচছে। লেগে থাকলে দেখবেন ভণ্ড জোচ্চোর ঠক-বাজ এইসব ভালো

ভালো কথা আমাদেরও শুনতে হয়—আমাদের সব থেকে বড় দোষ আমরা ভগবান নই।

এতটা না হোক, একটা মজার ব্যাপারের সাক্ষী আমি নিজেই। সেদিন কালীপুজো। পথের বাজীর সংকট এড়াতে আমরা বিকেলের মধ্যেই কোন্নগর চলে এসেছি। আমরা বলতে স্ত্রী আর মেয়েও সঙ্গে। আজ রাতে আর ফেরার প্রশ্ন নেই। কারণ পুজো শেষ হতে মাঝরাত পেরিয়ে যাবে। আমি এই পুজো-পার্বণের খুব সমঝদার নই। মাতাজীর বিশেষ অনুরোধে আর স্ত্রীর আগ্রহে এসেছি। তাছাড়া অবধূত বলেছেন, আমিও আপনার মতোই দর্শক এ-দিন, পুজো মাতাজীর—আসবেন, আমরা না-হয় গপ্প-সপ্প করব।

এটুকু লোভনীয়।

মাতাজীর পুজোর এক বিশেষ ব্যতিক্রম দেখলাম। পুজো শুরু হবে রাত এগারোটার পরে। আমন্ত্রিতের সংখ্যা কম করে পঞ্চাশজন। পুজোর আগে সকলকেই বেশ করে খাইয়ে দিলেন। খাওয়ার আয়োজন খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু পরম উপাদেয়। পোলাও, মাছ-ভাজা, মাংস আর চাটনি। নিরামিষাশীদের পোলাও বেগুন-ভাজা ছানার ডালনা আর চাটনি। মাতাজীর যুক্তিটি সুন্দর। মায়ের পুজো, আর তাঁর ছেলে-মেয়েরা সমস্ত রাত মুখ শুকিয়ে পুজোয় অংশ নেবে—এ কি কোনো মা চাইতে পারেন? তাই সকলকেই আগে খেয়ে নিতে হবে।

অবধূত আমার কানে কানে কিছু বললেন। আমি উঠে গিয়ে একটা কথা আছে বলে মাতাজীকে একদিকে ডেকে নিয়ে বললাম, মায়ের এমন পুজোই সর্বত্র চালু হওয়া উচিত—কিন্তু পুজোর আগে সকলকে খাইয়ে আপনি নিজেও খেয়ে নিচ্ছেন তো?

হেসে ফেললেন।—আপনার বন্ধু উসকে দিয়েছেন বুঝি? আর গুণ নেই ছার গুণ আছে—কোনো অমাবস্যা বা পূর্ণিমার রাতে আমি খাই কিনা জিগ্যেস করে আসুন তো!

খেতে বসার আগে অবধূত এক প্রৌঢ় দম্পতীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ

করলেন। গলা খাটো করে বললেন, একটু খোরাক পেতে চান তো ওঁদের, বিশেষ করে ওই মহিলার ওপর নজর রাখুন—লোকের মধ্যে ওই মহিলাই কেবল আমার স্ত্রীটিকে বরদাস্ত করতে পারেন না—আবার তাঁর ভদ্রলোককে আঁচল-ছাড়াও করতে পারেন না।

বছর ছাপ্পান্ন সাতান্ন হবে ভদ্রলোকের বয়েস, আর তাঁর স্ত্রীটির হয়তো পঞ্চাশ বাহান্ন। মহিলা এককালে বেশ সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়। এখন বয়সের ছাপ একটু বেশি স্পষ্ট। সেটুকু ঢাকার প্রয়াসে পরিপাটি প্রসাধন খুব সুচারু মনে হলো না। শুনলাম তাঁরা শ্রীরামপুরে থাকেন। অবস্থাপন্ন পরিবার। মাতাজীর প্রতি ভদ্রলোকের গদ-গদ ভক্তি। তিনি একলাই শিষ্য। কারণ তাঁর পরিবারটির বুদ্ধি-বিবেচনা এ-সবের অনেক উর্ধ্বে। মাতাজীর প্রতি স্বামীর এত ভক্তিশ্রদ্ধা তিনি খুব সরল চোখে দেখেন না। তাঁর ধারণা, স্বামীর রূপের টানই বড় টান। শুধু স্বামীর কেন, পুরুষ ভক্তদের সকলেরই। নইলে আদিখ্যেতা করে কেউ এখানে দীক্ষা নিতে আসে? বিশ্বস্তজনদের এই নিগূঢ় সত্যটা তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই বিশ্বস্তজনেরা আবার কানে আঙুল দেবার মতো করে শুনে মাতাজীর গোচরে এনেছেন। তাঁদের মতে স্ত্রী যাঁর এমন, সেই শিষ্যকে মাতাজীর বাতিল করাই উচিত। অবধূতের মন্তব্য, মহিলা ষোল আনা ভ্রান্ত এ-কথা বলা যায় না। সৃষ্টির জগতে ফুলের রূপ আর রমণীর রূপে খুব তফাৎ নেই। যাকে টানার, দুই-ই টানে।

···ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আমাদের থেকে আট-দশ হাত তফাতে পাশাপাশি খেতে বসেছেন। পেটো কার্তিক আর তার বন্ধুরা যোগান দিচ্ছে। মাতাজী নিজে পরিবেশন করবেন। সেই ভদ্রমহিলা চারদিকে একবার চোখ চালিয়ে নিয়ে সকলের শোনার মতো করেই প্রশ্ন ছুঁড়লেন, মায়ের পুজোর আগে সকলকে খেয়ে নিতে হবে এটা কি কোনো শাস্ত্রের নির্দেশ না মাতাজীর নিজের নির্দেশ?

তাঁর ভদ্রলোকটি হাঁসফাঁস করে উঠলেন, মাতাজীর নির্দেশ মানেই শাস্ত্রের নির্দেশ।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মহিলা জবাব দিলেন, এত ভক্তি-বিশ্বাস তোমার থাকতে পারে—সকলের না-ও থাকতে পারে।

তক্ষুণি আর এক-দিক থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, না থাকলে আমরা খেতে বসে গেলাম কেন?

মহিলা সেদিকে তাকালেন শুধু। জবাব দিলেন না, কিন্তু তাঁর চোখের ভাষা প্রাঞ্জল। অর্থাৎ, কোন্ টানে এসে জুটেছে আর কেন খেতে বসে গেলে তা-ও বলে দিতে হবে?

এবারে আর এক মহিলা হাল্কা হেসে বললেন, শুধু আমরা কেন—আপনিও তো বসেছেন···।

ঈষৎ ঝাঁঝালো জবাব, আমি ভক্তি বিশ্বাসের কদর বুঝি না তাই অনায়াসে বসতে পেরে গেছি—কিন্তু আপনাদেরও কি তাই? জানতে কৌতূহল হলো তাই মাতাজীকে শাস্ত্রের কথা জিগ্যেস করেছি—তাতে আপনাদের আপত্তি কেন?

যাঁকে নিয়ে কথা সেই মাতাজী কিন্তু হাসছেন আর বেশ মজাই পাচ্ছেন। প্রসঙ্গ একটু তপ্ত হয়ে উঠছে মনে হতে তাড়াতাড়ি বললেন, না মা, এটা কোনো শাস্ত্রের নির্দেশ নয়, মায়ের ছেলে মেয়েরা উপোস করে মাকে ভোগ খেতে দেখবে এ আমার ভালো লাগে না বলেই এই ব্যবস্থা।

কিন্তু ভদ্রমহিলা যেন ফোঁড়ন কাটার আরো বেশি সুযোগ পেলেন।

—মাতাজীদের ব্যবস্থায় তাহলে শাস্ত্রের ব্যবস্থা বদলে যেতে পারে?

মাতাজীর সুন্দর মুখ তেমনি সপ্রতিভ।—আপনার যে গোড়াতেই একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে মা—শাস্ত্রে খেয়ে পুজোর কথাও নেই, না খেয়ে পুজোর কথাও নেই—মানুষের অভিরুচিটাই সংস্কার আর নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে। আপনি তো নিজেও সংস্কার মানেন না, তাহলে আর আপত্তিটা কি?

মুখ লাল করে ভদ্রমহিলা পোলাওয়ে হাত দিলেন। পাশ থেকে তাঁর ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কি বলছেন শুনতে পেলাম না। জবাবে মহিলা রুষ্ট নেত্রে একবার তাঁর দিকে তাকালেন শুধু।

না, রাত জেগে কালীপুজো কখনো দেখিনি। এই রাতে দেখছি। ভক্তি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছি তা নয়। মাতাজীর পুজোর নিষ্ঠা আর সাবলীল নমনীয়তাটুকুই দেখার মতো।

মাঝের মস্ত হল ঘরে পুজোর আয়োজন। দেয়ালের কাছে ছোট্ট দক্ষিণা কালীমূর্তি। সামনে নানা সরঞ্জাম, ভোগ-সামগ্রি। মাঝখানের লাল আসনে মাতাজী। তাঁর পিছনে বৃত্তাকারের প্রথম দুই সারিতে মেয়েরা বসেছেন। তাঁদের পিছনে তেমনি বৃত্তাকারে পুরুষেরা। ঘরে তিনটে আলো জ্বলছে। অবধূত খুব মিথ্যে বলেন না হয়তো। পুজো দেখতে বেশি ভালো লাগছে কি পূজারিণীকে নিশ্চয় করে বলা শক্ত। অর্চনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর ক্রিয়া-কলাপ, নড়া-চড়া, অর্ঘ্যদান সবই যেন ভারী সুললিত ছন্দে বাঁধা।

···প্রথম সারিতে শ্রীরামপুরের সেই বিগত যৌবনা রূপসী ভদ্রমহিলাও বসে। লক্ষ্য করছি মাঝে মাঝে তাঁর ঢুলুনি আসছে। পিছনে তাঁর স্বামী রত্নটি যেখানে তদগতচিত্ত বিগলিত—তাঁকে ফেলে তিনি নড়েনই বা কি করে? এক-আধবার পিছন ফিরে তাঁর ভাববিহ্বল মুখখানা দেখে নিচ্ছেন।

অবধূতের আধঘণ্টা অন্তর সিগারেটের তৃষ্ণা। তিনি উঠে উঠে যাচ্ছেন। এক-একবার আমিও তাঁর সঙ্গ নিচ্ছি। পাঁচ-সাত-দশ মিনিট দু'জনে গল্প করে আবার এসে বসছি। শেষ বারে উঠে আসার খানিক বাদে ঘণ্টা বাজার শব্দ কানে এলো। অবধূত বললেন, চলুন, এবারে আরতি হবে··· আপনার ভালো লাগবে।

গিয়ে বসলাম। পেটো কার্তিক ঘরের আলোগুলো সব নিভিয়ে দিল। দু'দিকে দুটো প্রদীপের আলো টিমটিম করছে। হল ঘর আবছা অন্ধকার। দুটো প্রদীপের আলোয় মাতাজীকেই শুধু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নিজের ডান হাতে মাতাজী বেশ খানিকটা ঘি বা তেল কি ঢেলে নিলেন জানি না। বাঁ হাতে তাতে এক-ডেলা তুলো ফেলে বেশ করে ভিজিয়ে নিলেন। তারপর সেটা ডান হাতের তালুতে রেখেই টিপে টিপে তুলোর ডেলাটাকে ছোট্ট একটা পিরামিডের আকার দিলেন। প্রদীপটা টেনে নিয়ে ডান হাতে রাখা তুলোর মাথায় আগুন ছোঁয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথার

দিকটা আর একটা প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠল। বাঁ-হাতে মাটির প্রদীপটা জায়গায় রেখে, ডান হাত মায়ের দিকে বাড়িয়ে আর বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজিয়ে এই তুলোর প্রদীপে আরতি করতে লাগলেন। সুঠাম বাহু মায়ের দিকে উঠছে নামছে ঘুরছে ফিরছে—হাতের তালুতে তুলোর প্রদীপ জ্বলে জ্বলে ছোট হচ্ছে।

আমার কেন, সকলেরই বোধহয় রুদ্ধশ্বাস। ফিসফিস করে অবধূতকে জিজ্ঞেস করলাম, কি কাণ্ড, ওঁর হাত পুড়ে যাচ্ছে না?

জবাব দিলেন, পুড়ে গেলে আর আরতি করছে কি করে?

তুলো প্রায় দেখা যায় না। এই আরতি শেষ হতে আমিই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

কিন্তু তারপরেই আবার অস্বস্তি। হাত বেশ করে মুছে নিয়ে মাতাজী তেমনি ত্রিকোণ আকারের একখণ্ড কর্পূরের ডেলা নিলেন। তাতে প্রদীপের আগুন ধরিয়ে ডান-হাতের তালুতে রেখে ঘণ্টা বাজিয়ে আবার আরতি শুরু করলেন। এ-ও দু'চোখ ভরে দেখার মতো, কিন্তু হাত সত্যিই পুড়ে যাচ্ছে না কেন ভেবে না পেয়ে আমার আতঙ্ক!

যাক, খানিক বাদে কর্পূর প্রদীপের আরতিও শেষ হলো। এরপর মিনিট দেড় দুই চামর দোলানোর মতো করে শূন্য হাতে আরতি। শেষে নিজের শূন্য হাতখানা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। খুব আস্তে আস্তে সেই শূন্য হাত আর হাতের আঙুল শঙ্খমুদ্রায় পরিণত হলো। সেই মুদ্রার শঙ্খারতি শেষে আবার এক চমক। শূন্য হাতের সেই মুদ্রা-শঙ্খ নিজের মুখে ঠেকালেন। তারপরেই গমগম করে যেন সত্যিকারের শঙ্খই বেজে উঠল। একবার নয়, দীর্ঘ রবে তিন বার। চোখ চেয়ে থেকেও কারো মনে হচ্ছে না সত্যিকারের শঙ্খ বাজছে না।

আলো-আঁধারিতে এত বড় হলঘরের বিচিত্র গম্ভীর পরিবেশ। মাতাজী ঘুরে বসে ঘট থেকে শান্তি জল ছিটোলেন। শশব্যস্তে সকলে পা ঢেকে বসেছেন। সবশেষে প্রদীপের আশিস সকলের মাথায় ছোঁয়ানো। এক-হাতে প্রদীপ নিয়ে অন্য হাতের তালু তার শিখার ওপর ধরে মাতাজী সেই

হাতখানা এক-একজনের মাথায় রাখছেন। মেয়েরা সামনে। অতএব তাঁদের মাথাতেই আগে।

...কিন্তু প্রদীপ শিখায় তপ্ত হাত শ্রীরামপুরের সেই ভদ্রমহিলার মাথায় রাখতেই এমন এক কাণ্ড ঘটল যা আমি জীবনে ভুলব না। ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন, কি হলো। কি হলো। আমার কি হলো।

তারপরেই পাশের মহিলাদের কোলে ঢলে পড়লেন। প্রথমে হতভম্ব বিমূঢ় সকলে। তারপরেই মাতাজীর তৎপর হাতের শুশ্রূষা। পুজোর ঘটি থেকে জল নিয়ে তাঁর চোখে মুখে জোরে জোরে কয়েকটা ঝাপটা দিলেন।

একটু বাদে ভদ্রমহিলা চোখ মেলে তাকালেন। পেটো কার্তিক ততক্ষণে হলঘরের সব আলো জ্বেলে দিয়েছে। মাতাজী তাঁর মুখের সামনে ঝুঁক-লেন।—কি হয়েছে?

ভদ্রমহিলার চোখে মুখে আতঙ্ক। মাতাজীর দিকে চেয়ে আছেন। আরো দু'বার জিগ্যেস করতে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। ভয়ার্ত গলায় বললেন, আপনি মাথায় হাত রাখতেই আমার ভিতরে মনে হলো বিদ্যুতের মতো কিছু যাচ্ছে। বলেই উপুড় হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

অবধূত আর আমি সামনের বারান্দায় বসে। প্রথমে জিগ্যেস করলাম, আপনার স্ত্রী এ-রকম আরতি শিখলেন কার কাছে?

জবাব দিলেন, জিগ্যেস করিনি কখনও...কংকালমালী ভৈরবের কাছ থেকেই হবে।

আবার জিগ্যেস করলাম, শেষে ওই ভদ্রমহিলার ব্যাপারখানা কি হলো?

হাসলেন।—কি হলো আমিও তো আপনার মতোই দেখলাম।...কিন্তু কেন হলো? কি করে হলো? কে এমন ব্যাপারখানা করালো?

পরদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার আগে আমি স্ত্রী আর মেয়ে ছাড়া পাইনি। তাই জেরার সুযোগ পেয়েছি। কল্যাণী দেবীকে ডেকে প্রথমে বলেছি, আপনার ডান হাতখানা দেখি?

হাসি মুখে তিনি ভালো হাত আমার দিকে প্রসারিত করলেন।—হাত-টাত

দেখা শুরু করলেন নাকি ?

অবধূত টিপ্পনী কাটলেন, কেবল মেয়েদের হাত দেখবেন ঠিক করেছেন উনি, তোমাকে দিয়ে শুরু করছেন।

হাতে কোনোরকম পোড়া দাগের চিহ্নও নেই। লালচে কর-পদ্মকমল। বড় নিশ্বাস ফেলে হেসে বললাম, হাত দেখার শেষও ওঁকে দিয়েই করব।···

এবারে বলুন, শ্রীরামপুরের ওই ভদ্রমহিলার এ কি কাণ্ড হলো ?

হাসতে লাগলেন।—আপনি তো মনস্তত্ত্ববিদ লেখক—আপনিই বলুন না কি কাণ্ড হলো ?

—আমার মনস্তত্ত্বের বিদ্যে অতদূর পৌঁছচ্ছে না। আপনি বলুন—

হাসি মুখে যে ব্যাখ্যা দিলেন তা অগ্রাহ্য করার মতো নয়। বললেন, মানুষের মন সবল হতে সময় লাগে, দুর্বল সহজেই হয়। পুজোর সময় এতগুলো মানুষের তন্ময়তার প্রভাবও কিছু আছেই। এই প্রভাতে মন যত দুর্বল হয়েছে, নিজের ভিতরের অপরাধ-বোধ ততো বেড়েছে। এই অবস্থায় স্নায়ু তো স্পর্শকাতর হতেই পারে। আমি মাথায় হাত রাখতে নিজের স্নায়ুর সঙ্গে নিজেই আর যুঝতে পারেননি, এতে আমার কোনো কেরামতির ছিটে-ফোঁটাও নেই।

উনি স্ত্রী আর মেয়ের কাছে চলে যেতে অবধূত হাসি মুখে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, কি হলো ?

—কিছু হলো না। আমার সেই এক কথা···ওঁর কোনো কেরামতি নেই, কোনো ব্যাপারে আমাদের কারো কোনো কেরামতি নেই···কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে একেবারে কারোরই কি নেই ? কেন এমন হয়···কে করে···কে ঘটায় ?

এ-রকম কথা অবধূতের মুখে অনেকবার শুনেছি। এ নিয়ে আমি কোনো আলোচনার মধ্যে ঢুকিনি। কারণ আমার ধারণা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ-ও এক ধরনের ঈশ্বর স্তুতি—শক্তির স্তুতি।

মাস দেড়েক পরের কথা। এর মধ্যে আর কোন্নগর যাওয়া হয়নি। রাত

প্রায় সাড়ে ন'টার সময় হন্ত-দন্ত হয়ে পেটো কার্তিক আমার বাড়িতে হাজির। আমি তখন খেতে বসার উদ্যোগ করছি।

কলকাতা এলে পেটো কার্তিক আমার বাড়িতে একবার ঢুঁ দিয়ে যায়ই—আর খাওয়া-দাওয়া করে যেতে বললে এক-কথায় রাজি হয়ে যায়। কিন্তু রাতে কখনো আসেনি।

—কি ব্যাপার? এত রাতে তুমি!

—বাবা পাঠালেন, কাল সকালের প্রথম ট্রেনে আমাকে নিয়ে যেতে হবে—

ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।—কেন? বাবার কি হয়েছে? আর ট্রেনেই বা কোন্নগরে যেতে হবে কেন?

সর্বদা আমি নিজের গাড়িতেই গিয়ে থাকি এটা অবধূত জানেন।

আমাকে এমন উতলা হতে দেখে পেটো কার্তিক অপ্রস্তুত একটু।—না না, বাবার আবার কি হবে—উনি বহাল তবিয়তে আছেন—কোন্নগরে নয়, সকালের প্রথম ট্রেনে আপনাকে নিয়ে যাব তারকেশ্বরে—ছ'দিন যাবত বাবা সেখানেই আছেন, এই নিন বাবার চিঠি।

কয়েক লাইনের চিঠি।...ঘটনার সাজানো আসরে আমার ভূমিকার সব থেকে তাজ্জব নজির দেখতে চান তো চলে আসুন। আশা করি পস্তাবেন না। দিন চারেক সময় হাতে নিয়ে আসবেন। অবশ্যই আসুন।—অবধূত।

আমি অবাক।—চার দিনের সময় নিয়ে যেতে বলছেন...কি ব্যাপার বলো তো? দৈব কিছু নাকি?

পেটো কার্তিকের সপ্রতিভ জবাব, দেবতা সহায় যখন বাবার তো সর্ব ব্যাপারই দৈব...কিন্তু বাবা তো চার দিনের কথা আমাকে কিছু বলেন নি—ওনার কি আরো চারদিন সেখানে পড়ে থাকার মতলব নাকি!

জিগ্যেস করলাম, তোমাদের মাতাজীও তারকেশ্বরেই নাকি?

—না, তিনি কোন্নগরে, তারকেশ্বরে কেবল আমি আর বাবা।

একসঙ্গে খেতে বসে এ-ভাবে ডাকার কারণ বুঝতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু

দেখা গেল পেটো কার্তিক কিছুই জানে না। পুণ্যার্থীদের ভিড় আর কিছু মেয়ে-পুরুষের ভোলে বাবার থানে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা ছাড়া তার বিশেষ আর কিছুই চোখে পড়েনি।

—তাহলে দু'দিন ধরে তোমাদের বাবা কি করছেন?

—খাচ্ছেন-দাচ্ছেন আর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজ বিকেলের দিকে একটু ব্যস্ত দেখলাম, এই চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে সকালের মধ্যে আপনাকে ধরে আনার জন্য পাঠালেন।

ড্রাইভার ছেড়ে দিয়েছি। অত সকালে তাকে আসতেও বলিনি। খুব ভোরে পেটো কার্তিকই ট্যাক্সি ধরে আনলো। হাওড়া স্টেশনে এসে ছ'টার গাড়ি ধরলাম। পেটো কার্তিককে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটার টাকা দিয়েছিলাম। কথায় সময় নষ্ট না করে চার-চার আট টাকা দিয়ে দুটো সাধারণ ক্লাসের টিকিট কেটে বাকি টাকা আমাকে ফেরত দিল। বলল, শেওড়াফুলির পর থেকেই এটা ভোলে বাবার গাড়ি হয়ে যায়, তখন ফার্স্ট ক্লাস থার্ড ক্লাস সমান—মিথ্যে অর্থদণ্ড দেবেন কেন।

যা-ই হোক, গাড়ি মোটামুটি ফাঁকাই। তারকেশ্বর যাত্রীর মৌসুম নয় এটা। জানলার ধারে দু'জনে মুখোমুখি বসে চলেছি। খানিক বাদে যাত্রীর ভিড় বাড়তে লাগল। হরেক রকমের বেসাতি নিয়ে গাড়ির মধ্যে হকারের উৎপাতও কম নয়। উঠছে, কলে দম দেওয়ার মতো করে গড়-গড় করে লেকচার দিচ্ছে—গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে খেয়ে বেসাতি দেখাচ্ছে। কামরায় এক একবার এক-জোড়া দেড়-জোড়া করেও হকার উঠছে। একজন থামলে অন্যজন তৎপর।

পেটো কার্তিক দেখলাম অনেক কিছুই কিনে ফেলল। লিমন লজেন্স, রং পেন্সিল, চিরুনি, চাবির রিঙ, চটি বই, বাচ্চাদের মজাদার খেল্না, ছোট রঙিন পিকচার অ্যালবাম, টুকিটাকি আরো কিছু। মনে মনে বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করলাম, এ-সব দিয়ে কি হবে, তোমার হাত আর পকেট যে বোঝাই হয়ে গেল।

লজ্জা পেয়ে জবাব দিল, কিছু হবে না, তারকেশ্বরেই বিলিয়ে দেব।···

ব্যাপার কি জানেন, লোকগুলো কি ভীষণ গরীব, সমস্ত দিন গলাবাজী করে এক একটা জিনিস বিক্রি পিছু বড়জোর দু'চার পয়সা পায়। দিনের শেষে যা ওঠে তাই দিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে আধ-পেটা খেয়ে সংসার চালায় —ওদের দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়, তাই না কিনে পারি না।

এবারে আমি লজ্জা পেলাম ?···বোমাবাজী করা এই ছেলের বুকের ভেতরটা কি অবধূতই এমন সোনা করে দিয়েছেন ?

অবধূত যেখানে আছেন, স্টেশন থেকে সাত আট মিনিটের হাঁটা পথ। তিন ঘরের ছোট এক-তলা বাড়িতে আর দ্বিতীয় প্রাণী দেখলাম না। এখানকার আপাত বাসিন্দা কেবল তিনি আর পেটো কার্তিক। আমাকে দেখে সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি—

ছোট সুটকেসটা নামিয়ে রেখে বললাম, এ-ভাবে ডেকে পাঠানোর কৈফিয়ত দাখিল করুন আগে—আমার তর সইছে না।

হাসছেন।—কি দিন-কাল বুঝুন—উপকার করতে চাইলেও কৈফিয়ত দাখিল করতে হবে···।

—উপকার মানে কার উপকার ?

—আপনাকে যখন ধরে এনেছি আপনার ছাড়া আর কার!

—কি উপকার ?

—উপকার নয় ? আপনার লেখা যখন ছাপার অক্ষরে বই হয়ে বেরুবে আমাকে কি তার রয়েলটির ভাগ দেবেন ?

থমকালাম। এক বছর ধরে মগজে যে-রূপ আকার নিচ্ছে তার পরিণাম এ-ই বটে। কিন্তু মুখ ফুটে কোনোদিন তা ব্যক্ত করা দূরে থাক—আভাসও দিইনি। অবশ্য, এক বছর ধরে এঁর সঙ্গে লেগে আছি, মতলব বোঝা এই চতুর মানুষের পক্ষে খুব কঠিনও নয়।

হেসেই বললাম, তা বলে সব জায়গা ছেড়ে এই তারকেশ্বরে তলব কেন ?

—ক্লাইম্যাক্সের খোঁজে লেখকরা জল জঙ্গল বন-বাদাড় মরুভূমি কত জায়গায় ছোটে—সে-তুলনায় তারকেশ্বর তো ভালো জায়গা মশাই!

আবার থমকালাম। অবধূতের কোনো কথা কখনো তাৎপর্যশূন্য মনে হয়নি আমার। পেটো কার্তিক আমাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে আর এগোলাম না। তাঁর সংক্ষিপ্ত চিঠির প্রথম ছত্র মনে পড়ল—'ঘটনার সাজানো আসরে আমার ভূমিকার সব থেকে তাজ্জব নজির দেখতে চান তো চলে আসুন।'

অতএব বুদ্ধিমানের মতো অপেক্ষা করাই ভালো।

অবধূত জিগ্যেস করলেন, চা-টা কিছু খাওয়া হয়নি তো?

—চা হয়েছে, টা হয়নি। কিন্তু এখানে তো আর কাউকে দেখছি না, এটা কার বাড়ি?

—এক ভক্তকে দিন-কয়েকের জন্য থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে বলে-ছিলাম, সে-ই জুটিয়ে দিয়েছে।···আপনি স্নান সেরে নিন, সকাল ন'টার মধ্যে আমাদের স্টেজে হাজির হতে হবে—কার্তিক, তুই হোটেলে গিয়ে আমাদের ব্রেকফাস্ট রেডি করতে বল্।

পেটো কার্তিক চলে গেল। জিগ্যেস করলাম, স্টেজ বলতে?

হাসছেন।—এই নাটকখানা হচ্ছে রিভলভিং স্টেজে। প্রথম ঘটনার মঞ্চ সমস্তিপুর-দ্বারভাঙার-কাঁকুড়ঘাটি, সেটা ঘুরে কাঁকুড়ঘাটির মহাশ্মশানে—পাঁচ বছর বাদে এবার সেটা ঘুরে বাবা তারকনাথের মন্দিরে। ব্যস্ত হবেন না, চান সেরে আসুন—

বেশ আগ্রহ নিয়েই স্নান সেরে প্রস্তুত হলাম। অবধূত অযথা বাগাড়ম্বর করেন না। আশা, সে-রকম কিছুই দেখব শুনব বা জানব।

ছ'সাত মিনিটের হাঁটা পথে মন্দির। কাছেই এখানকার সব থেকে বড় যে আমিষ হোটেল তার নাম অন্নপূর্ণা হোটেল। দেখলাম, বড় শুধু নয়, বেশ পরিচ্ছন্নও। কার্তিক সেখানেই অপেক্ষা করছে। হোটেলের মালিক অব-ধূতকে খুব খাতির করে বসালেন। বেশ ভারী প্রাতরাশই রেডি দেখলাম। অবধূত বললেন, ভালো করে খেয়ে নিন, আবার কখন জুটবে বলা যায় না—

—কেন?

সহাস্য জবাব, নাটকের নিয়ন্তা তো আর আমি নই মশাই, আর্টিস্টের হাজিরার অপেক্ষায় এখানে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে কি তিন-চার ঘণ্টা, জানব কি করে ?

খাবার ফাঁকে পেটো কার্তিক আবার মন দিয়ে তার বাবার মুখখানা দেখছে। মনে হয় কিছু একটা রহস্যের গন্ধ সে-ও পাচ্ছে। অতএব আমি যথাসম্ভব নির্লিপ্ত।

খাওয়া শেষ হতে অবধূত একেবারে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে বেরুলেন। যখনই আসুন, খাবার গরম চাই। ভাত ডাল বেগুনি মাছ মাংস চাটনি দই পেলে ভদ্রলোক আর কমের দিকে যাবেন কেন।

বেরিয়ে আমরা মন্দিরের দিকে চললাম। পিছনে পেটো কার্তিক। সে আর এখন আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না জানা কথাই।

মন্দিরে আর চত্বরে মেয়ে পুরুষের গিসগিস ভিড়। তাদের নিয়ে পুরুত-পাণ্ডারা তৎপর। সকলে যেন বিষম কিছু তাড়া খেয়ে এখানে এসেছে। কাকে ঠেলে কাকে ফেলে যেমন ভিতরে যাওয়ার তাগিদ, তেমনিই আবার বেরিয়ে এসে বাঁচার তাগিদ। আমার আতঙ্ক, তিন মাস ছ'মাসের বাচ্চা নিয়েও কিছু মেয়েছেলে ভিতরে ঢুকেছে, মনে হয়েছে পুণ্যির তাগিদে ওদের পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। বললাম, চলুন, ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়াই, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

অবধূত জবাব দিলেন না। মনে হলো ভিড়ের মধ্যে তাঁর দু'চোখ কিছু খুঁজছে বা কাউকে খুঁজছে। পায়ে পায়ে দুধকুণ্ডের দিকে তিনি এগিয়ে চললেন। দুধকুণ্ড বলতে মন্দিরের গায়ের বিশাল পুকুর। সেখানে মেয়ে পুরুষের স্নানের সমারোহ। বছর চৌদ্দ পনেরো আগে একবার তারকেশ্বরে এসে-ছিলাম। তখন এই পুণ্য-পুকুরের জলে হাত দিতেও ঘেন্না করত। পুকুরটার আমূল সংস্কার হয়েছে, পরিষ্কার টলটলে জল।

অবধূত স্নান-রত মেয়ে পুরুষদের একবার দেখে নিয়ে বললেন, এত ভিড়ে আসবে না জানা কথাই, আসুন আমাদের এই দুধকুণ্ডের কাছাকাছি অপেক্ষা করতে হবে।

…অবধূত এধার-ওধার পায়চারী করছেন, একের পর এক সিগারেট ধরাচ্ছেন। পুণ্যার্থী-পুণ্যার্থীনীদের অনেকেই তাঁকে লক্ষ্য করছে। কেউ কেউ বা দু'হাত জুড়ে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে। রক্তাম্বর-পরা সাধু-সন্ন্যাসী এখানে আরো চোখে পড়েছে। শুধু পরিচ্ছদে নয় ভিতরেও যেন তাঁরা বিবর্ণ মলিন। দেখলেই মনে হয় প্রাপ্তির আশাটুকুই তাদের বড় আশা। এঁদের মধ্যে সিল্কের লাল চেলি, সিল্কের টকটকে লাল ফতুয়া আর তেমনি সিল্কের লাল উত্তরীয় পরা কালীকিংকর অবধূত ঝকঝকে ব্যতিক্রম। তাঁর এই ব্যক্তিত্ব আর চাল-চলন দেখার মতো সন্দেহ নেই। পাণ্ডারাও অনেকে নত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছে।

আমার ভিতরটা কৌতূহলে টই-টম্বুর। বাইরে ওই অবধূতের মতোই শান্ত থাকতে চেষ্টা করছি, মন্দিরের সামনের বাঁধানো মণ্ডপের মেঝেতে অনেক মেয়ে পুরুষ হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। তাদের বেশির ভাগেরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। শুনলাম চার-পাঁচ সাত-আট দিন ধরেও অনেকে এমনি হত্যা দিয়ে পড়ে আছে। মাঝে-সাজে বাবার চরণামৃত ছাড়া আর কিছু মুখে ছোঁয়ায় না। এ-দৃশ্য দেখে বুকের ভেতরটা থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে। শুনেছি কেউ কেউ এরা বাবা তারকনাথের আদেশ পায়। পেলে মুশকিল আসানও নাকি হয়।…আমিও অনেক হারিয়েছি। বুকের তলার এই বিশ্বাসের ঠাঁই হলে কি সেই সংকট এড়ানো যেত? জানি না। শুধু এটুকু জানি, আমার দ্বারা এ-ভাবে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকা কোনো-দিন সম্ভব হতো না। কারণ এই বিশ্বাসের পুঁজি আমার নেই।

…ঘড়ি দেখলাম। বেলা এগারোটা বেজে গেছে। এখনো বেশ ভিড়, কিন্তু আগের তুলনায় কম। একটু বাদে দেখি অবধূত আমাকে আঙুলের ইশারায় ডাকছে। কাছে যেতে চাপা গলায় বলেন, ঘাটের এ-দিকটায় সবে এসে লক্ষ্য করুন, আমরা যার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে সে ওই আসছে…। খুব ভাল করে দেখে যান।

তাঁর ইশারা-মতো আমি ফিরে তাকালাম। ঘাটের দিকে আসছে একটি মেয়ে। বছর ছাব্বিশ-সাতাশ হবে বয়েস। বাঙালী নয়। ভারী সুন্দরী।

ধপধপে ফর্সা রং, লম্বা, নিটোল স্বাস্থ্য। পাতলা শাড়ির ওপরে কাঁধে বুকে জড়ানো একটা গামছা আর কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত জড়ানো আর একটা গামছা। তার মানে আদুড় গায়ে শুধু শাড়ি পরে তাব ওপর ও-ভাবে দুটো গামছা জড়িয়ে স্নানে আসছে। আসতে আসতে চার-দিকে তাকাচ্ছে। মনে হলো, আকৃতি-মাখা উদভ্রান্ত চাউনি। তাব সঙ্গে একটি মাঝবয়সী মেয়েছেলে। পরিচারিকা হবে। আর, বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে আধা ভদ্রলোক গোছের একজন অবাঙালী পুরুষ। একজন পাণ্ডা শশব্যস্তে তাদের সঙ্গে আসছে। মেয়েটির গায়ে কোনো গয়না, এমন কি হাতে কাচের চুড়িও নেই। তবু দেখামাত্র মনে হয় অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে বা বউ হবে। পাশে তাকিয়ে দেখি অবধূত নেই। মন্দিরের পিছনের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন। আমি ভেবে পেলাম না, উনি ওখানে গিয়ে আড়াল নিলেন কিনা।

মেয়েটি ধীরে ধীরে ঘাটের সিঁড়ি কটা পার হয়ে আগে দুধ কুণ্ডের জল হাতে তুলে নিজের কপালে মাথায় ছিটিয়ে দিল। তারপর এক-পা এক-পা করে নেমে কোমর জলে দাঁড়ালো। সঙ্গের পরিচারিকাও জলে নেমেছে। লক্ষ্য করলাম, সিঁড়ির এক-পাশে দাঁড়ানো লোকটির হাতেও কোনো শুকনো বসন নেই। অর্থাৎ স্নানের পর অনুষ্ঠান যদি কিছু হয় তো ভিজে কাপড়েই হবে।

স্নান সেরে পরিচারিকা পাঁচ-সাত মিনিটেব মধ্যে উঠে পড়ল। তার গায়ে পিঠেও একটা বড় গামছা জড়ানো। সঙ্গের লোকটিকে ইশারা করতে পাণ্ডাকে নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

মেয়েটি স্নান করছে। উঠছে, ডুব দিচ্ছে। ডুব দিচ্ছে, উঠছে। না, স্নান-বিলাস আদৌ নয়। কিছু একটা তন্ময়তায় বিভোর যেন। গুনিনি, গুনলে হয়তো দেখতাম শতেকের ওপর ডুব দেওয়া হয়েছে। পর পর ডুব দিয়ে যাওয়া নয়। একবার ডুব দিচ্ছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে, মন্দিরের দিকে ফিরে দু'চোখ বুজে স্থির কয়েক মুহূর্ত—তারপর আবার ডুব দিচ্ছে।

এই স্নান দেখতে এরই মধ্যে ঘাটে বেশ ভিড় হয়েছে দেখলাম। রূপসী

যুবতী রমণীর এই স্নান অনেকের চোখের ভোজ তো বটেই। পৃথিবীর কোনো গীর্জা বা মন্দির মসজিদ কি প্রবৃত্তির নিবৃত্তি আনতে পেরেছে? উল্টে যেখানে যত বেশি সমর্পণ সেখানে ততো হাঙর-কুমিরের আমন্ত্রণ।
মেয়েটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জল পেরিয়ে প্রথম ধাপে উঠে দাঁড়ালো। দুটো গামছা সিক্ত-বসনা এই রমণীর যৌবন আবৃত করে রাখার মতো যথেষ্ট নয় আদৌ। পরনের ভেজা শাড়ি আর গামছা দুটো দুধ-বরণ অঙ্গে লেপ্‌টে যাওয়ার ফলে সর্ব অঙ্গের যৌবন আরো স্পষ্ট, আরো মুখর। জোড়া জোড়া চক্ষু ওই রমণী অঙ্গে বিদ্ধ।
কিন্তু রমণীর কারো দিকে চোখ নেই। এমনি আত্মস্থ তন্ময় যে পারিপার্শ্বিক লোভাতুর জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।
…কিন্তু দর্শকের দৃষ্টি ভোজের আরো অনেকটাই বাকি তখনো।
পরিচারিকা এগিয়ে গিয়ে তার হাতে ভিজে মাটির ঢেলার মতো কি একটা দিল। সেটা হাতে নিয়ে রমণী আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে উপুড় হয়ে বুকের ওপর শুয়ে পড়ে দু'হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে যুক্ত করল। সিঁড়ির মেঝেতে কপাল রেখে হাত দুটো যে পর্যন্ত পৌছুলো সেখানে মাটির ঢেলা দিয়ে একটা দাগ কাটল। এরই নাম দণ্ডি-কাটা। উঠে সেই দাগের ওপর দাঁড়িয়ে আবার বুকের ওপর শুয়ে দু'হাত টান করে দণ্ডি কাটল। এমনি বার তিনেক দণ্ডি কাটতে সিঁড়ি শেষ। এবার সে সমান মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে। আবার উপুড় হয়ে বুকের ওপর শুয়ে দণ্ডি কেটে কেটে মন্দিরের দিকে এগোতে লাগল। অনেক দর্শক ঘাটেই দাঁড়িয়ে, অনেকে আবার রমণীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে। রমণী তখনো জগৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ, উদাসীন।
মন্দিরের রেলিং পর্যন্ত আসার পর তেমনি দণ্ডি কেটে কেটে বাঁদিক-থেকে বেষ্টন প্রদক্ষিণ শুরু হলো।…হাঁটুর ওপর বসছে, বুকের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ছে, দু'হাত যতদূর যায় বাড়িয়ে দিয়ে যুক্ত করছে, মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে কয়েক পলক স্থির হয়ে পড়ে থাকছে, মাটির ঢেলায় দণ্ডির দাগ দিচ্ছে, উঠে দাঁড়িয়ে সেই দাগে পৌছে আবার শুরু করছে।

অবধূত এদিকেই দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এখন নেই।

দণ্ডি কেটে সমস্ত মন্দির প্রদক্ষিণ প্রায় শেষ হয়ে এলো। দণ্ডি কাটতে কাটতে রমণী মন্দিরের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।···দরজার কাছে অবধূত দাঁড়িয়ে। প্রসন্ন প্রশান্ত মুখ।

রমণী দোরগোড়ায় পৌঁছুলো। পাণ্ডা আর তার পাশের সেই লোকও দাঁড়িয়ে। পাণ্ডার হাতে মস্ত একটা পুজোর ডালি। তাদের সামনে আরো জনাকতক পাণ্ডা। দু'দিক থেকে তারা পুণ্যার্থীর ভিড় সামলে রাখছে। মন্দিরের ভিতরেও কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বাবা তারকনাথকে দর্শন এবং স্পর্শনের এই স্পেশ্যাল ব্যবস্থা হয়তো রমণীর টাকার জোরে হয়েছে। নইলে পাঁচ সাত মিনিটের জন্যে হলেও এত খাতির কারো পাওয়ার কথা নয়। দরজার সামনেই পাণ্ডারা ছাড়া আর দাঁড়িয়ে কেবল অবধূত। শুধু তাঁকেই তারা বাধা দিচ্ছে না বা সরে যেতে বলছে না।

শেষ দণ্ডি কাটা হতেই মন্দিরের দরজা। উঠে দাঁড়িয়েই টকটকে লাল ধুতি ফতুয়া পরা আর তেমনি চাদর গায়ে অবধূতকে সামনে দেখে রমণী চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো কয়েক পলক। তারপর আমার মনে হলো, হঠাৎই একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সে তার পায়ে আছড়ে পড়তে যাচ্ছে!

কিন্তু তার আগে একখানা হাত তুলে অবধূত বাধা দিলেন। রমণী থমকে দাঁড়ালো। আমার মনে হলো আশা উৎকণ্ঠা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। পাণ্ডারা আর অদূরে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে তারাও বিমূঢ় বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখছে।

অবধূত এবারে দু'হাত দরজার দিকে বাড়িয়ে মন্দিরের দরজা দেখিয়ে পরিষ্কার হিন্দীতে বললেন, যাও—আগে বাবার পুজো দিয়ে এসো।

রমণী দিশেহারার মতো ভিতরে ঢুকে গেল। পিছনে তার পরিচারিকা, পুজোর ডালি হাতে পাণ্ডা আর পুরোহিত। একটু বাদে পুজো শেষ করে রমণী ব্যগ্র মুখে ফিরে এসে আবারও অবধূতের পায়ে পড়তে গেল। অবধূত আবার বাধা দিলেন। গম্ভীর অথচ নরম গলায় স্পষ্ট হিন্দীতে

বললেন, এখানে না, ব্যস্ত হয়ো না, তুমি যে-জন্য এসেছ—পাবে। ভেজা জামা-কাপড় বদলে তোমার চটির ঘরেই অপেক্ষা করো—আমি আসছি।

রমণী স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে। অবধূত ফিরে চললেন। হঠাৎই আত্মস্থ হয়ে রমণী সেখান থেকে ছুটে বেরুতে চাইলো। সঙ্গে তার পরিচারিকা আর পুরুষটিও।

সে যে-দিকে গেল তার উল্টোদিকের রাস্তার বাঁকে প্রশান্ত মুখে অবধূত দাঁড়িয়ে। আমি কাছে যেতে হাসলেন একটু। বললেন, চলুন, আগে এক পেয়ালা করে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

বেলা তখন বারোটা বেজে গেছে। কাছেই একটা চায়ের দোকানে ভাঁড়ের চা খেলাম। পেটো কার্তিক আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। সে-ও হাজির। তারও চোখে মুখে আগ্রহ উপচে পড়ছে। তার বাবার ক্ষমতার সে যেন তল-কূল পাচ্ছে না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অবধূত এক-দিকে এগোলেন। আমি পাশে। অবধূত বললেন, এবারে নাটকের পরের দৃশ্য দেখবেন চলুন।

—কিন্তু এই দৃশ্যই তো ভালো করে বুঝলাম না।...মেয়েটি কে?

—পার্বতী প্রসাদ।

—কোথাকার মেয়ে?

—সমস্তিপুর-দ্বারভাঙার কাঁকুড়ঘাটির।

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছি।—এখানে কবে এসেছে?

—কাল বিকেল তিনটেয় দুধপুকুরে স্নান করে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে দেখলাম...কালই এসেছে।

—আপনি জানতেন মেয়েটি আসবে?

অবধূত হাসলেন।—না জানলে কোন্নগর ছেড়ে আমি আগে থাকতে এখানে এসে বসে আছি কেন? আগে এসে পাণ্ডা আর পুরুতদের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি—তাদের বলেছি, বাবার আদেশ পেয়ে একজন বড় ঘরের বিশিষ্ট অবাঙালী মহিলা বিহার থেকে এখানে আসছেন —আর বাবার আদেশে আমারও এখানে আসা। মহিলা যেন নির্বিঘ্নে

তাঁর কাজ আর পুজো দিতে পারেন—কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে—তিনি এমনিতেই সকলকে অনেক দিয়ে যাবেন। মনে মনে ভাবলাম, প্রাপ্তির আশা ছাড়াও কালীকিংকরের এই ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা বা অবহেলা করার মতো পুরুত বা পাণ্ডা এখানে বোধহয় নেই।

একটা মস্ত পুরনো দালানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এটাই এখানকার সব থেকে বড় যাত্রীনিবাস বোধহয়। নিচের তলাটা নোঙরা। সিঁড়ি ধরে আমরা দোতলায় উঠতে লাগলাম। সেই পরিচারিকা এবং পুরুষটি ছুটে এলো। হাত জোড় করে দু'জনে এক-সঙ্গে বলে উঠল, আইয়ে মহারাজ, আইয়ে—

দোতলার কোণের দিকে একটা ছোট্ট ঘর। যাত্রী নিবাসের সব ঘরই এমনি ছোট ছোট। মেঝেতে চাটাইয়ের ওপর একটা সুন্দর পুরু গালচে পাতা। এটার মালিক ঘর যার অধিকারে সেই, বোঝা যায়। যাত্রী নিবাসে চাটাই ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় না। ঘরের কোণে ছোট বড় দুটো সুটকেস, সুটকেসের ওপর চকচকে একটা হোল্ড অল ভাঁজ করা।

সেই রমণী উদগ্রীব মুখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। পরনে চওড়া কালো-পেড়ে সাদা জমিনের শাড়ি, গায়ে সাদা ব্লাউস—আধ-ভেজা চুল পিঠে ছড়ানো। রমণীর শুচি সুন্দর আর এক রূপ। প্রত্যাশা আর উৎকণ্ঠায় ফর্সা মুখ লাল।

অবধূতকে দেখেই সসম্ভ্রমে কয়েক পা পিছনে সরে গেল। তিনি ভিতরে এসে দাঁড়াতে দুই পায়ের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। শুভ্র দুই বাহুতে পা দুটো জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

—আপ হি বাবা তারকনাথ হ্যায়, মিলা দিজিয়ে প্রভুজী—মিলা দিজিয়ে—

গম্ভীর গলায় অবধূত বললেন, মুঝে ভি বাবা তারকনাথ ইহাঁ ভেজা—ম্যায় উনকো দাস হুঁ—রো মাত্ পার্বতী, উঠো—জরুর মিল জায়গা।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসল, কিন্তু দু'হাতে পা দুটো ধরাই থাকল। এই লোকের মুখে নিজের নাম আর যে আশার কথা শুনল দুইই বোধহয় এমন চমকের কারণ। কোনো রমণীর চোখেমুখে এমন আর্তি এমন করুণ

আকূতি আর দেখিনি !

হিন্দীতে কথা বেশিরভাগ অবধূতই বললেন। উনি এমন পরিষ্কার হিন্দী বলতে কইতে পারেন জানা ছিল না।

—তুমি পার্বতী প্রসাদ তো ?

—হাঁ প্রভুজী…!

—রতনলালের মেয়ে ?

—হাঁ প্রভুজী—হ্যাঁ !

—রতনলালবাবু কোথায় এখন ?

একবার ওপরের দিকে চেয়ে জবাব দিল, পিতাজী গুজর গয়া মহারাজ…।

—কত দিন হলো মারা গেছেন ?

—দো মাহিনা…।

—আর বেনারসীলাল ? সে কোথায় ?

কোনো রমণীর মুখে বিস্ময়ের এমন কারুকার্যও কি আর দেখেছি ! ফ্যাল-ফ্যাল করে একটু চেয়ে থেকে জবাব দিল, উও তো বহুত দিনসে কোই জেল্ মে হোগা…এক খুন কা আসামী বন্ গয়ে থে…উন্‌কা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হো চুকা।

নিজের দু'হাত জোড় করে একবার কপালে ঠেকালেন অবধূত। গলার স্বর আরো গম্ভীর, গভীর।—তোমার বাবা বা বেনারসীলাল নাগালের মধ্যে পেলে তোমার ছেলে বাঁচত না—এই জন্যেই তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বাবা তারকনাথ তাকে রক্ষা করেছেন…আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ ?

অবধূতের চাউনিতে সত্যিই কি জাদু আছে ! উত্তেজনা উৎকণ্ঠা আকূতি ভুলে পার্বতী তাঁর দিকে চেয়ে আছে। সামান্য মাথা নাড়ল। বুঝতে পারছে। অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, লেকিন মেরা বচ্চা কাঁহা ? আপ্ কওন্ ?

—আমি বাবা তারকনাথের দাস। তোমার ছেলে ভালো আছে। নিজের রিস্ট ওয়াচের ব্যাণ্ডে গোঁজা দুটো কাগজের টুকরো বার করলেন অবধূত।

একটার ভাঁজ খুলে সামনে ধরলেন।—তোমরা আজই কলকাতায় গিয়ে রাতের গাড়িতে নিজের মুলুকে চলে যাও। সেখান থেকে বারো মাইল দূরের এই গ্রামে গিয়ে এই ঠিকানার মানুষদের কাছে যাবে। কাগজটা পার্বতীর হাতে দিয়ে দ্বিতীয় কাগজটার ভাঁজ খুললেন। আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে দেখলাম ওটা একটা পাঁচ টাকার নোটের আধ-খানা। ঠিক আধখানা করে কেটে নেওয়া। সেটাও বিমূঢ় পার্বতীর হাতে দিয়ে বললেন, গাঁয়ের সেই বাড়ির মালিক বা মালকানের হাতে এটা দেবে। তারা বাকি আধখানা নোটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তোমার ছেলে দিয়ে দেবে।···সেই ছেলের গলায় লাল সুতোয় বাঁধা একটা সোনার লকেট দেখতে পাবে। সেটা ভাঙলে তার মধ্যে তোমার ছেলের জন্মের তারিখ পরিচয় সব পাবে। কিছু খেয়ে আজই যাবার জন্য তৈরি হয়ে নাও।

শুধু পার্বতী নয়, আমরাও চিত্রার্পিত। অবধূত ফিরে দাঁড়াতে পার্বতীরই প্রথম হুঁশ ফিরল। দু'হাত জোড় করে আকুল গলায় বলে উঠল, কৃপা করকে আপ সাথ চলিয়ে মহারাজ···মুঝে বহুত্ ডর লাগতা—

—বাবা তারকনাথের কৃপা আছে তোমার ওপর—কিচ্ছু ভয় নেই। আমি তোমার জন্য কয়েকটা দিন এখানেই অপেক্ষা করব—ছেলেকে পেলে তাকে নিয়ে সেই দিনই কলকাতা রওনা হতে চেষ্টা কোরো—এখানে এসে তার কল্যাণে ভালো করে পুজো দিয়ে যাবে—পাণ্ডা পুরুত-দেরও খুশি করে যাবে। জয় বাবা!

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছনে আমি আর পেটো কার্তিক নিচে নেমে এলাম। রাস্তায় নেমে অবধূত পেটো কার্তিককে বললেন, আমরা হোটেলে গিয়ে বসছি—এরা কখন রওনা হয় দেখে তুই আয়।

হোটেলের টেবিলে মুখোমুখি বসার সঙ্গে সঙ্গে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। বললাম, দেখুন এর পর আমার হার্টের ব্যামো ধরে যাবে—সব মিলিয়ে ব্যাপারখানা কি?

অবধূত বিমনার মতো হাসলেন একটু। বললেন, সব মিলিয়ে একটা ঘটনার শেষ। আমি ভাবছি···

আবার অন্যমনস্ক দেখে তাড়া দিলাম।—কি ভাবছেন?

—এমন কেন ঘটে?···কি করে হয়?···কে করে?

অর্ডার মতো আমাদের খাবার এসে গেল। একটু বাদেই পেটো কার্তিক হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত।—ওঁরা আর খাবার জন্যও অপেক্ষা করলেন না, সুটকেস আর হোল্ডঅল রিক্সয় তুলে তিন জনেই স্টেশনের দিকে চলে গেলেন।

অবধূত বললেন, ঠিক আছে, তুই বসে যা। খেতে খেতে আমার দিকে মুখ তুললেন একবার। হাসলেন।—খাবার বেশ গরম আছে, ব্যস্ত হবেন না, খেয়ে নিন, আপনাকে শুধু নাটকের শেষটুকু দেখা আর শোনার জন্য কলকাতা থেকে ধরে আনিনি।

···রাত্রি। কোন্‌প্রহর উত্তীর্ণ আমার বা পেটো কার্তিকের হুঁশ নেই। ছুটো চৌকিতে আমি আর অবধূত মুখোমুখি বসে। পেটো কার্তিক মেঝেতে বসে তার বাবার পা টিপেই চলেছে। হাত চলছে থামছে চলছে, ছ'চোখ তাঁর মুখের ওপর। উদগ্রীব, ছ'কান উৎকর্ণ।

আমারও তাই।

একটার থেকে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বড় প্যাকেটের আধখানার ওপরে খালি। ঢিলে তালে ধীরে-সুস্থে অতীতের এক বিচিত্র ঘটনার যবনিকা তুলেছেন কালীকিংকর অবধূত।

৫

মনে মনে আর না ফেরার সংকল্প নিয়ে কালীকিংকর ঘর ছেড়েছিলেন এখন থেকে আরো আট বছর আগে। ফিরতেই যদি হয়, একই মানুষ ফিরবে না—ফেরা না ফেরা সমান এমন মানুষই ফিরবে। কারো ওপর রাগ অভিমান বা অভিযোগ ছিল না। নিজের কাছে নিজেই তিনি সব থেকে বড় বিঘ্ন। এই বয়সেও ভোগ তাঁকে টানে, প্রবৃত্তির আকর্ষণ অমোঘ হয়ে ওঠে। দেশে দেশে তাঁর ভক্ত সংখ্যা অনেক। এত ভক্ত জুটিয়ে দিয়ে কেউ যেন আড়াল থেকে মজা দেখছে। তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠার লোভ মনের তলায় বাসা বেঁধেছে বই কি। এই সব বন্ধন তাঁকে ছিঁড়তে হবে, শিকল ছিঁড়ে বেরুতে না পারা পর্যন্ত মুক্তি নেই। সেই মুক্তির রূপ কেমন জানেন না। ভোগ প্রবৃত্তি লোকমান্য সব একদিকে ফেলে রেখে ঝাড়া হাতে-পায়ে শুধু বেরিয়ে পড়ার তাগিদ।

কোথায় যাচ্ছেন কত দিনের জন্য যাচ্ছেন কল্যাণীকে বলেননি। কল্যাণীও কিছু জিগ্যেস করেননি। এটাই তাঁর রীতি। তবু এবারে বোধহয় মনে একটু খটকা লেগেছিল। মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিগ্যেস করেছিলেন কি আশায় যাচ্ছ···কি পেতে চাও?

—আশার শেষ করতে। পেতে চাই না, ছাড়তে চাই।

আবার জিগ্যেস করলেন, কি ছাড়তে চাও?

পরিহাসের মতো করে সব থেকে বড় সত্যি কথাটাই বললেন।· ·হ্যাঁ, ভিতরে ভিতরে এই বন্ধনের শিকলটাই ছেঁড়ার বেশি তাড়া। এই একজন যেন তাঁর জীবনে স্থির জলাশয় একখানা। ভোগের আর প্রবৃত্তির তাড়নায় তাঁর বুকে আলোড়ন তুললে ঢেউ ওঠে, তরঙ্গ ছড়ায়। তারপর আবার যেমন স্থির শান্ত—তেমনি। হেসে জবাব দিলেন, সব থেকে আগে

তোমাকে।

হাসলেন কল্যাণীও।—পালিয়ে গিয়ে পালানোই হয়, ছাড়া হয় নাকি? ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেই ঐশ্বর্য ছাড়তে হয়, পালালে সেটা তোমাকে আরো বেশি টানবে।

মনে দাগ ফেলার মতোই কথা। এমন ছাড়ার মর্ম অবধূতও জানেন। কিন্তু বিবাহিত জীবনের প্রায় চব্বিশটা বছর কেটে গেছে, ভোগের মধ্যে থেকেও নিবৃত্তির শক্তি তিনি অর্জন করতে পারেননি। চোখের বার মনের বার—এ-ও তো একটা কথা। তিনি বেরিয়েই পড়লেন।

বিহারের দিকে কেন রওনা হলেন তার স্পষ্ট কোনো কারণ নেই। কেবল মনে হয়েছে ও-দিকটাতেই খুব কম যাওয়া হয়েছে। চেনামুখের উৎপাত ওখানেই সব থেকে কম হবে। ট্রেনের জন-সাধারণের কামরায় গাদাগাদি ভিড়। টিকিট কেটেছেন, রিজারভেশনের বালাই নেই। এতো লোকের মধ্যে একেবারে বিচ্ছিন্ন থেকেই চললেন তিনি। এই বেরুনোর প্রস্তুতি অনেক দিন ধরেই চলছিল। ছ'মাস আগে থেকে চুল-দাড়ি কাটেননি, মাথায়ও তেলের ছোঁয়া পড়েনি। দিব্বি শনের মতো চুলদাড়ি জটাজূট গজিয়েছে। পরনের বা গায়ের রক্তাম্বরও নজর কাড়ার মতো ঝকঝকে সিল্কের নয়। বরং মলিন। কাঁধের মস্ত গেরুয়া ঝোলায় আরো দু'প্রস্থ জামা-কাপড়—সুযোগ-সুবিধে পেলে এ-ও ত্যাগ করার ইচ্ছে আছে। ঝোলাতে কিছু টাকা অবশ্য আছে কিন্তু খুব বেশি নয়। সঙ্গে একটা চিমটে আর ত্রিশূল। সব মিলিয়ে কারো চোখ প্রসন্ন হবার মতো মূর্তি নয়, উল্টে হয়তো বিমুখ হবার মতো। টিকিট চেকার তো ভিড়ের মধ্যে উঠে তাঁকেই প্রথম অব্যর্থ শিকার ভেবে হামলার মূর্তি ধরেছিল।—এই! উতর যাও! অর্থাৎ এ-রকম ভণ্ড সাধু তার অনেক দেখা আছে।

—কাঁহে জী?

—টিকিট হ্যায়?

ঝোলা থেকে টিকিট বার করে দেখালেন। ভালো করে সেটা পরখ করে ফেরত দিতে অবধূত করুণাপ্রার্থীর মতো জিগ্যেস করলেন, উতরনে পড়েগা

সাব ?

—নহি, ঠয়ের যাও।

পরদিন সমস্তিপুর ছাড়িয়ে ট্রেন দ্বারভাঙায় আসতে কি ভেবে নেমে পড়লেন। ঘটনার আসরে বিশেষ কিছু ভূমিকা আছে বলেই নেমেছেন এমন চিন্তা কোনো কল্পনার মধ্যেও নেই। নিজের ইচ্ছে আর নিজের খেয়ালটুকুই সব ভেবেছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর যেখানে এলেন তার নাম কাঁকুরঘাটি। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বিশ্রামের জন্য একটা বড় অশ্বত্থ গাছ পছন্দ হলো। কিন্তু খিদে পেয়েছে। একটা দোকান থেকে কিছু মুড়ি আর গুড় কিনে আর ঝোলার কমণ্ডলুতে খাবার জল নিয়ে গাছতলায় বসলেন। যাতায়াতের পথে লোকজনেরা সাধুকে দেখছে, কিন্তু লক্ষ্য করার কোনো কারণ নেই। হামেশাই এ-রকম সাধু দেখে অভ্যস্ত তারা।

সন্ধ্যার পর আবার গুটি-গুটি এগোতে লাগলেন। ভিখিরি গোছের একটা লোককে জিগ্যেস করলেন, শ্মশান কোন্ দিকে, কত দূরে। সে জানান দিল সোজা গেলে আধক্রোশ দূরে, কমলাগঙ্গার ধারে।

গ্রামের মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে উত্তরমুখি কমলাগঙ্গা বয়ে চলেছে। কমলাগঙ্গার উৎস নেপাল পর্বতমালা। দূরে পারাপারের রেলব্রিজ। জয়নগর পেরিয়ে আরো এগোলে নেপাল-বর্ডার। গঙ্গার দক্ষিণদিকে মস্ত এলাকা জুড়ে শ্মশান। পাঁচ ছ'বিঘে হবে। এ-দিকে লোকালয় বা জন-বসতি নেই। খানিক দূরে চালাঘরে খুব গরিব মানুষদের সংসার। শ্মশানে বড় বড় অনেক বট অশ্বত্থ আর দেবদারু গাছের সারি। এ-ছাড়া বেল আর অন্য কিছু ছোট গাছও আছে। এই নির্জন শ্মশান ভারী পছন্দ হলো অবধূতের। এ-মাথা ও-মাথা একবার ঘুরে দেখলেন। পরে জেনেছেন, এখানকার লোকের কাছে এই শ্মশান মহাশ্মশান। তারা একে মুদ্দাঘাট বলে। কিন্তু ঘাট বলতে বা বোঝায় সে-রকম কিছু নেই। তবে যে জায়গায় বেশি দাহ হয় সে-জায়গার চেহারা একটু অন্যরকম। দিনমানেও এই শ্মশানে লোক যাতায়াত কম, রাতে যারা শবদাহ করতে আসে তারা দল বেঁধেই আসে।

এই নিথর নির্জন মুদ্দাঘাট সাধারণ লোকের কাছে গা-ছমছম-করা ভয়ের জায়গা হওয়াই স্বাভাবিক।

রাত বোধহয় বেশি নয়। হাত-ঘড়ি কলকাতাতেই বিসর্জন দিয়ে এসেছেন অবধূত। কিন্তু মনে হয় অনেক রাত। একটা জোড়া বট আর অশ্বত্থ গাছ এক হয়ে বিশাল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। এই গাছটাই পছন্দ হলো অবধূতের। আর কিছু না হোক, কোথাও গেলে অবধূতের সঙ্গে ছোট টর্চ একটা থাকেই। ঝোলায় আছে। ঝোলায় অনেক কিছুই আছে। হঠাৎ দরকার হতে পারে এমন কিছু সাধারণ রোগের ওষুধ-বিসুধও। ক্ষুধা, তৃষ্ণা তো আর একটুও ত্যাগ হয়ে যায়নি। এ-জন্যে খুব নিরাসক্ত-ভাবে লোক টানতেই হবে। লোক টানার এগুলোই বড় সম্বল। মুশকিল আসান হলে লোকের বিশ্বাস সহজে গজায়।···টর্চের জন্য ঝোলায় হাত ঢুকিয়েও সেটা আর বার করলেন না। শীতের মাঝামাঝি সময় এটা। কার্তিকের শুরু। এখানে বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। শীত জয় করার অভ্যাস তারাপীঠে থাকার সময় থেকেই। ভৈরবী মায়ের গায়ে ভরা শীতেও কখনো গরম জামা বা ভারী আচ্ছাদন দেখেননি। আর বাবা তো শীত-গ্রীষ্মে নির্বিকার। ভৈরবী মা বলেছিলেন, এটা অভ্যাসের ব্যাপার বাবা, একটু একটু করে অভ্যাস করলে সকলেই পারে। অবধূত অভ্যাস করে-ছিলেন। তাই ঠাণ্ডার ভয়ে কাতর নন তিনি। মাথায় যা এসেছে রাতের মধ্যেই সেটুকু সম্পন্ন করবেন। এই বেশ-বাসও ছাড়ার তাগিদ। টর্চ বার করলেন না কারণ, চারদিকে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। তাছাড়া অন্ধকারে সাধারণ লোকের তুলনায় তাঁর অনেক বেশি চোখ চলে বইকি। এ-দিক—ও-দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকালেন। খানিকটা দূরে একটা নিভু-নিভু চুল্লির কাছে কিছু চোখে পড়ল। এগিয়ে গেলেন। যা ভেবেছিলেন, তাই। মড়ার বড়সড় ফেলে-দেওয়া চাটাই একটা। চাটাই আর চুল্লি থেকে একটা আধা-জ্বলা চেলা-কাঠ নিয়ে গাছতলায় ফিরলেন।

গাছতলায় চাটাই পেতে তার ওপর ঝোলা থেকে বড় একটা লাল কম্বলের আসন বার করে ওটার ওপর বিছিয়ে গদি করলেন। আসন প্রস্তুত।

এরপর সম্পূর্ণ নগ্ন, উলঙ্গ তিনি। ঝোলা থেকে একটা চওড়া কৌপিন বার করে পড়লেন। মলিন লাল-বসন ঝোলায় পুরে আবার সেই প্রায়-নিভু চুল্লির কাছে চললেন। চুল্লি থেকে তপ্ত ছাই তুলে তুলে কপালে বাহুতে বুকে আর দু'পায়ে মেখে ফিরে এসে আসনে বসলেন। চিমটেটা পাশে রেখে ত্রিশূল মাটিতে পুঁতে দিলেন।...একটা মড়ার মাথার খুলি পেলে ভালো হতো। কাল দিনেরবেলায় খোঁজ করবেন।

দূরের এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছে এটা অনুমান করার কোনো কারণ নেই। হঠাৎই মনে হলো একটা লোক এ-দিকে এগিয়ে আসছে। এলো। সামনে এসে দাঁড়ালো। বেশ মজবুত কাঠামোর একটা মানুষ। মিস-কালো গায়ের রং। চওড়া জুলফি চিবুকের কাছে নেমে এসেছে। পুরুষ্টু গোঁপ। গোল চোখ। পরনে খাটো ধুতি। ঊর্ধ্ব অঙ্গে একটা ছেঁড়া-খোঁড়া গরম কম্বল জড়ানো। হাতে লম্বা একটা নিভনো মশাল। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। বয়েস চল্লিশের ও-ধারে।

কম্বল সরাতে দেখা গেল গায়ে হাঁটু সমান একটা ছেঁড়া গরম কোর্তা। পকেট থেকে দেশলাই বার করল। তেলে ভেজানো মশালটা জ্বেলে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দেখতে লাগল। মশালের উষ্ণ তাপ খুব আরামের মনে হলো অবধূতের।

—তুম্ কওন? লোকটা জিগ্যেস করল।

গুরুগম্ভীর গলায় অবধূত পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুম্ কওন্?

এর পরে—এর পরে কেন, অবধূতের এই শ্মশানে তিন বছর অবস্থান কালে সকলের সঙ্গে সব কথাবার্তাই দেশোয়ালি হিন্দীতে। কিন্তু এই লেখকের হিন্দীর বিদ্যে এতই সীমিত যে এরপর থেকে সব কথাবার্তার ভাবই বাংলায় বিস্তার করছি।

লোকটা দাপটের সঙ্গে জবাব দিল, আমার নাম কাল্লু—কাল্লু কি চীজ্ এ মুলুকের সকলেই জানে, দূর থেকে তোমাকে আমি কৌপিন পরে ছাই মেখে সাধু বনতে দেখলাম—কোথায় কি করে এসে ভোল বদলাচ্ছ?

ঠাণ্ডা মুখে অবধূত বললেন, আমার ভোল নিয়ে তোমাকে ভাবর্তে হবে না,

যাও এখন এখান থেকে !

এই শ্মশানের লাগোয়া কাল্লুর ডেরা এবং সংসার। এখানে তাঁর একচ্ছত্র দাপট। গাঁয়ের মানুষদের বেশির ভাগই গরিব। তাদের বিপদে কাল্লু শস্তায় কাঠ যোগান দেয়। অবস্থাপন্ন ঘরের শব এলে টাকার জন্য জোর জুলুম করে। টাকার বিনিময়ে সে আর তার সাগরেদরা সাহায্য করে মোট কথা কাল্লু সর্দারকে কেউ খুব তুচ্ছ করে না। তার মধ্যে একটা উটকো লোক এখানে এসে সাধু সেজে এমন আস্পর্ধার কথা বললে সে বরদাস্ত করে কি করে। তাছাড়া এখানকার মানুষদের মতিগতি জানে। শ্মশানে ছাই-মাখা সাধু বসে আছে দেখলে পাঁচ দশ পয়সা বা বড়লোক হলে সিকি আধুলি টাকা ফেলে পুণ্যি করে যাবে। এ-যেন তারই ভাগে থাবা বসানো। তার মেজাজ আরো উগ্র, কারণ পেটে হাড়িয়া পড়েছে। হাতের মশাল তাঁর দিকে বাড়িয়ে হুমকি দিল, এক্ষুণি এখান থেকে ভেগে পড়বে তো পড়ো—নইলে কাল্লু সর্দার এই শ্মশানেই তোমার সৎকার করবে জলদি ভাগো !

এ-সব লোককে বশ করার মতো কিছু ক্ষমতা এত কালে অবধূতের হয়েছে বইকি। মশালের আলো দাড়ি-গোঁপ জটাজূট ছাওয়া মুখের ওপর পড়তে আরও সুবিধে হলো। দু'চোখের অগ্নি দৃষ্টি লোকটার মুখের ওপর বিদ্ধ হয়ে রইল। না, সম্মোহন বা বশীকরণ বিদ্যে বলে কিছু যদি থেকেও থাকে অবধূত তা জানেন না। কিন্তু এই দৃষ্টির আঘাতে অনেক জোরালো মানুষকেও বিভ্রান্ত হতে দেখেছেন। এই লোকটাও একটু থমকেছে বটে. তবু ফিরে চেয়ে থেকে দাপটের সঙ্গেই যুঝছে। হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ত্রিশূলটা তুলে নিলেন অবধূত। দাপট যারা দেখায় তারা দাপটের কাছেই নত হয়। সজোরে যেন ছুঁড়েই মারলেন ওটা —কাল্লু এক-লাফে তিন পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু না···ত্রিশূল ছোঁড়া হয়নি, সামনেই মাটিতে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

শ্মশান কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন অবধূত। এই হাসিতে লোকটার শিরদাঁড়ায় হিমস্রোত নামার কথা কিছুটা। তাই হলো বটে। বিস্ফারিত চোখে দেখছে

তাকে। চেয়ে আছেন অবধূতও। হাসিটা এবারে তাঁর চোখে আর দাড়ি-গোঁপে নিঃশব্দে এঁটে বসতে লাগল। খুব কোমল গলায় বললেন, তুই তো ভালো লোকরে কাল্লু, তোর এই মেজাজ কেন—খুব হাড়িয়া টেনেছিস বুঝি—সেরকম লোকের পাল্লায় পড়লে তো জানে মরবি!

কাল্লু চেয়েই আছে। লোকটার সাহস দেখছে, তাই ক্ষমতা যাচাইয়ের চোখ।

—ভয় নেই, এ-দিকে আয়—মশালটা ত্রিশূলের পাশে পুঁতে দে।

–পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। এখনো অবিশ্বাস আবার সংশয়ও। জোরে ঘাঁই দিতে মশালের অপেক্ষাকৃত সরু দিকটা মাটিতে বসে গেল। কংকালমালী ভৈরবের ডেবায় চার বছরে প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড তাপে দেহ অকাতর রাখার অভ্যাস অনেকটা রপ্ত হয়েছিল। কিন্তু অনেক কালের অনভ্যস্তভাব ফলে নদীর ধারের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে বিঁধছিল। সেই অভ্যাসের মধ্যে ফিরে যাওয়া আর সেই সঙ্গে নিজেকে সংস্কার মুক্ত করার তাগিদেই অবধূত বস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন।···মশালেব এই তাপটুকু ভালো লাগছে।

—বোস্।

কাল্লু সর্দার সামনে বসল।

অবধূত আবার স্থির অপলক চোখে খানিক চেয়ে রইলেন। মায়ের এই শিক্ষাটুকু ব্যর্থ তো হয়ইনি, অভ্যাসে অভ্যাসে উল্টে অনেক ধারালো হয়েছে। উপলব্ধি স্বচ্ছ হয়েছে। স্নায়ুব ষষ্ঠ অনুভূতিও প্রখর।

—দাপট দেখিয়ে বেড়াস, ভিতরে তো তুই এক নম্বরের ভীতু রে—দেখি হাত দুটো বাড়া তো—

সঠিক না বুঝে দু'হাত উল্টো করে বাড়ালো। এখনো সংশয় ঘোচেনি।

—হাত সোজা কর্ বুদ্ধু কোথাকারের।

বুদ্ধু শুনে চনমন করে উঠল একটু। তবু হাত সোজা করল।

অবধূত দেখলেন খানিক।—তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ে তোর?

এবারে বিমূঢ় একটু। মাথা নাড়ল। তাই।

—বউটা তো দেখছি রোগে ভুগে আধ-মরা—নিজে নেশা-ভাঙ খেয়ে পড়ে থাকিস—বউ ছেলে-মেয়েকে দেখিস না ? এবারে ধমকের সুর।

কাল্লু সর্দার বিলক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর দু'চোখ বিস্ফারিত। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দু'হাতে দুই পা আঁকড়ে ধরল।—হাঁ বাবা, আমি বহুত্ পাপী—আমার বহুর বেমার সারছে না—তুমি কৃপা করে তাকে আরাম করে দাও বাবা—আমার গোস্তাকি মাফ করে দাও—এই আমি কান মলছি—

—ঠিক আছে, আমাকে দেখে তুই ক্ষেপে গেছলি কেন সত্যি করে বল্ ?

উঠে বসল। নেশা ছুটে গেছে। জোয়ান লোকটা এখন ভয়ে কাঁপছে। হাত জোড় করে জানান দিল, লাল জামা-কাপড় খুলে ফেলে কৌপিন পরে আর ছাই মেখে তাঁকে সাধু বনে যেতে দেখে সে ভণ্ড ভেবেছিল—লোকে এসে না বুঝে পয়সা দেবে, তাতে তার ক্ষতি হবে ভেবে তার মেজাজ বিগড়ে গেছল।

অবধূত হাসলেন।—ঠিক আছে যা, তোর রোজগার আগের থেকে ঢের বাড়বে—কিন্তু তুই দেখবি আমাকে যেন কেউ বেশি বিরক্ত না করে।

হাত জোড় করেই আছে কাল্লু সর্দার, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, সে জরুর দেখবে।

কাল্লু সর্দারের রোজগার ঢের বাড়বে এটা অবধূতের কোনো দৈববাণী নয়। লোক-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর যেটুকু জ্ঞান তাই থেকেই বলেছেন। বাসনা-ত্যাগ লক্ষ্য, মানুষের সেবা-ত্যাগ নয়। উপকার পেলে লোকে আসবেই। এই কাল্লুই এরপর প্রচারের কাজ করবে। শ্মশানের সাধুকে তারা টাকা পয়সা দিয়ে যাবে জানা কথাই। তাঁর তো কেবল জীবন ধারণ নিয়ে কথা, টাকা-পয়সার লোভ নেই। নির্লিপ্তভাবে মানুষের উপকার করার ইচ্ছে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কারো মায়ায় জড়ানোর ইচ্ছে আদৌ নেই। তাই প্রথম চেলা কাল্লু সর্দারকে এ-ভাবে হুঁশিয়ার করা।

—তোর বহুকে কাল নিয়ে আসিস, দেখব কি করা যায়।

আশ্বাস পেয়ে কাল্লু সর্দারের মুখে কথা সরে না। জোড়-হাত করেই

রইলো।

অবধূত চার-দিকে তাকালেন। এদিকে-ওদিকে বড় বড় কালো পাথর পরে আছে। ষষ্ঠ স্নায়ু আবার প্রখর। তাঁর যে-জীবন তাতে মানুষের বিশ্বাস আসল পুঁজি। এই বিশ্বাস সংস্কারাবদ্ধ তা-ও জানেন। কিন্তু নিরাপদে এখানে কিছু-কাল কাটাতে হলে খুব নিরাসক্তভাবে এই পুঁজিও ভাঙানো দরকার। বললেন, শোন্, এখানে কোথাও শ্মশান-কালীমাতাজী নিজেকে গোপন করে রেখেছেন। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই এখানে আসা। তুই আর নিজেকে পাপী বলে পাপ বাড়াবি না—তোর অনেক পুণ্যি, তোর এখন অনেক কাজ, আজ যা, কাল বলব।

জোড়-হাত করে যেন করুণা ভিক্ষা করল কাল্লু সর্দার।—মহারাজের সেবার কি ব্যবস্থা হবে?

ক্ষুধা তৃষ্ণা আর তেমন নেই অবধূতের। কিন্তু মশালের আলো কমে আসতে বেশ শীত-শীত করছে।—তোর ঘরে হাড়িয়া আছে?

কাল্লু বিগলিত। –জি মহারাজ।

আবার একটু ভাবলেন।—গাঁজা?

কাল্লু সর্দার ছুটল। গাঁজা এলো, নতুন কল্কে এলো। সঙ্গে তিন-চারজন সাঙ্গ-পাঙ্গ। যে সাধুকে দেখে সর্দারের বুকের তলায় আনন্দের কাঁপুনি আবার ভয়ও, সে-যে পয়-নম্বর গোছের একজন তাতে আর সন্দেহ কি?

পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে কাঁকুড়ঘাটি শ্মশানের সাধুর আবির্ভাব রাষ্ট্র হয়ে গেল। নিচু শ্রেণীর, নিম্নমধ্যবিত্ত আর মধ্যবিত্তদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল।···সাধুর আশ্চর্য ক্ষমতা, শ্মশানের মাটি খুঁড়ে শ্মশানকালীকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই শ্মশানকালী সুন্দর মসৃণ একখণ্ড কালো পাথর। অবধূত তেল-সিঁদুরে তাকে মায়ের আকারে এনে পুজো শুরু করেছেন। মা যে জাগ্রত তাতে আর সন্দেহ কি, সাধুকে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে কাল্লু সর্দার শুনেছে, তার সাকরেদরা শুনেছে। বাবার শীত তাপ স্নান নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ নেই। মায়ের ওষুধে কাল্লু সর্দারের অমন বেমারি বউটাকে প্রায় সারিয়ে তুলেছে। এ-সব কথা বাতাসে তিনগুণ হয়ে ছড়ায়।

নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য, বন্ধনমুক্ত হবার জন্য পাহাড়ের গুহা-গহ্বরে আশ্রয় খোঁজেননি অবধূত। পরিচিতের বেষ্টনী ছেড়ে তিনি অপরিচিতের বেষ্টনীতে এসেছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ বেশি কাম্য। এদের মধ্যে থেকে নিজের অনুশীলন যতটা এগোয়। নিবৃত্তির পথ যতটুকু প্রশস্ত হয়। নিজের ভিতরটাকে যদি পদ্মপত্রের মতো করে তুলতে পারেন—এরা যত-খুশি তার ওপর দিয়ে জলের মতো গড়িয়ে যাক—কোনো-রকম দাগ পড়তে না দেওয়াই তাঁর নিবৃত্তি সাধনা।

নিজেকে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্যেই সেবার ধারা একটু বদলেছেন অবধূত। কেউ আবেদন নিবেদন বিস্তার করতে বসলে রেগে যাবার ভান করেন। যারা আসে, কাল্লু সর্দার বুঝিয়ে দেয়, বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই। বাবা অন্তর্যামী। কৃপা হলে বাবা নিজেই ব্যবস্থা করে দেবেন। সেই কৃপা যদি চাও, বাবার কাছে এসে চুপচাপ বসে থাকো। বাবা শুধোলে বলবে। না শুধোলে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতেও যেও না।

···বক্রেশ্বরে মানুষের সেবার ব্যাপারে ভৈরবী-মায়ের যা ছিল সব থেকে বড় পুঁজি—সেই মনঃসংযোগ আর দৃষ্টি সঞ্চালন বিদ্যের ওপরেই সব থেকে বেশি নির্ভর করতে চাইলেন অবধূত। মা বলতেন, মনের স্থির সংযোগ হলে নিজের অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যায়, দৃষ্টি সঞ্চালন আয়ত্তে এলে মানুষের ভিতরের অদেখা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পর্যন্ত ঘুরে আসা যায়। মুখ দেখে লক্ষণ জানা আর চেনাটাই এখন তন্ত্রসার অবধূতের কাছেও।

প্রতিদিন এই মহড়াই চলেছে। কোন্ রোগের কি লক্ষণ, দেহে বা মুখে তার প্রকোপ আর চাপ মোটামুটি তাঁর আয়ত্তের মধ্যেই। তবু চট করে কাউকে বিধান দিয়ে বসেন না, ধৈর্য পরীক্ষার অছিলায় সময় নেন। তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ সেই দৃষ্টি সকলে সহ্যও করতে পারে না, ভিতরের যন্ত্রণা বা ব্যাকুলতা তাতে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন নিশ্চিন্ত জোরের সঙ্গেই মুশকিল আসানের পথ বাৎলে দেন।—এই রোগ পুষলি কি করে? আরো এতদিন ভোগান্তি আছে তোর—মায়ের কৃপায় সেরে যাবে—এই এই করগে যা।

অন্যত্র যা, এখানেও তাই। রোগ আর ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরই ভিড় বেশি। ফলে অবধূতের সুবিধেও বেশি। দেখতে দেখতে ধন্বন্তরী হয়ে উঠলেন গাঁয়ের মানুষদের কাছে। কিন্তু এখানে সাধুর আচরণ দেশের মানুষদের কাছে যেমন, তেমন নয়। এখানে নিজের চার ধারে এক নির্লিপ্ত কঠিন সাধারণ রচনা করে সকলের কাছ থেকেই বিচ্ছিন্ন তিনি। ভক্তরা ফলমূল দুধ চিঁড়ে গুড় ছাতু দই সিকি আধুলি টাকা রেখে যায়। অবধূত ফিরেও তাকান না। আঙুলের ইশারায় সে-সব কাল্লু সর্দার তুলে নিয়ে যায়। তার দিন ফিরছে বটে। সেই সঙ্গে বাবার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা তুঙ্গে। বাবার আহার নাম-মাত্র। তা-ও প্রায় একাহারী। রাতে মদ গাঁজা সামান্য ভাজাভুজি ছাড়া আর কিছু রোচে না। কোনো অমাবস্যার রাতে বাবার একটু মাংস খাবার সাধ হলে কাল্লু সর্দার আনন্দে নৃত্য করে। বাবার কল্যাণে সর্বদা তার ঘরে তো কত কি মজুত এখন, বাবাকে মনের সাধে খাওয়াতে পারলে সে বর্তে যায়। কিন্তু তার কি জো আছে! একবার মাথা নাড়লে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার হিম্মত নেই। এমন তাকাবেন যে আত্মারাম ত্রাসে থরো-থরো। কেবল অরুচি নেই মদে। গাঁজায়। এ-দুটি রোজ রাতেই চলে। টাকার আমদানি বেশি হলে কাল্লু সর্দার দিশি জিনিস না এনে গঞ্জের বড় দোকান থেকে ভালো মদ কিনে নিয়ে আসে। বাবার খাওয়া হলে সে-ও প্রসাদ পায়। নেশা বেশি হয়ে গেলে আর ঘরে ফেরারও শক্তি থাকে না—বাবার পায়ের কাছে সটান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু সকলেই তা বলে রোগের তাড়নায় সাধুর কাছে আসে না। অভাবের তাড়নায় বা ভাগ্য ফেরানোর তাগিদে যারা তার কাছে আসে অবধূত তাদের মুখ দেখলেই বুঝতে পারেন। কিন্তু এ-ছাড়াও মানুষের সমস্যার শেষ নেই, সংকটেরও শেষ নেই। মুখের লক্ষণ দেখে এই সমস্যা বা সংকট আঁচ করার পরীক্ষার মধ্যেও অবধূত নিজেকে ফেলেছেন। ফেলছেন।

পর পর পরীক্ষায় তিনি আশ্চর্যভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে একটাই নিজের ক্রেডিট ভাবেন। এক-জোড়া মেয়ে-পুরুষ আসছে দশ-বারো মাইল দূর থেকে। স্বামী-স্ত্রী। অনন্তরাম আর লাজবন্তী। ছেলেটির বছর বত্রিশ-

তেত্রিশ বয়েস, আর মেয়েটির সাতাশ-আটাশ ! বর্ধিষ্ণু চাষী পরিবার, নিজেদের টাট্টু-ঘোড়ার গাড়িতে আসে। নিজে যেচে সমস্যা বা সংকট জানানোর রীতি নেই। সাধুর কৃপা হলে তিনি দেখবেন, বুঝবেন, দরকার হলে প্রশ্ন করবেন। এই দম্পতী একে একে তিন দিন এলো। দু'দিন এক-ঘণ্টা ধরে চুপচাপ বসে থেকে চলে গেছে।···অবধূত তাদের দেখেছেন, বুঝতে চেষ্টা করেছেন। না, দু'জনের কারো কোনো ব্যাধির হদিস পান নি, আর্থিক অনটনেরও না। দু'দিনই পাঁচ টাকা করে প্রণামী রেখে গেছে। যেখানে পাঁচ-দশ পয়সা বা সিকি আধুলিই বেশি পড়ে সেখানে পাঁচ টাকা অনেক। মেয়েটির বেশ মিষ্টিমুখ, লক্ষ্মীশ্রী, অথচ ভিতরে কোনো অপূর্ণ বাসনায় কাতর বোঝা যায়।···কে ? কি প্রত্যাশা ?

তৃতীয় দিনে একটু সতর্ক হয়েই সাধু তাদের দিকে মনোনিবেশ করলেন। ঝকঝকে দু'চোখ তুলে লাজবন্তীর দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। তারপর গলার স্বর খুব নরম করে বললেন, মায়ি, তোমার ভিতরে মায়ের স্নেহ, এই স্নেহ দিয়ে অন্যের ছেলে-মেয়েদের কাছে টেনে নেওয়া যায় না, নিজের ছেলে-মেয়ে ভাবা যায় না ?

অনুমানে ভুল হয় নি। লাজবন্তী সাধুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বাবার আশীর্বাদে তার নিজের কি কোনো সন্তান হতে পারে না ?

অবধূত স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এর পরে আর সমস্যা কিছু নেই।—বাঁ-হাতখানা দেখাও তো ?

দেখলেন। মাথা নাড়লেন। তুমি অপরের ছেলে-মেয়ের মা হবে। তাইতেই তোমার মাতৃস্নেহ সার্থক হবে। গরিব ছেলে-মেয়েদের কাছে টেনে নাও—আনন্দ পাবে।

লাজবন্তীর এগারো বছরের বিবাহিত জীবনে সন্তান আসে নি। সাধুর কথায় অখণ্ড বিশ্বাস, আর আসবেও না। তাঁর বিধান শিরোধার্য করে সেই আনন্দের পথেই পা ফেলেছে। অতি দুস্থ অনাথ তিনটি বাচ্চা ছেলে-মেয়েকে নিজের কাছে এনে সন্তান স্নেহে প্রতিপালন করছে। তাদের জন্য আবার বাবার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এসেছে। সাধুর ছেলেমানুষের

মতো আনন্দ দেখে সকলে অবাক। ওই শিশুদের আশীর্বাদ করার জন্য বাবা নিজের আসন ছেড়ে উঠেছেন। বলেছেন, তুই সত্যিকারের মা হয়েছিস রে বেটি, তোর ঘরে গেলেও পুণ্য, চল্, তোর ঘরে গিয়ে তোর ছেলেদের আশীর্বাদ করব।

সকলকে হতবাক করে সত্যি সাধু তাদের টাট্টু ঘোড়ারগাড়িতে চেপে লাজবন্তীর ডেরায় এসেছেন। বাচ্চাগুলোকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে মঙ্গল কামনা করেছেন। সাধুর এই কৃপা পেয়ে লাজবন্তী আর অনন্তরাম জন্ম সার্থক ভেবেছে। সকলে তাদেরও ধন্য ধন্য করেছে। বছর ঘুরতে সাধুর নাম অনেক দূরে দূরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মোটামুটি অবস্থাপন্ন যারা, দুবারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে না পড়লে তারা সাধারণত ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। চট করে দৈবের পিছনে বা সাধুর পিছনে ছোটে না। এরা এলে বুঝে নিতে হয় এদের প্রত্যাশা অন্য কিছু। রোগাক্রান্ত হলে তো মুখ দেখেই অবধূত অনেকটা বুঝতে পারেন।

দু'বছরের মাথায় এ-পর্যায়ের একজনের যাতায়াত শুরু হতেই কাল্লু সর্দার বাবাকে সাবধান করেছে। লোকটির নাম শান্তাপ্রসাদ। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। এক-কালে বড় অবস্থার মানুষ ছিল। ব্যবসায় নেমে তার অনেকটাই খুইয়েছে। জমিজমার অনেক বন্ধকে চলে গেছে। অনেক টাকা ঋণ। কিন্তু এখনো ঠাট বজায় রেখেই চলে ভদ্রলোক। শান্তাপ্রসাদ রাতের দিকে নির্জনে আসে সাধুর কাছে। পায়ের কাছে একটা করে বিলিতি মদের বোতল রাখে। এই জিনিসটি পেলে সাধু সব থেকে খুশি হন সে বুঝে নিয়েছে। নিজের কোনো আর্জি পেশ করে না। এসে প্রণাম করে চুপচাপ বসে থাকে আবার এক সময় প্রণাম করে চলে যায়।

কাল্লু সর্দার তার আনা মদের ভাগ অর্থাৎ প্রসাদ অপছন্দ করে না। কিন্তু মানুষটার ওপর সন্দিগ্ধ। বাবার ভালো-মন্দের থেকে তো আর মদ বেশি নয়। তাই বাবাকে সতর্ক করেছে, শান্তাপ্রসাদ যদি তার শত্রুকে ঘায়েল করার মতলব নিয়ে এসে থাকে তাহলে বাবার তাকে পাত্তা না দেওয়াই ভালো। কারণ সেই শত্রু বড় ভীষণ শত্রু। এই শত্রুর নাম রতনলাল।

সমস্ত কাঁকুড়ঘাটিতে তার মতো বড় অবস্থার মানুষ আর একজনও নেই। রতনলাল দৌলতরামের ছেলে। আসলে বাপের নাম ছিল রামলাল। তার এত দৌলত আছে বলেই লোকের মুখে মুখে সে দৌলতরাম হয়ে গেছল! রতনলালের বাবা দৌলতরাম আর শান্তাপ্রসাদের বাবা সরয়ূপ্রসাদ খুব বন্ধু ছিল। সরয়ূপ্রসাদ ছিল বেপরোয়া দিলদরিয়া গোছের মানুষ। তার অনেক রকমের আধুনিক ব্যবসার প্ল্যান মাথায় গজাতো। বড়লোক হতে গিয়ে বন্ধু দৌলতরামের কাছে অনেক টাকা ঋণ করেছিল। শেষে অর্ধেকের বেশি জমিজমা বন্ধক দিয়ে আবার নতুন ব্যবসায় নেমেছে। তাতেও মার খেয়ে হঠাৎ হার্টফেল করে মরেছে। ফলে শান্তাপ্রসাদের ঋণ এখন গলা পর্যন্ত। সুদে আসলে এই ঋণ বাড়ছেই। কিন্তু বেঁচে থাকতে দৌলতরাম বন্ধুর ছেলেকে সেজন্য কোনোদিন বিপাকে ফেলেনি। বরং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বাপের ঋণ শোধ করার পরামর্শ দিয়েছে।

শান্তাপ্রসাদ বিপাকে পড়েছে দু'বছর আগে দৌলতরাম মারা যেতে। কর্তৃত্ব এখন তার একমাত্র ছেলে রতনলালের হাতে। এই ছেলেকে দৌলতরাম কোনোদিন বিশ্বাস করত না। ছেলেবেলা থেকেই সে মন্দ রাস্তায় হাঁটা শুরু করেছে। বাপ অনেক চেষ্টা করেও তাকে বশে আনতে পারেনি। চরিত্র শোধরানোর জন্য দৌলতরাম অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। একটা মেয়ের জন্ম দিয়ে সেই বউটা অকালে মরেছে। ছেলের চরিত্র শোধরাবে না ধরে নিয়েই দৌলতরাম আর বিয়ের তাগিদ দেয়নি। ছেলেও বিয়ে না করে ফুর্তির রাস্তাই বেছে নিয়েছে। বিরাট ধনীর একমাত্র চরিত্রহীন বদমেজাজী ছেলে হলে যা হয় রতনলাল তাই। দৌলতরামের একমাত্র সম্বল তার নাতনী পার্বতী—বুড়োর চোখের মণি।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ রতনলাল কিছুটা টিট তার এই বাপের কাছে। ছেলের তুলনায় বাপের বুদ্ধি অনেক বেশি ক্ষুরধার। নত হলে এই ছেলে তাকেই ছোবল মারবে জানে। তার ওপর সর্বদাই ছড়ি উঁচিয়ে চলত। কাজের সুবাদে আট দশটি যোয়ান লোক তাকে ঘিরে থাকত। এক কথায় পাহারা দিত। কোতোয়ালির সঙ্গেও দৌলতরামের বন্ধু সম্পর্ক। যত বেপরোয়াই

হোক, এই বাপের সঙ্গে রতনলাল এঁটে উঠতে পারত না। খুব তাছাড়া আসল জিনিস অর্থাৎ দৌলতরামের সমস্ত দৌলতের চাবির নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত কোমর বেঁধে লাগার সুযোগ বা সাহসও নেই। বাপ মুখে তো সর্বদাই হুমকি দিচ্ছে ত্যাজ্যপুত্র করবে, কাজেও কখন তা করে বসে ঠিক নেই। তাই বুদ্ধিমানের মতো রগচটা বাপকে না ঘাঁটাতেই চেষ্টা করে। তাঁর হুকুম-মতো ব্যবসা আর কারবার দেখে। সপ্তাহের মধ্যে চার পাঁচদিন তাকে দ্বারভাঙায় গিয়ে থাকতে হয়। সেখানে দৌলতরামের সারের ব্যবসা, আর মস্ত স্টেশনারি দোকান। অনেক বিশ্বস্ত লোকজন কাজে বহাল আছে—কিন্তু ছেলেকে সেখানেও দৌলতরাম তাদের মনিবের জায়গায় বসায়নি। মনিব দৌলতরাম নিজে, ছেলে সব থেকে বেশি মাইনের কর্মচারী মাত্র। কিন্তু অন্য বিশ্বস্ত কর্মচারীরাও কি তা বলে নিজেদের ভবিষ্যৎ বোঝে না? ভবিষ্যতে এই ছেলেই যে সব-কিছুর সর্বেসর্বা হবে কে না জানে। তাই তলায় তলায় এরা প্রায় সকলেই রতনলালের অনুগত।

দৌলতরাম কাঁকুড়ঘাটির মস্ত গোডাউন আর তেজারতি অর্থাৎ সুদের কারবারটি সম্পূর্ণ নিজের হাতে রেখেছিল। সারের ব্যবসা আর স্টেশনারি দোকান ছাড়াও এই সুদের কারবার থেকেই তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা।

···দৌলতরাম মারা যাবার পর থেকেই শান্তাপ্রসাদের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে। শান্তাপ্রসাদকে রতনলাল কোনোদিনই দু'চক্ষে দেখতে পারত না। লেখাপড়া জানা মানুষ হিসেবে বাপ তাকে স্নেহ করত বলে তার ওপর আরো রাগ। ধারদেনা শোধ করার জন্য সে এখন প্যাঁচ কষছে—হুমকির পর হুমকি দিচ্ছে। রতনলালের সমস্ত কর্মের দোসর বেনারসীলাল। এই বেনারসীলাল রতনলালের সব থেকে বড় হাতিয়ার।

বেনারসীলালকে ভয় করে না গাঁয়ে হেন লোক নেই। সকলের ধারণা, বেনারসীলাল করতে পারে না এমন কুকর্মও নেই। বয়সে বেনারসীলাল রতনলালের থেকে কম করে দশ বারো বছরের ছোট। কিন্তু আসল বয়েস সত্ত্বেও দু'জনে হরিহর আত্মা। তার প্রধান কারণ মাত্র আঠেরো বছর বয়সে দামাল ছেলে বেনারসীলাল অব্যর্থ মৃত্যু থেকে রতনলালকে বাঁচিয়ে

ছিল।···বর্ষায় এক-একবার কমলাগঙ্গা ভীষণ রূপ ধরে। সেই ভয়ংকর সময়ে একটা বড় নৌকাডুবি হয়েছিল। রতনলাল সাঁতার পর্যন্ত জানে, জানা সত্ত্বেও সেই অঘটনে অনেক লোক মরেছে। অবধারিত মৃত্যুযোগ ছিল রতনলালেরও। কিন্তু একজন সাগরেদের সাহায্যে বেনারসীলালই তাকে বাঁচিয়েছিল। বাঁচাতে গিয়ে বেনারসীলাল মরতেই বসেছিল।··· এই ঋণ রতনলালের বাবা দৌলতরামও অস্বীকার করতে পারেনি। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ওই ছেলেকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিল। তার লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়েছিল। তেমন সুমতি থাকলে এই ছেলে কালে দিনে দৌলতরামের ডান হাত হয়ে বসতে পারত। তার বদলে বেনারসী-লাল তার মহাশ্রদ্ধার দাদার অর্থাৎ রতনলালের ডান হাত হয়ে বসতে পারাটাই অনেক বেশি কাম্য ভেবেছিল।···পড়াশুনোয় মোটামুটি ভালো ছিল, কিন্তু নিজের চরিত্রগুণে আর সঙ্গদোষে বেশি এগোতে পারে নি। দু'বছর না তিন বছর দৌলতরাম তাকে ডাক্তারি পড়িয়েছিল। সমস্ত খরচের দায় তার। কিন্তু ততদিনে সে স্ব-মূর্তি ধরেছে। ডাক্তারি পড়া ছেড়ে রতনলালের যোগ্য সাগরেদ হয়ে বসেছে।···রতনলাল আর বেনারসী-লাল—এই দুই লালের দাপটে গাঁয়ের মানুষ দারুণ তটস্থ। শুধু গাঁয়ের মানুষ কেন, দ্বারভাঙার সারের ব্যবসা আর স্টেশনারি দোকানের কাজের লোকেরাও।

সেখান থেকে বাপের চোখে ধুলো দিয়ে ফি-মাসে রতনলাল যদি নিজের বরাদ্দ ছাড়াও মোটা টাকা টেনে নেয়, কার হিম্মত আছে সেটা খোদ মালিককে জানিয়ে দেবে? উল্টে দুই লালের হুকুম মতো তাদের দু'নম্বরি হিসেবের খাতা তৈরি রাখতে হয়। সকলে জানে, রতনলালের অর্থ-বল আর বেনারসীলালের গুণ্ডা-বল—এই দুই বলের রাজ-যোগে তারা একে-বারে অজেয়।

কাল্লু সর্দার অবশ্য এত কথা তার বাবা মহারাজকে গুছিয়ে বলতে পারেনি। কিন্তু অবধূত যতটুকু বোঝার বুঝে নিয়েছেন। চেলার মতে রতনলাল মানুষটা ক্ষেপে না গেলে অত ভয়ংকর নয়, কিন্তু বেনারসীলাল

যাকে বলে কালকেউটে। তাই শান্তাপ্রসাদ যদি ওই শত্রুদের ঘায়েল করার মতলবে বাবার কাছে ভিড়ে থাকে, বাবার তাহলে তাকে বর্জন করাই ভালো—কারণ, ওই দুই লাল রুষ্ট হলে আগুন জ্বলতে সময় লাগে না। তাদের অসাধ্য কর্ম নেই।

…ডাক্তার না হয়েও বেনারসীলাল গাঁয়ের গরীব মানুষদের কাছে ডাক্তার হয়ে বসেছে। মেজাজের মাথায় চিকিৎসা করে, ওষুধ দেয়, সুঁই চালিয়ে নিজের হাত পাকায়। বড় বড় ফোঁড়াও ফালা-ফালা করে কেটে দেয়। তার হাতে পড়ে অনেক গরীব লোক মারা পড়েছে। অনেকে ক্ষত-ঘা বিষিয়ে মরেছে। কিন্তু কার সাহস আছে মুখে রা কাটে? তাছাড়া কেন কি হয় গরিব মানুষেরা বোঝেই বা কতটুকু? রোগ সারলে তারা বরং দু'হাত তুলে বেনারসীলালের সুখ্যাতি করে।…কিন্তু কাল্লু সর্দারের মতো অনেকেই আবার জানে, নিজের বউকেই সুঁই ফুটিয়ে মেরেছে বেনারসীলাল। ওষুধের বদলে ইচ্ছে করে বিষ দিয়েছে। এই শ্মশানেই ওই বউয়ের দাহ হয়েছে। কাল্লু সর্দার কাঠ যুগিয়ে রতনলালের কাছ থেকে মোটা বকশিশ পেয়েছে। বেনারসীলালের বিপদে আর শোকে রতনলাল তো পাশে থাকবেই। ছিলও।

…কিন্তু কাল্লু সর্দার হলপ করে বলতে পারে বিষে নীল বর্ণ হয়ে গেছল বউটার সব্ব-অঙ্গ। মরার সময়েও চোখ চেয়ে মরেছে। মরার পরেও নাকি সেই চোখে ভয় ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

কিন্তু শান্তাপ্রসাদকে কেন যেন অবধূতের আদৌ খারাপ লাগত না। লোকটা ভিতরে ভিতরে বিষণ্ণ, দুশ্চিন্তায় কাতর। হতাশায় ডুবতে থাকলে মানুষ যেমন কাউকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, এই লোকও আর কোনো পথ না পেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে মনে হয়। তাছাড়া অবধূত অনেক কিছু ছাড়তে পেরেছেন—কিন্তু মদের নেশা তাঁর বেড়েই চলেছে। শান্তাপ্রসাদ বোতল নিয়ে এলে সেদিন খুব আনন্দে মুখ বদলানো হয়। নেশায় চুর হয়ে থাকেন।

এমনি মৌজের মাথায় একরাতে শান্তাপ্রসাদকে সাফ বলে দিলেন, যতই

সরাব খাওয়াও আমার দ্বারা কারো দুশমনি করা সম্ভব হবে না—তোমার মতলবও হাঁসিল হবে না—এই মতলব নিয়ে এসে থাকলে কেটে পড়ো।

হাত জোড় করে শান্তাপ্রসাদ বলল, আমি কারো দুশমনি করতে চাই না বাবা, তুমি কেবল একটি ছেলেকে আর একটি মেয়েকে রক্ষা করো।···আমি তোমাকে কয়েক দিন লক্ষ্য করার পর রাতে স্বপ্ন দেখেছি, তুমিই তাদের রক্ষা করেছ, তাদের মিলিয়ে দিয়েছ—তার পর থেকেই তুমি ওদের কৃপা করতে আমি সেই আশায় আছি।

সেই তূরীয় অবস্থায় অবধূত মন দিয়েই তার আর্জি শুনেছেন। কারণ, এরকম আবেদন অপ্রত্যাশিত।

···ছেলেটি শান্তাপ্রসাদের ভাইপো রুদ্রপ্রসাদ। নিজের দুটো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে—তার ছেলে বলতে এই ভাইপো। রুদ্রপ্রসাদ এম. এ. পাশ, দ্বারভাঙার এক সরকারি অফিসে ভালো চাকরি পেয়েছে। কালে দিনে অনেক উন্নতি হবে।···মেয়েটি হলো রতনলালের মেয়ে পার্বতী। তার বয়েস এখন কুড়ি পেরিয়েছে। এবারেই বি এ. পাশ করেছে। ওই মেয়ের ষোলো বছর বয়সে দাদু দৌলতরাম তার বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পার্বতী বেঁকে বসেছিল বিয়ে করবে না। দৌলতরাম তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ব্যবসার চৌদ্দ আনা এই নাতনীর নামে উইল করে রেখে-ছিল। ছেলের মতিগতি জানত বলেই তাকে ব্যবসা আর বিষয়সম্পত্তির দু'আনার বেশি দেয়নি। উইলে স্পষ্ট নির্দেশ, পার্বতীর বিয়েব পর মেয়ে-জামাইকে ব্যবসা আর বিষয়সম্পত্তির চৌদ্দ আনা ভাগ বুঝিয়ে দিতে হবে। ষোলো বছর বয়সে পার্বতী বিয়ে করতে রাজি হয়নি বলেই দৌলতরামের এই কড়া নির্দেশ। উইল রেজিস্ট্রি হয়ে আছে। শান্তাপ্রসাদ সেই উইলের একজন সাক্ষী। অতএব রতনলাল চেষ্টা করেও সেই উইল নাকচ করতে বা কোনোরকম কারচুপি করতে পারছে না। তার মেয়ের বিয়ে দেবারও কিছুমাত্র আগ্রহ নেই কারণ বিয়ে দিলেই ব্যবসা আর বিষয়সম্পত্তির চৌদ্দ-আনা হাত ছাড়া।

কিন্তু ষোলো বছরের মেয়ে পার্বতী কেন অবাধ্য হয়ে বিয়েতে আপত্তি

করেছিল দৌলতরাম তলিয়ে ভাবেনি। আর রতনলালের তো তা নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত নেই।···ভাইপো রুদ্রপ্রসাদের সঙ্গে পার্বতীর ছেলেবেলা থেকেই ভাবসাব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রগাঢ় প্রণয়ের দিকে গড়িয়েছে। কিন্তু বাপের চরিত্র জানতো বলেই পার্বতী সেটা কখনো প্রকাশ করেনি। তার আশা ছিল, বছর কয়েক সময় পেলে সে বি. এ. পাশ করবে আর তার মধ্যে রুদ্রপ্রসাদও পাশ-টাশ করে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন আর এ বিয়েতে বাধা থাকবে না, ব্যাপার বুঝলে দাদুর রাগও পড়ে যাবে। দাদু সহায় থাকলে বাবা বড় রকমের বাধা কিছু দিতে পারবে না।

···কিন্তু সকলেরই ভাগ্য মন্দ। দাদু দৌলতরাম চোখ বুজে বসল।

এখন বিয়েতে বাধা নেই। কিন্তু সব থেকে বড় বাধা রতনলাল আর তার সহচর বেনারসীলাল। এদের প্রণয়ের ব্যাপারটা তারা জানতে পারলেই বিপদের সম্ভাবনা। এমন কি ভাইপো রুদ্রপ্রসাদের প্রাণসংশয় হতে পারে। শান্তাপ্রসাদের বেশি দুর্ভাবনা বেনারসীলালকে নিয়ে। এই শয়তান রতনলালের অন্ধ বিশ্বাসের মানুষ। কিন্তু পার্বতী তার মতলবের আভাস পেয়েছে অনেক আগে। বয়সে সে পার্বতীর থেকে তেরো-চৌদ্দ বছরের বড়। বাবার অন্তরঙ্গ সহচর হিসেবে আগে তার আচরণ ছিল এক-রকম। অনেকটা কাকার মতো। এখন তার হাব-ভাব বদলাচ্ছে। নানাভাবে সে পার্বতীর মন পাবার চেষ্টা করছে। কারণ, দাদুর উইলের ব্যাপারটা খুব বেশি রাষ্ট্র হয়নি, রতনলাল যথাসাধ্য সেটা গোপন রাখতে চেষ্টা করছে—কিন্তু তা বলে বেনারসীলালের তো আর জানতে বাকি নেই। সাক্ষীদের বাদ দিলে সে সবার আগে জানে। তার মতলব বুঝেও পার্বতীকে চুপচাপ সহ্য করে যেতে হচ্ছে। হৃদ্যতার ভাবও বজায় রাখতে হচ্ছে। কারণ, এতটুকু বিদ্রোহের আভাস পেলে সেই শয়তান কোনদিক থেকে বজ্রাঘাত হানবে ঠিক নেই।

···পার্বতী আর রুদ্রপ্রসাদ এত বড় বাধা সত্ত্বেও এখন বিয়ে করতে চায়। যে-কোনোভাবে একবার বিয়েটা হয়ে গেলে পরের ব্যবস্থা পরে। বিয়ের পরে তারা রতনলালের সঙ্গে ব্যবসা আর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে আপোস

মীমাংসায় আসতে চাইলেও সে বাধ্য হয়ে রাজি হবে। শান্তাপ্রসাদের আবেদন সাধুজীকে এই বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে হবে। এখানে এই শ্মশান-কালীর সামনে তন্ত্রমতে সাধুজীকে নিচু শ্রেণীর মধ্যে তিন-চারটে বিয়ে দিতে দেখেছে। নিচু শ্রেণীর বিয়ে হতে পারলে উঁচুশ্রেণীরই বা হতে পারবে না কেন? আর সাধুজী ছাড়া গতি নেই কারণ, কাঁকুড়ঘাটিতে এমন কারো বুকের পাটা নেই যে রতনলাল আর বেনারসীলালকে উপেক্ষা করে এমন বিয়ে দিতে রাজি হবে। তাই সাধুজীই ভরসা।

···শান্তাপ্রসাদের প্ল্যান ছকাই আছে। সপ্তাহের মধ্যে চার দিন রতনলাল বেনারসীলালকে নিয়ে দ্বারভাঙায় থাকে। পার্বতী ছেলেবেলা থেকে জানকীবাঈয়ের কাছে মানুষ। সে তার দাসীও বটে আবার মায়ের মতোও বটে। সে-ও চায়, যে-কোনোভাবে রুদ্রপ্রসাদের সঙ্গে পার্বতীর বিয়েটা হয়ে যাক। সাধুজী রাজি হলে রতনলাল আর বেনারসীলালের অনুপস্থিতিতে সংগোপনে এই বিয়ে হয়ে যেতে পারে। যতদিন দরকার এই বিয়ে গোপন রাখার দায়িত্ব শান্তাপ্রসাদ রুদ্রপ্রসাদ আর পার্বতীর। বাবা দয়া করে বিয়েটা দিয়ে দিন।

··কাঁকুড়ঘাটির মহাশ্মশানে বসে মদের নেশায় তিনিও তক্ষুণি রাজি হয়ে গেছলেন! কেবলমাত্র মদের নেশায় বললে ঠিক হবে না। এমন দুটি ছেলে-মেয়ের মিলন কাম্য মনে হয়েছিল তাঁর। নিজেব আপদ বিপদ ভয় ডরের বালাই কোনোদিনই বিশেষ ছিল না।

দশ দিনের মধ্যে মহাশ্মশান কালীর সামনে সেই বিয়ে তিনি দিয়েছেন। বিয়ের সাক্ষী সপরিবারে কাল্লু সর্দার আর তার জনাকতক অনুচর। শান্তা-প্রসাদ আর তার স্ত্রী। আর রুদ্রপ্রসাদের খুব বিশ্বস্ত একজন ফটোগ্রাফার বন্ধু। সাধু আগেই বলে দিয়েছিলেন, মালাবদল আর শুভদৃষ্টির সময় যেন বর-কনের ফোটো তুলে রাখা হয়—ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে।

···বিয়ের কনে পার্বতী কৌপীন-পরা জটাজূটধারী সাধুর দিকে ভালো করে তাকাতেও পারেনি।

আর সাধুও আকণ্ঠ মদ গিলে শুভ কাজ সম্পন্ন করেছেন।

বিয়ের তিন মাসের মধ্যে সাধুর মাথাতেই যেন বজ্রাঘাত।...তাঁর বিশ্বাস, মুখ দেখে তিনি আয়ুর লক্ষণও বুঝতে পারেন। অন্তত সমূহ ফাঁড়া-টাড়া থাকলে তাঁর মনে ছায়া পড়ে। কিন্তু বিয়ে দেবার সময় মদের নেশায় এই ছেলে অর্থাৎ রুদ্রপ্রসাদের দিকে কোনো বিচারের চোখ নিয়ে তাকাননি। বিয়ে দেবার উদ্দীপনাই তাঁর বড় হয়ে উঠেছিল।...আর হয়তো বা কেউ কোনোরকম গণ-অঘটনের বলি হলে তার আভাস তিনি পান না। সেই-রকম অঘটনই ঘটেছে তিন মাসের মধ্যে। রুদ্রপ্রসাদের কর্মস্থল দ্বারভাঙায়। সে বাসে যাতায়াত করত। সেই যাতায়াতের পথে প্রহরা-শূন্য লেভেল-ক্রসিং পড়ে একটা! এ-রকম লেভেল-ক্রসিং-এর সংখ্যা ভারতে কম নয়। অঘটন না ঘটা পর্যন্ত কারো টনক নড়ে না। ফেরার সময় আবছা অন্ধকারে বাস-ভর্তি যাত্রী অঘটনের বলি হয়েছে। ছুট্ ট্রেন-এঞ্জিনের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তিরিশ-পঁয়ত্রিশটি প্রাণ গেছে। তাদের মধ্যে রুদ্রপ্রসাদ একজন।

...শান্তাপ্রসাদ সাধুর কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। না, তখনো পর্যন্ত পার্বতীর বিয়ের খবর রতনলাল বা বেনারসীলাল জানে না। মেয়ের উন্মাদ দশা দেখে তারা প্রণয়ের ব্যাপারটাই শুধু বুঝেছে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এমন একটা ব্যাপার চলছিল, ফলে এতবড় একটা অঘটনের দরুন তারা অখুশি হয়নি। কিন্তু তাদেরও টনক নড়েছে আরো দু'তিন মাস যেতে। পার্বতী অন্তঃসত্ত্বা। আর তখনো পাগলের মতোই অবস্থা তার।

রতনলাল আর বেনারসীলালের নিষ্ঠুর জেরার মুখে পড়ে জানকীবাঈ সত্যি কথা প্রকাশ করেছে। তিন মাস আগে শ্মশানের সাধুজী নিজে পার্বতীর সঙ্গে রুদ্রপ্রসাদের বিয়ে দিয়েছেন—সে-কথা বলেছে। আর, মালিকের অনুপস্থিতিতে রুদ্রপ্রসাদ ফি সপ্তাহে এখানে এসে দুই এক রাত থাকত তা-ও কবুল করেছে।

রতনলাল আর বেনারসীলাল দুজনেরই মাথায় খুন চেপেছিল। তবু রতনলালের মাথা আগে ঠাণ্ডা হয়েছে। দুজনেই শান্তাপ্রসাদের বাড়ি

এসে শাসিয়ে গেছে, এ বিয়ে কোনো বিয়েই নয়—যদি প্রাণের মায়া থাকে তো সে যেন এ-নিয়ে টুঁ-শব্দও না করে। ধনে-প্রাণে বধ হবার ইচ্ছে যদি না থাকে, তাকে মুখ সেলাই করে থাকতে হবে। পার্বতীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে তখন কর্তব্য বিবেচনা করা যাবে। আর বেনারসী-লাল হুমকি দিয়েছে, ওই সাধুকে কাঁকুড়ঘাটির মহাশ্মশানেই দেহ রাখার ব্যবস্থা সে করবে—তবে তার নাম বেনারসীলাল।

...না তখনো অবধূত নিজের এই জীবনটার জন্য খুব উতলা বোধ করেননি। পার্বতীর দুরবস্থার কথা ভেবেই তাঁর ভিতরটা দুমড়ে ভেঙেছে।

দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন শান্তাপ্রসাদ মাঝে মাঝে আসে। সাধু তাকে আশ্বাস দেয় সব ঠিক হয়ে যাবে কিছু ভেবো না। কেন আশ্বাস দেন, কি করে দেন নিজেও জানেন না। মনে হয়, তাই বলেন। শান্তাপ্রসাদের খবর, প্রতিবেশীদের কাউকে কিছু জানতে বুঝতে না দিয়ে অর্ধ-উন্মাদ মেয়েকে রতনলাল আর এক খামারবাড়িতে নিয়ে রেখেছে। জান্‌কীবাঈয়ের জবাব হয়নি কারণ সে পালিয়ে গেলে মুখ খুলবে। তার থেকে বহাল রেখে সর্বদা তাকে ত্রাসের মধ্যে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। মুখ খুললেই মৃত্যু অনিবার্য এটাই তাকে বোঝানো হয়েছে।

...রতনলাল আর বেনারসীলালের মতলব পরে বোঝা গেছে। তারা পার্বতীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার অপেক্ষায় ছিল। রতনলাল আশা করছিল, পার্বতীর যা দশা তাতে পেটের সন্তান বাঁচবে না। আর বাঁচলেও এই সন্তানকে বেশিক্ষণ সে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখতে দেবে না। কারণ, এই সন্তানই রতনলালের এখন সব থেকে বড় দুশমন। তাকে বাঁচতে দিলে বা বাড়তে দিলে এত ধন দৌলত সব-কিছুর চৌদ্দ আনার অধিকার এই সন্তানের আর তার মায়ের। ভবিষ্যতের এই কাঁটা রতনলাল জিইয়ে রাখবে এমন নির্বোধ সে নয়। বিশেষ করে যাকে সে শত্রু ভাবে এই সন্তান সেই শান্তাপ্রসাদের ভাইপোর ছেলে। তাকে বিয়ে করাটাই নিজের মেয়ের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ভাবে সে।

...কিন্তু এই দুনিয়ায় ঘটনার সাজ বড় অদ্ভুত। কে ঘটায় কে সাজায়

অবধূত জানেন না। সেইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কারো বুদ্ধির চমক দেখা দেয়, কারো বা মতিভ্রম হয়, বুদ্ধিনাশ হয়। এমন কি চরম মুহূর্তে বিচিত্র খেয়াল চাপে মাথায়। এইসব কিছুর সমাবেশ সেই এক ভীষণ দুর্যোগের রাতে।

···রাত বারোটার পরে, পার্বতীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। মৃত নয়, জীবিত। খামার বাড়িতে উপস্থিত ছিল জান্‌কীবাঈ। কিন্তু সে তখন অঘোর ঘুমে। তার ঘুমের ব্যবস্থা সময় বুঝে বেনারসীলাল করে রেখেছিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ করানোর দায়িত্ব পুনিয়ার মা নামে এক দাইয়ের। তার পাকা হাত পাকা মাথা, কিন্তু তেমনি লোভী আর বেপরোয়া মেয়েছেলে। টাকা পেলে কোনো কাজই অসাধ্য ভাবে না।

···জীবিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তুটো আঙুলের চাপে তার শ্বাসরুদ্ধ করতে কতক্ষণ? আরো সুবিধে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে পার্বতী এমনিতেই বেহুঁশ। তবু বেনারসীলালের নির্দেশে তাকে ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই শিশুর গলায় হাত দিতে গিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আর ঘুমন্ত মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কেন যেন পুনিয়ার মায়ের হাত বার বার কেঁপে উঠতে লাগল। মৃত সন্তান প্রসব হলে তাকে কমলাগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি। দোরগোড়ায় গাড়িও প্রস্তুত।

··কিন্তু পুনিয়ার মায়ের হাত বার বারই কাঁপছে। শ্মশানের সেই মহাযোগী ভীষণ সাধুর কথা পুনিয়ার মা-ও জান্‌কীবাঈয়ের মুখে শুনেছে। নিজেও তাঁকে দেখেছে। শ্মশানকালীর সামনে সেই সাধুই নাকি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। জানকীবাঈয়ের আশা, স্বামী মরলেও সাধুর কৃপায় এই সন্তান নিয়ে পার্বতী আবার ভালো দিনের মুখ দেখবে। পুনিয়ার মায়ের বার বার মনে হতে লাগল, পাপ হাতে এই শিশুর অঙ্গ স্পর্শ করলে শ্মশানের সাধুর কোপে তার সর্বনাশ অবধারিত।

···আর ঠিক সেই সময়েই এক বিচিত্র খেয়াল ভর করল বেনারসীলালের মাথায়।···কমলাগঙ্গায় যখন এই শিশুকে ভাসিয়ে দিতে যেতেই হবে, তাকে আর মারার দরকার কি? একে হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগার

মতো শীত, তার ওপর বৃষ্টি। কমলাগঙ্গায় যাবার পথেই ওই শিশু আপনি মরবে। ··তার পরেই আবার এক খেয়ালের চমক মাথায়। কমলাগঙ্গাতেই যদি যাবে তাহলে শ্মশানে নয় কেন? একই সঙ্গে সেখানকার সেই সাধুর মাথাতেই বা চরম দিন ঘনাবে না কেন? এমন মওকা আর কি জীবনে আসবে?

বেনারসীলাল পুনিয়ার মা-কে হুকুম করল, মারার দরকার নেই। যেমন আছে তুলে নিয়ে শ্মশানঘাটে আসতে হবে। নিজে প্রস্তুত হয়ে চারজন সাগরেদ্‌কে সঙ্গে নিয়ে রতনলালের পুরনো মোটরগাড়িতে উঠল। মোটর-গাড়ি এ তল্লাটে একমাত্র রতনলালেরই আছে। এই সময় সেটা সমস্তক্ষণই বেনারসীলালের হেপাজতে।

এই দুর্যোগের রাতে অবধূতের চোখে ঘুম নেই কেন জানেন না। তিনি তাঁর ছাপরা ঘরে বসেই আছেন। প্রথম শীতেই কাল্লু তার জন্য ঘর তুলে দিয়েছিল। তারপর থেকে প্রতি বছরই বর্ষা আর শীত আসার আগে এই ঘর সংস্কার করে দেয়—বাবার যাতে কষ্ট না হয়। দুর্যোগের রাত বলেই অবধূতের নেশার মাত্রা বেশি চড়েছিল। কিন্তু এই গভীর রাতেও তাঁর চোখে ঘুম নেই।

···না, নেশার দরুন হোক বা যে-কারণে হোক, কোনো গাড়ি-টাড়ির শব্দ তাঁর কানে আসেনি। হয়তো বা ঝিমুনি এসেছিল। হঠাৎ বিস্ফারিত চোখে দেখেন ছোরা আর লাঠি হাতে চার-পাঁচজন গুণ্ডাগোছের লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। অন্য রকমের একটা ছুরি হাতে যে-লোকটা দাঁড়িয়ে সে-ই যে একদা ডাক্তারি-পড়া বেনারসীলাল তা-ও জানেন না।

চোখের ইশারায় লোকগুলো সাধুকে চেপে ধরল, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বেনারসীলাল তাঁর হাত উল্টে কনুইয়ের তলার দিকের শিরার ওপর ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিয়ে সজোরে টেনে আনলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

ব্যাপারটা ঘটতে বোধহয় এক মিনিটও লাগল না। সঙ্গের মেয়েটাকে হুকুম করল, ওটাকে এই ব্যাটার সামনে শুইয়ে দাও এবার—দশ মিনিটের

মধ্যেই ঠাণ্ডায় জমে মরবে।

সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, হাতের বড় শিরা কেটে দিয়েছি—ব্লিডিং হয়ে হয়ে রাতের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। সকালে যারা এসে দেখবে তারা ধরে নেবে, তান্ত্রিক ক্রিয়া করার জন্য এই ব্যাটা কারো সদ্যজাত শিশু চুরি করে এনেছে। কিন্তু সেই ক্রিয়া করতে গিয়ে ব্যাটা নিজেও মরেছে, শিশুও মরেছে। বেনারসীলালের সঙ্গে টক্কর দেবে এমন সাধু এখনো মায়ের পেটে।

…এ ক্ষেত্রেও আবার ঘটনার সাজ। বেনারসীলাল নিজেও দেদার মদ গিলে এসেছিল, কিন্তু তা বলে তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল না। সেই দুর্যোগের রাতে সে ওই শিশুকে আর সাধুকে তাদের নিশ্চিত পরিণামের দিকে ঠেলে দিতে পারার বিশ্বাস নিয়েই ফিরে গেছে। আর সাধু যদি দৈবাৎ নাও মরে তাহলে রুদ্ধ জনতার মারেই মরবে। কারণ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য শিশু চুরি করে আনাটা কেউ বরদাস্ত করবে না। নেশার ঝোঁকে সে-যে নিজের পরিচয় জাহির করে গেল এ-খেয়াল তার বা অন্য কারো নেই।

অবধূত প্রথমে এতই হতচকিত যে তিনিও চোখের সামনে অবধারিত মৃত্যুই দেখেছেন। কিন্তু আত্মস্থ হতে খুব সময় লাগেনি। ঘরের কোণে চেলা-কাঠের আগুন জ্বলছে এখনো। কিন্তু তার আলো স্পষ্ট নয় খুব। ক্ষিপ্র হাতে অবধূত ঝোলা থেকে টর্চ বার করলেন। হাতের ক্ষত কনুইয়ের তলা পর্যন্ত গভীর। কিন্তু বেনারসীলাল যা ভেবেছে তা নয়। শিরা কাটেনি। ছুরি পিছলে এসেছে। কেবল গভীর ক্ষত দিয়েই গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

সেই রক্তাক্ত হাতে শিশুটাকে টেনে এনে কম্বল চাপা দিলেন। আধা-জ্বলা চেলা-কাঠগুলো সামনে এনে যথাসাধ্য তাপের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করলেন। তারপর নিজের শুশ্রূষায় মন দিলেন। বড় রকমের কাটা-ছেঁড়ার ওষুধ তাঁর কাছে মজুত থাকেই। ওষুধ লাগিয়ে একটা কৌপিন দিয়ে খুব শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হতে দেখলেন রক্ত চুঁইয়ে ব্যাণ্ডেজ ভিজে যাচ্ছে!

আপাততঃ আর কিছু করার নেই।

ঝোলা থেকে সেই পুরনো লাল চেলি আর ফতুয়া বার করে পরলেন। লোকের দেওয়া দু'তিনটে ছোট বড় মোটা কম্বল পড়ে আছে। একটা তুলে নিজের গায়ে জড়ালেন, অন্যটাতে শিশুটিকে মুড়ে বুকে তুলে নিলেন। বৃষ্টি নেই, কিন্তু জোর বাতাস দিচ্ছে। রাস্তায় বেরুলে এই শীতের কামড় থেকে শিশুটাকে বাঁচানো যাবে কিনা কে জানে। তিনি শুধু চেষ্টাই করতে পারেন।

...শীত আর দুর্যোগের একটাই সুবিধে। পথে মানুষ ছেড়ে কুকুর বেড়ালও নেই। একবারও না থেমে একটুও না বসে প্রায় তিন ঘণ্টা হেঁটে ছ' ক্রোশের ওপর পথ পেরিয়ে এলেন।...এখানেই অনন্তরাম আর লাজবন্তীর বাড়ি।...ঘটনা কে সাজায়? নইলে তিন বছরের মধ্যে অবধূত কোনোদিন শ্মশান ছেড়ে নড়েননি, তার মধ্যে এসেছিলেন কেবল এই অনন্তরাম আর লাজবন্তীর বাড়ি...তাদের পালিত ছেলেমেয়ে তিনটেকে আশীর্বাদ করতে! না এলে আজ নিশুতি রাতে তাদের এই ডেরার হদিস পেতেন কি করে? সে-দিন কার খেলা কে খেলেছিল?

রাত তখন সাড়ে চারটে প্রায়, কিন্তু ভোর হতে অনেক দেরি। এই শীতে ছ'টার আগে আলো জাগে না। ঠুক-ঠুক করে দরজায় ঘা দিতে লাগলেন। কোনোরকম হৈ-চৈ কাম্য নয়।

অনন্তরাম দরজা খুলে আঁতকে চেঁচিয়েই উঠল, কে? এই রাতে কে তুমি? অন্ধকারে আপাদ মস্তক কম্বলে মুড়ে দেওয়া সাধুজীকে তার এখানে কল্পনা করারও কথা নয়। গলা শুনে লাজবন্তী হারিকেন হাতে আলুথালু অবস্থায় ছুটে এসেছে।

—চুপ! চেঁচাস না, আমি কমলাগঙ্গার মুদ্দাঘাটের সাধু—আমাকে ভিতরে নিয়ে চল্।

অনন্তরাম আর লাজবন্তীর দেহের রক্ত চলাচল থেমে যাবার উপক্রম। হারিকেন মুখের ওপর তুলে দেখে সত্যিই সেই সাধু। তাঁকে ভিতরে এনে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরে এসে কম্বলের আড়াল থেকে বুকের শিশুকে লাজবন্তীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।—নে ধর, এটাকে যদি বাঁচাতে পারিস তাহলে তোর মাতৃত্বের জোর বুঝব।

অনন্তরাম আর লাজবন্তী ভয়ে বিস্ময়ে দিশেহারা। হাড়কাঁপানো শীতের ভোর রাতে বারো মাইলের ওপর পথ ভেঙে শ্মশানঘাটের সাধু এই শিশুকে বুকে করে তাদের ডেরায় এসে উপস্থিত হয়েছেন—এ চোখে দেখেও বিশ্বাস করে কি করে!

—নে ধর—ঘাবড়াস না—তোদের হাত দিয়ে যদি এর বাঁচা কপালে থাকে তো বাঁচবে।

কলের পুতুলের মতো লাজবন্তী কম্বলে মোড়া শিশুটিকে নিল। অসাড় নীলবর্ণ মুখ। বেঁচে আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি আলোর কাছে এনে কম্বল তুলল। বেঁচেই আছে মনে হয়। বলে উঠল, ইস্ এখনো যে এর গায়ের ময়লা পরিষ্কার করা হয়নি···এ কতক্ষণ আগে জন্মেছে—একে আপনি পেলেন কি করে?

—জন্মেছে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি নয় বোধহয়। শীতের রাতে মরার জন্য একে ঠাণ্ডায় শ্মশানে কারা ফেলে গেল। সাক্ষী লোপ করার জন্য আমাকে তারা হাতের শিরা কেটে দিয়ে শেষ করে গেছে ভেবেছে···যাক, আমার জন্য না ভেবে আগে এটাকে বাঁচানো যায় কিনা ত্যাখ্।

এরপর লাজবন্তী শিশুটির আর অনন্তরাম সাধুজীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার হাতের ক্ষত দেখে অনন্তরাম শিউরে উঠেছে। তক্ষুণি কোনো ডাক্তার ধরে আনার জন্য ছুটে বেরুতে চেয়েছিল। অবধূত বাধা দিয়েছেন, কিছু দরকার নেই, আমাদের মরা কপালে থাকলে ওদের এই বুদ্ধি হতো না, দুজনকে একসঙ্গে খতম করেই চলে যেত।

ডেটল তুলো গরমজলে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে আবার ওষুধ লাগিয়ে এবারে অনন্তরামের সাহায্যে ভালো করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হলো। লাজবন্তী এর মধ্যে পরম যত্নে শিশুটিকে জীবনের তাপে ফিরিয়ে এনেছে। চুকচুক করে সলতের দুধ চুষে খাচ্ছে। দু'চোখ বোজা। সুন্দর একটি জীবনের কুঁড়ি।

অবধূত গভীর মনোযোগে ছেলেটাকে দেখলেন খানিক। বাবার এই দৃষ্টি সংযোগ দেখে অনন্তরাম আর লাজবন্তী নিস্পন্দের মতো বসে। বড় নিশ্বাস ফেলে অবধূত বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না, আরো ভালো করে দেখতে হবে—তোমরা আমার ব্যবস্থা কি করতে পারো ?

তারা বুঝল না। হাত জোড় করে লাজবন্তী বলল, আপনি হুকুম করুন বাবা—

—আমি তান্ত্রিক। আমার শ্মশানের কাজ যেটুকু নির্দিষ্ট ছিল শেষ হয়েছে। দুই একদিনের মধ্যেই আমি চলে যাব···কিন্তু এই একটা দিন আমাকে তোমরা রাখতে পারবে ? কেউ চিনবে না জানবে না—পারবে ?···এই শিশুর জন্যেই বলছি। শ্মশান থেকে একে আমি তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি, জানাজানি হলে একে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না।

অনন্তরামের মুখে কথা সরে না। লাজবন্তী জোর দিয়ে বলল, পারব—আপনি আমাদের শোবার ঘরের পিছনের ঘরে থাকবেন···আমি সে-দিকে কাউকে আসতে বা যেতে দেব না···অন্দরমহলেই কেউ আসবে না সেই ব্যবস্থা করব। কিন্তু এই শিশুর কি পরিচয় দেব বাবা···এ কে আপনি জানেন ?

—বোধহয় জানি। কিন্তু এ কে জানলে শিশুর অমঙ্গল, তাই তোমাদেরও। ···দাঁড়াও, আমাকে ভাবতে হবে, আমার ঘর ঠিক করে এই শিশুকেও সেখানে রাখো—এর কথাও এক্ষুনি কারো না জানা ভালো।

লাজবন্তী এই দিন বাইরের কোনো লোককে অন্দরের দিকে ঘেঁষতেই দিল না। নিরিবিলি ঘরে বসে অবধূত অনেকক্ষণ ধরে আবার ওই শিশুকে দেখলেন। হাত উল্টে অনেকক্ষণ চোখের সামনে ধরে রাখলেন। তাঁর মনে হলো, কেন মনে হলো জানেন না, পাঁচ বছর না গেলে এই শিশুর জীবন অনিশ্চিত। হাত দেখে মনে হলো পাঁচ বছর পর থেকে আয়ু রেখা স্পষ্ট। কিন্তু রেখা-টেখা কিছু নয়, তাঁর মন বলছে, শিশুর মুখ বলছে, পাঁচ বছর পর্যন্ত এর জীবন বিপন্ন। কেন বলছে তিনি আজও জানেন না।

···দেখা হয়ে গেছে। এরপর কর্তব্যও স্থির। তিন বছর আগে কলকাতা

থেকে বেরিয়ে পড়ার সময় ঝোলায় যে টাকা ছিল তা তেমনি পড়ে আছে। তার থেকে কিছু টাকা অনন্তরামের হাতে দিয়ে একটা ফাঁপা সোনার লকেট নিয়ে আসতে বললেন। ছোট্ট একটা কাগজে শিশুর আনুমানিক জন্মসময়, তারিখ আর কার ছেলে লিখলেন। লকেট আসতে কাগজের টুকরো ভাঁজ করে তার মধ্যে পুরে অনন্তরামকে আবার পাঠালেন স্যাকরার দোকান থেকে লকেট সীল করে আনতে।

পরের নির্দেশ, লাল সুতোয় বাঁধা ওই লকেট ঠিক পাঁচ বছর বয়সে শিশুর গলায় পরিয়ে দিতে হবে। এরপর ঝোলা থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করলেন। দু'ভাঁজ করে নোটটাকে ঠিক মাঝামাঝি দু'খানা করে ছিঁড়লেন। এক-ভাগ লাজবন্তীর হাতে দিয়ে বললেন, এটা খুব সাবধানে আর খুব যত্ন করে রাখতে হবে। এই নোটের বাকি আধখানা কেউ এনে তোমাদের দেখালে নম্বর আর জোড় মিলিয়ে দেখে তোমরা তার হাতে ছেলে দিয়ে দেবে। জানবে এ ছেলের ওপর তারই অধিকার।

···পাঁচ বছরের মধ্যে কত কি ঘটে যেতে পারে, তিনি নিজেও ইহজগতে না থাকতে পারেন, পাঁচ টাকার নোটের আধখানা হারিয়ে যেতে পারে—কত কি হতে পারে—কিন্তু সেই দিন সেই মুহূর্ত অবধূতের যা মাথায় এলো তিনি তাই করলেন।···কেন করলেন, কে করালো আজও কি জানেন?

অবধূত সেই শিশুর নাম রাখলেন, রাহুল।

·· রাতের অন্ধকারে তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন। সাধু তাদের ছেড়ে চললেন বুঝে লাজবন্তী অঝোরে কেঁদেছে। অনন্তরামের চোখেও জল। অবধূত আশ্বাস দিয়েছেন তাদের মঙ্গল হবে, আবার দেখাও হবে। আরও বলেছেন, ওই পাঁচ টাকার নোটের আধখানা দেখিয়ে যদি কেউ ছেলে নিতে আসে, তোমরাও তাদের সঙ্গে চলে এসো—আশা করছি তখন আবার দেখা হবে।

অনন্তরাম রাতের অন্ধকারে তার টাট্টু ঘোড়ারগাড়িতে তাঁকে দ্বারভাঙা পৌঁছে দিয়েছে।

···ঘরে ফেরার পর অবধূত আর কখনো কিছু ছাড়ার তাগিদ বা শেকল ছেঁড়ার তাগিদ অনুভব করেননি। এখন তাঁর কেবল মনে হয়, অমন একটা সাজানো ঘটনা ঘটবে আর তাতে তাঁর বিশেষ একটা ভূমিকা থাকবে বলেই তিনি ও-ভাবে ওই মন নিয়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। ফিরে এসে সেখানকার ঘটনার কথা কেবল কল্যাণীকে বলেছেন। ফিরে আসার পর মনে হয়েছে এতবড় ব্যাপারটা দ্বিতীয় একজন কারো জানা থাকা দরকার—তাই বলেছেন। পাঁচ টাকার নোটের বাকি আধখানা স্ত্রীর হাতে দিয়ে খুব যত্ন করে রাখতে বলেছেন। সেইসঙ্গে কবে পাঁচ বছর পূর্ণ হবে তা-ও লিখে রেখেছিল।

···না, এই পাঁচ বছরে তিনি পার্বতী, তার ছেলে বা লাজবন্তীদের কারো খবর নেননি। অনেক সময়েই কৌতূহল হয়েছে, তবু না। কেবল মনে হয়েছে, সব ঠিক আছে। পাঁচ বছর পর্যন্ত পার্বতীর ছেলের কি বিপদ আর পাঁচ বছর পরেই বা সে-বিপদ কি করে কেটে যাবে— সে-সম্পর্কেও তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। এখন অবশ্য বুঝতে পারছেন, বিপদ কি করে কেটেছে। বেনারসীলাল খুনের দায়ে জেলে। আর, মাত্র দু'মাস আগে পার্বতীর বাবা রতনলাল মারা গেছে। তাই পার্বতীর ছেলে বিপদমুক্ত।··· পাঁচ বছর কবে শেষ হবে কল্যাণী তার দুদিন আগে তাঁকে জানিয়েছেন। কিন্তু দিনের হিসেব অবধূতের বরাবরই মনে ছিল। কাঁকুড়ঘাটিতে পার্বতীকে চিঠি লিখেছেন। লিখেছেন, তিনি বাবা তারকনাথের দীন সেবক। পাঁচ বছর আগে বাবা তারকনাথ পার্বতীর সদ্যজাত শিশুকে রক্ষা করেছেন। সেবকের ধারণা, পার্বতীর সেই সন্তান এখন বিপদমুক্ত। ছেলের হদিস পেতে হলে পার্বতী যেন পত্র-পাঠ পশ্চিমবাংলার তীর্থক্ষেত্র তারকেশ্বরে চলে আসে। এখানে এলে বাবা তারকনাথের এই দীন সেবকই তাকে খুঁজে নেবে।

···নাটকের পরিসমাপ্তির জন্য কেন অবধূত তারকেশ্বর বেছে নিলেন ? জানেন না। কেবল এ-টুকু মনে হয়েছিল এই মিলনের জন্য একটা ধর্ম-স্থানের পরিবেশ হলে ভালো হয়। মনে ডাক দিল, তারকেশ্বর। বাস্, তারকেশ্বর।

চারদিনের দিন ঘুম থেকে উঠেই অবধূত ঘোষণা করলেন, পার্বতী আজ সকালের গাড়িতেই ছেলে নিয়ে আসছে—চলুন স্টেশনে যাই। আজ আসার সম্ভাবনা আমিও জানি। তবু বললাম, আজ না এসে কালও তো আসতে পারে?

—না, আজই সে আসবে।···পার্বতীকে বলে দিয়েছিলাম ছেলে-পেলে তারকেশ্বরে পুজো দেবার জন্য সেইদিনই কলকাতা রওনা হতে, আমি এখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করব। অবধূত হাসতে লাগলেন, আমার নয়, পার্বতীর ভাবার কথা আমার মুখ দিয়ে সে বাবা তারকনাথেরই হুকুম শুনেছে। চলুন দেখাই যাক।

এসেছে। গেলবারে পার্বতীর সঙ্গে ছিল একজন পরিচারক আর পরিচারিকা। এবারে তারা ছাড়াও পার্বতীর হাতে ধরা বছর পাঁচেকের একটি ফুটফুটে ছেলে : তারই হারানো ছেলে রাহুল। তাদের সঙ্গে আর যে দুজন সুশ্রী মেয়ে পুরুষ, দেখেই বুঝলাম, তারা লাজবন্তী আর অনন্তরাম। তাদের সঙ্গে আট থেকে দশ বছরের মধ্যে দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ···অনন্তরাম-লাজবন্তীর সেই পালিত তিন ছেলে-মেয়ে। দেখামাত্র আমারও মনে হলো তারা সত্যিকারের বাবা-মা হতে পেরেছে।

দূর থেকে রক্তাম্বর বেশে অবধূতকে দেখামাত্র পার্বতী ছেলের হাত ধরে ছুটে এলো। তারপর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই অবধূতের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। হাসছে, কাঁদছে, পায়ে চুমু খাচ্ছে। স্টেশনের মানুষেরা হাঁ হয়ে দেখছে।

আর অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে লাজবন্তী আর অনন্তরামও। স্টেশনে ভিড় জমে যাচ্ছে দেখে অবধূত সেখানে আর একটি কথাও বললেন না। সকলকে নিয়ে যে-বাড়িতে আমরা আছি সেখানে এলেন।

পার্বতীর ছেলে রাহুল তাঁর কোলে।

এক-ঘণ্টার মধ্যে আমরা সকলে আবার তারকেশ্বরের মন্দিরে। এত সকালে লোকের ভিড় খুব বেশি না হলেও একেবারে কমও নয়। কিন্তু এই সকালে আমার মনে হলো দেবতার পুজো শুধু কয়েকজনের। পার্বতীর আর লাজবন্তীর। আর তাদের চার ছেলেমেয়েদেরও হয়তো। সকলেই তারা দুধকুণ্ডে স্নান করেছে। তারপর পার্বতী ভিজে কাপড়ে সেই আগের বারের মতো দণ্ডি কেটে-কেটে উঠে আসছে। তার পিছনে রাহুল মা যা করছে সে-ও তাই করছে। তার পিছনে দণ্ডি কেটে আসছে লাজবন্তী। তারপর তার দুই ছেলে আর মেয়ে। সকলের পিছনে অনন্তরাম।

দণ্ডি কেটে মন্দির প্রদক্ষিণের এমন উৎসব বেশি দেখা যায় কিনা জানি না। দু'চোখ ভরে দেখছি। দণ্ডি কাটতে কাটতেই পার্বতী কেঁদে ভাসাচ্ছে। কিন্তু মানুষের কান্না এত সুন্দর এত আনন্দের হতে পারে তা-ও কি জানতাম?···ঠাকুর দেবতা জানি না। বিশ্বাস কাকে বলে তা-ও অন্তর থেকে জানি না। দু'চোখ ভরে কেবল দেখেই যাচ্ছি। একটা আনন্দের ডেলা থেকে থেকে গলার কাছে ঠেকছে।

অনাড়ম্বর ঘটার মধ্যেই প্রদক্ষিণ আর পুজো শেষ হলো।···পার্বতীর কৃতজ্ঞ ঘন দক্ষিণে মন্দিরের পাণ্ডা আর পুজারীর দল সকলে খুশি। খুশির জোয়ার মন্দির এলাকার সমস্ত ভিখিরির মুখেও। কাচ্চা বাচ্চা ছোট বড় মেয়ে পুরুষ প্রতিটি ভিখিরির হাতে একটা করে দশ টাকার নোট আনা সম্ভব নয়, ভিখিরির সংখ্যা শ আড়াই তিনের কম হবে না।

কিন্তু ফেরার সময় লাজবন্তী আর অনন্তরাম নড়ে না। কাউকে দেখতে পাওয়ার আশায় তারা চারদিকে তাকাচ্ছে। আগেও তাদের অনুসন্ধিৎসু চোখ এ-দিক ও-দিকে ঘুরতে দেখেছি।···চুল ছাঁটা দাড়ি গোঁফ কামানো সিল্কের রক্তাম্বর বেশ-বাশ পরা অবধূতকে দেখে তারা কৌপিন-ধারী ভস্ম-মাখা নগ্নদেহ জটাজুট বোঝাই শ্মশানঘাটের সাধুকে চিনবে কি করে?

ঘরে ফিরে জানার পরেও চেনা কঠিন। বিশ্বাস করাও। লাজবন্তী বা অনন্ত-রাম শুধু নয়, প্রচণ্ড বিস্ময়ে স্তব্ধ পার্বতীও। অবধূত হেসে ডান হাত উল্টে

অনন্তরাম আর লাজবন্তীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।—ভোল বদলালেও বেনারসীলালের ছুরির দাগ এই হাত থেকে কোনো দিন মিলাবে না—নিজের হাতে শুশ্রূষা করেছ—এই দাগটা মনে কবতে পারছ ?

ভাবাবেগের পরের প্রতিক্রিয়া পাঠকের অনুমান সাপেক্ষ।

পরিবেশ আবার সহজ খুশিতে ভরে উঠতে পার্বতী বলে উঠল, কমলা-গঙ্গার শ্মশানঘাটে আপনিই তাহলে আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন।...আজ চার বছর ধরে আমি নানা তীর্থস্থানে ঘুরে ঘুরে আপনাকে কত খুঁজেছি — বছরের মধ্যে প্রায় ছ'মাস করে আমার আপনার খোঁজে কেটেছে—কিন্তু আপনি দয়া করে চিঠি দিয়ে আমাকে তারকেশ্বরে আসতে বললে আমি তো সামনা-সামনি দেখেও আপনাকে চিনতে পারতাম না।

শুনে অবধূত বেশ অবাক।—চার বছর ধরে নানা তীর্থে ঘুরে আমাকে খুঁজেছ—কেন ?

সকলেই শুনলাম কেন।...পার্বতীর সন্তান হওয়ার এক বছরের মধ্যে খুনের দায়ে বেনারসীলালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যায়। যে দাইয়ের হাতে রাহুল হয়েছে সেই পুনিয়ার মা খুব মানসিক চাপে ভুগছিল। সে-ই পার্বতীর পরিচারিকা জানকীবাঈকে সব ঘটনা বলেছে।...ওই ঘটনার পরদিনই সে শ্মশানে গেছল। সেখানে তখন সাধুও নেই, পার্বতীর ছেলেও নেই। তাই তার বিশ্বাস সাধু মরেনি—ছেলেও তার কাছেই।...এরপর অনেক চেষ্টা করে পার্বতী জেলে বেনারসীলালের সঙ্গে দেখা করেছে। ছেলে বেঁচে আছে কিনা তাও সে জানে না, কিন্তু ঘটনার কথা অস্বীকার করেনি।

...সেই থেকে পার্বতী কমলাগঙ্গা ঘাটের সাধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আর মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে তার ছেলে বেঁচে আছে—কোনো একদিন তাকে পাবেই।...মহারাজের চিঠি পেয়ে তাই একটুও অবিশ্বাস করেনি। এতদিনে ঈশ্বরের দয়া হয়েছে ভেবে ছুটে এসেছে। এসে ছেলে পেয়েছে।

কলকাতায় নিজের বাড়িতে নয়, পেটো কার্তিক আর অবধূতের সঙ্গে

কোন্নগরের বাড়ি এসেছি। ভদ্রলোকের সঙ্গ ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। পরে মনে হয়েছে, সত্যিই কি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি—না কি, অবধূত যে বলেন, কে ঘটায় কে সাজায়—এই আসার পিছনেও তেমন কারো হাত ছিল? ...তা না হলে যে-চিত্রটা সম্পূর্ণ হয়েছে ভাবছিলাম, না এলে সেটা যে কত অসম্পূর্ণ থেকে যেত তা কি আমার কল্পনার মধ্যে ছিল?

অবধূত বোতল গেলাস বার করে বসেছিলেন। হেসে বলছেন, ড্রিংক মানুষের সং-সত্তা টেনে বার করে, এই রাতটা পার্বতী তার ছেলে, আর লাজবন্তী অনন্তরাম আর তাদের ছেলে-মেয়ে অ্যাণ্ড কোম্পানীর জন্য সং-সত্তা দিয়ে শুভেচ্ছা কামনার রাত—কি বলেন?

আমি সানন্দে সায় দিয়েছি, নিশ্চয়ই!

কল্যাণী দেবী মাঝে মাঝে এসে মুখরোচক এটা-সেটা সরবরাহ করে যাচ্ছেন। পেটো কার্তিক বাবার সেবার অছিলায় পা টিপছে—আসলে তার দু'কান আর মন আমাদের কথাবার্তা গিলছে।

অবধূত প্রস্তাব করলেন, ওরা এত করে বলল, সকলে মিলে একবার-কাঁকুড়ঘাটি যাওয়া যাক—কি বলেন?

আমি বললাম, অবিলম্বে প্রোগ্রাম করে ফেলুন—আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে।...কিন্তু বিহারের মাঝপথের স্টেশনে পোলাও-মাংস কালিয়া যোগান দেবার মতো আপনার ভক্ত আছে তো?

পেটো কার্তিকের মন্তব্য, ওরা তো নিরামিষ ভক্ত, তিন ঘণ্টার নোটিস পেলেও ও-সবের ব্যবস্থা আমিই করে নিয়ে যেতে পারব।

তারকেশ্বরে পার্বতী আর লাজবন্তীর গ্রুপকে নিরামিষ খেতে দেখেছে পেটো কার্তিক। তাই অরুচি।

একটা থালায় মাংসের বড়া নিয়ে এলেন কল্যাণী দেবী। আমি বলে উঠলাম, বা-বা—ভোজনটাও এক অপূর্ব সাধনার অঙ্গ আগে জানতাম না।

কল্যাণী হাসিমুখে জবাব দিলেন, এটা ওঁর আর পেটো কার্তিকের সাধনার অঙ্গ—সকলের নয়।

থালা রেখে চলে যাচ্ছিলেন, বাধা দিলাম—আচ্ছা, এই যে এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল—এ-সম্পর্কে আপনি কিছু আলোকপাত করুন।

সহজ জবাব, এ-রকম ঘটনা ঘটবে এ-তো পাঁচ বছর আগেই জানা ছিল।...এতে কার কি বাহাদুরি?

—কারো নয়?

—কেউ কেউ ভাবতে পারেন তাঁর বাহাদুরি আছে। কিন্তু যিনি ঘটালেন আর ঘটনার শেষ করলেন তিনি হাসছেন।

—কে ঘটালেন? ঈশ্বর?

—আর কে? আর কার ক্ষমতা? চলে গেলেন।

আমি বিশ্বাস করি বা না করি, বিশ্বাসের ভারী একটা সুন্দর রূপ অনেক দেখেছি।...কালও পার্বতীর মুখে দেখলাম। লাজবন্তী আর অনন্তরামের মুখে দেখলাম।...পেটো কার্তিকের মুখেও বিশ্বাসের এক কমনীয় রূপ দেখেছি। কিন্তু কল্যাণী দেবীর সংশয়শূন্য এই সহজ বিশ্বাসের বোধ করি তুলনা নেই। তাঁর এই রূপের দিকে তাকালে মনে হবে, এ-বিশ্বাস ভিন্ন জগতে আর কোনো সত্যের অস্তিত্ব নেই।

...যে-কথাগুলো বলে গেলেন তাতে স্বামীর প্রতি ঠেস ছিল। কিন্তু অবধূতের দিকে চেয়েও বিশ্বাসের আর এক রূপ আমি একাধিকবার দেখেছি। এই মুহূর্তে হরিদ্বার থেকে ফেরার পথে ট্রেনে তাঁর সেই গভীর কথাগুলো আমার হুবহু মনে পড়ল। বলেছিলেন, 'আমার চোখে এই জগতের সব-কিছুই বড় আশ্চর্য লাগে। জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি ধ্বংস সবই যেন কেউ সাজিয়ে সাজিয়ে যাচ্ছে। মানুষ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাণীর এমন বায়োলজিকাল পারফেকশন কি করে হয়—কে করে? একটা ফুলের বাইরে এক-রকম রঙ ভিতরে এক-রকম, পাপড়ির গোড়ায় এক রঙ, মাথার দিকে অন্য-রকম—এমন নিখুঁত বর্ণ বিন্যাস কি করে হয়—কে করে?...

বলেছিলেন, 'আপনারা লেখেন, কতটা দেখেন আপনারাই জানেন। আমি শুধু ঘটনা দেখে বেড়াই, যা দেখি তা কোনো বইয়ে পাই না, কোনো চিন্তায় আসে না। যেখানে যাই, দেখি কিছু না কিছু ঘটনার আসর সাজানো—

পরে মনে হয়েছে আমি নিজের ইচ্ছেয় আসিনি, কিছু ঘটবে বলেই আসার টান পড়েছে—আমার কিছু ভূমিকা আছে বলেই আমায় সেখানে গিয়ে হাজির হতে হয়েছে—এমন কেন হয়, কি করে হয় বলতে পারেন ?'

আমি বিশ্বাস করি বা না করি, বিশ্বাসের এই কথাগুলো আমার মনে খোদাই হয়ে বসে গেছে।

…হঠাৎ মনে হলো, শান্তিই যদি এই জীবনের পরম প্রাপ্তি, আমি তার কতটুকু পেয়েছি ? এই শান্তির পথ বিশ্বাসের পথ। এই পথ-যাত্রীদের তো কম দেখলাম না। সকলেই শান্ত, প্রসন্ন, কমনীয়। অন্তত আমার তা-ই মনে হয়।

বলে ফেললাম, আমাকে একটু পথ দেখান—

—তার মানে ? কি পথ ?

—বিশ্বাসের পথ, শান্তির পথ।

অবধূত চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। বললেন, শান্তি জিনিসটা যার-যার মনের কাঠামোর ওপর নির্ভর করে।…কিন্তু কোন্ বিশ্বাসের কথা বলছেন ?

—আপনাদের যা বিশ্বাস। ঈশ্বরে বিশ্বাস।

আবার খানিক চেয়ে রইলেন। তারপর হাসতে লাগলেন। বললেন, শুনুন, আমার স্ত্রীকে দেখে আমার বিচার করবেন না।··আমার মতো টানা-পোড়েনের মধ্যে দুনিয়ায় কতজন আছে জানি না।…অনেকে চোখ বুজে বিশ্বাস করে ঈশ্বর আছে। অনেকে চোখ বুজে অবিশ্বাস করে, ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর আছে কি নেই—এই সন্ধান কত জনে করে ?

অবধূতের দু'চোখ মনে হলো কোথায় কোন্ দূরে উধাও। গলার স্বর গভীর। বললেন, আমি করি। করছি।…ঘটনার সাজ দেখে দেখে প্রশ্ন করি, কে ঘটায় ? কেন ঘটে ? কে সাজায় ? কে করে ? জবাব পাই না।… আমি খোঁজ করছি। খুঁজে যাচ্ছি। ঈশ্বর আছে কি নেই আমি আজও জানি না।

আমি নির্বাক বিমূঢ় চোখে চেয়ে আছি।